রায়বাঘিনী

ও

ভূরিশ্রেষ্ঠরাজকাহিনী

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

বিরচিত

ও

বাণীকুমার

কর্তৃক

নবভাবে গ্রথিত, পরিবর্দ্ধিত ও পুনর্লিখিত

১১ শ্রাবণ ১৩৫৭

ন ব   ভা র তী

প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,

কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ("বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী")

১১ শ্রাবণ ১৩৫৭

প্রকাশনা
শ্রীঅরুণকান্তি পাল
নব ভারতী
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট্
কলিকাতা-৯

*

প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা
বাণীকুমার

*

প্রচ্ছদপট-চিত্রণ
শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়

*

মুদ্রণ
শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

মূল্য: ছয় টাকা

এই গ্রন্থের রূপান্তর, ভাষান্তর, পরিবর্তন, অন্যথাকরণ বা যে কোনও বিবরণ-গ্রহণ প্রভৃতি সমগ্র স্বত্ব সম্পূর্ণভাবে শ্রীমতী গৌরী দেবী কর্তৃক সংরক্ষিত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

কুলপতিপ্রতিমেষু

তুমি ভারতের 'আত্মবিস্মৃত জাতি'কে
জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির রুদ্ধদ্বার-উন্মোচনে
নবচেতনায় করেছ উদ্‌বুদ্ধ !
পুরাকৃতিতত্ত্বের জটিল-বন্ধুর পথ-প্রবর্তনে
জ্ঞানতপস্যা-দ্বারা ভারতের চিন্তন-জগতে
সম্পূর্ণ নূতন রশ্মি-সম্পাতে
অজ্ঞাতকে করেছ বিজ্ঞাত—
বিলুপ্তকে করেছ জাগ্রত !
বিদ্যাধিদেবীর দীপ-হাতে আবির্ভূত প্রতিভামূর্তি
হে চিরবন্দনীয় !
তোমার উদ্দেশে
এই ইতিবৃত্তকথা "রায়বাঘিনী ও ভুরিশ্রেষ্ঠরাজকাহিনী"
তোমার শিষ্যপ্রশিষ্যের

উৎসর্গ

অবতারণা

এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক, সেইজন্য এই অবতারণা।

আমার পূজনীয় পিতৃদেব নিত্যনৈমিত্তিক অধ্যাপন-কার্যের অবসর-সময়ে দক্ষিণ-রাঢ়ের ধর্ম সংস্কৃতি ও স্থানীয় নষ্ট-কীর্তির ইতিহাস-উদ্ধারে প্রয়াসী হন। তাঁহার সেই প্রচেষ্টার প্রথম ফল রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণরাজগণের ইতিবৃত্তকথা। অধুনা-লুপ্ত 'আলোচনা' পত্রিকায় (২০শ বর্ষ-১৩২৩ সাল, ২১শ বর্ষ-১৩২৪ সাল) তাঁহার রচিত "দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণরাজবংশের ইতিহাস" শীর্ষক কয়েকটি নিবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি রায়বাঘিনী-বৃত্তান্ত রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বহু অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া এই ব্রাহ্মণরাজবংশেরই রাজ্ঞী বাঙলার মহীয়সী বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনীর তথ্য বিস্মৃতিলোক হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই খণ্ড খণ্ড ইতিবৃত্তগুলিকে একটি নিপুণ সূত্রগ্রন্থনে তিনি নামমাত্র-সার রায়বাঘিনীকে অতি-পরিচয়ের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া অখণ্ড জীবনময়ী-রূপে সর্বজনসমক্ষে প্রতিভাত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ সম্ভবপর হয় প্রায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (১৯১৯ খ্রীঃ অঃ) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রশংসা- ও সমর্থন-সিদ্ধ মুখপত্র ধারণ করিয়া। ইহা প্রকাশিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই বহু বিদ্বজ্জন-কর্তৃক সমাদৃত এবং স্টেট্‌স্‌ম্যান, অমৃতবাজারপত্রিকা, বেঙ্গলী, হিতবাদী ও অন্যান্য সংবাদপত্রে উচ্চ-প্রশংসিত হয়। উপরন্তু পাঠাগার ও পারিতোষিকের জন্য গ্রন্থটি সরকারের শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন লাভ করে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মুদ্রিত সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, কিন্তু নানা কারণে ও গ্রন্থকর্তার ঔদাসীন্যে ইহার পুনঃপ্রকাশ আর ঘটিয়া উঠে নাই। মধ্যবর্তী কালে "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" অনেক পাঠাগারে বর্তমান থাকিয়া একাধিক কুন্তিলককে

অপহরণের লোভনীয় বস্তু যোগাইতেছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন—এরূপ কয়েকজন খ্যাত, অখ্যাত ও মন্দযশঃপ্রার্থী 'রেয়োভাট' রায়বাঘিনী-বৃত্তান্তের একমাত্র উৎস আমার পিতার রচিত তথ্য এমন-কি তাঁহার কপোল-কল্পিত বিষয় ও চরিত্রের নাম পর্যন্ত নির্বিচারে আত্মসাৎ করিয়া নিজেদের মৌলিক রচনা বলিয়া চালাইতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষোভের বিষয়, ইঁহাদের মধ্যে দুই-তিনজন পরিচিত লেখক এই চৌর্যবৃত্তির নিন্দিত পথ অনুসরণ করিয়াছেন। শিশুসাহিত্য-হাটের তথাবাচ্য এক ঐতিহাসিকগল্পের বেসাতী আমার পিতৃ-লিখিত মূল কাহিনীর পাশ কাটাইবার ছলে দুই-একটী ঘটনা বিকৃত করিয়া ও খাঁটি বাঙ্গালী সেনাপতিকে পশ্চিমা বানাইয়া একটী পূজাবার্ষিকীতে "বীরাঙ্গনা রাণী ভবশঙ্করী" গল্প-প্রকাশ দ্বারা সত্যের অপলাপ করিয়াছেন; কোনো প্রবুদ্ধ ব্যক্তি এক মাসিক পত্রিকায় "হুগলীর ইতিহাস" লিখিতে বসিয়া তথ্যের বাহাদুরি কিনিবার লোভে মূল রচনা হুবহু চুরি করিয়াছেন এবং মূলগ্রন্থের বংশলতায় উল্লিখিত শকাব্দকে খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া গুলাইয়া ফেলিয়াছেন; সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়—এক ধুরন্ধর কথাশিল্পী কিংবদন্তীর দেশে বেপরোয়া বিহার করিতে করিতে রচনার ওস্তাদি ফলাইবার জন্য রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর মূল তথ্যের বিকার-সাধন তো করিয়াছেনই—তদুপরি মন্দির ও স্থানের যথার্থ সংস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়া আপনার সুষ্ঠু বোধকে খর্ব করিয়াছেন। অন্যান্য কয়েক-জন অখ্যাতনামা শক্তিহীন লেখক এই কাহিনী চুরি করিয়া—কেহ লিখিয়াছেন প্রবন্ধ, কেহ বটতলা-পোষিত হাইব্রিড্ নভেলেট, কেহ দিয়াছেন অতি-অক্ষম 'নাট্য-বিরূপ', কেহ-বা কথাপ্রবন্ধ-'বিকার' প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে "রায়-বাঘিনী"—গ্রন্থটি অস্বামিক বিবেচনায় বড় ছোট কুম্ভিলক ইচ্ছামত লুটিয়া পুটিয়া লইয়া চৌর্য-প্রতিযোগিতায় একটি রেকর্ড্ সৃষ্টি করিয়াছে। সকলেই পিতৃদেবের কল্পিত ও সংগৃহীত উপাদান এবং মুখ্য-ঘটনা বিনা স্বীকারোক্তিতে গ্রহণ করিয়া কিংবা 'চোরাই মাল চোলাই' করিয়া যেন নিজেদের প্রথম উদ্ভাবিত তথ্য-পরিবেশনের ভান করিয়াছেন, ইহাতে সাহিত্যিক শিষ্ট-রীতির

দেউলিয়া রূপ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া একটি কথা মনে পড়িতেছে—'যার দৌলতে চুয়া-চন্দন, তারি পাতে খোলার ব্যঞ্জন', যাঁহার প্রাপ্য যোগ্য মর্যাদা রক্ষা না করিয়া—যে সাহিত্যক্ষেত্রচারিগণ তাঁহার চুয়াচন্দন নানাভাবে হরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ঋণ-স্বীকার করিবার মতো সৎপ্রবৃত্তিও নাই, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের কথা। এখন যেহেতু 'নেপোর দল দই মারিতেছে', সে-কারণে অপহরণ-বৃত্তান্ত পাঠকগণের অবগতির জন্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিলাম।

যাহাই হউক্, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর "রায়বাঘিনী" নবরূপে পুনর্বার আত্ম-প্রকাশিত হইতেছে···পূর্ব রূপের তুলনায় বর্তমান গ্রন্থ অনেকাংশে প্রভিন্ন, কিন্তু পিতৃদেবের মূল-রচনার কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটানো হয় নাই। এই রাজবংশের সুযোগ্য সন্তান প্রীতিভাজন শ্রীবিজলীভূষণ রায়ের উৎসাহে ও যোগাযোগে এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়, এবং শ্রীহৃষীকেশ বারিকের ব্যবস্থাপনায় ও শ্রীঘণ্টেশ্বর পালের উদ্‌যোগে ইহার সংবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইঁহারা আমার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

কিন্তু পিতৃদেব-প্রণীত "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী"-কে যে আমি বর্তমান বর্ধিত রূপে আনিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার পূর্ব সূত্রটি এখানে ব্যক্ত করা কর্তব্য মনে করি। আমার সুহৃদ্‌বর অশোকনাথ শাস্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে ও প্রণোদনে আমি "রায়বাঘিনী"-কে নাটকে রূপিত করিতে ব্রতী হই; রচনা-কালে পিতার সহিত বহু বিষয়ে আমাকে আলোচনা করিতে হইয়াছিল। তিনি "হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস"—প্রণয়নের সময় রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণ-রাজগণ সম্পর্কে কয়েকটি অজ্ঞাত বিষয়ের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল—প্রয়োজনমত সংস্কার, পরিবর্তন ও তথ্য-সন্নিবেশ দ্বারা "রায়বাঘিনী"-গ্রন্থের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন। সেই বিষয়গুলি আমি সংক্ষেপে লিখিয়া লইতে ভুলি নাই, তিনিও কয়েকটি বৃত্তান্ত স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন। আমার নাটক-রচনায় সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ কার্যকর হইয়াছে এবং সর্বাপেক্ষা কাজে লাগিয়াছে

এই গ্রন্থের নবরূপ-প্রবর্তনে। আমি ইতিহাসের ও তথ্যের সহিত সন্ধি ও সঙ্গতি-রক্ষা করিয়া, নব নব ইতিহাস-সম্মত বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়া, এবং মূল-গ্রন্থকারের রচনা-রীতির সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া বহু প্রযত্নে এই গ্রন্থটিকে বর্তমান রূপান্তরে আনিতে সমর্থ হইয়াছি। অবশ্য—এ-কথা স্বীকার করিতে আমার দ্বিধা নাই যে, বস্তু-বিচার করিয়া আমি সম্ভাব্য প্রসঙ্গ ও ঘটনার সূত্র রচনা করিয়াছি কল্পনার সাহায্যে। তিনটি পর্ব-সমন্বিত এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি "রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজকাহিনী"। প্রথম পর্বে ভূরিশ্রেষ্ঠব্রাহ্মণ-রাজ্যের স্থাপয়িতা চতুরানন নিয়োগী হইতে রুদ্রনারায়ণের পূর্বতন রাজগণের বৃত্তান্ত, পরাপর্ব বা মুখ্য পর্বে রাজা রুদ্রনারায়ণ ও কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গ এবং রাজ্ঞী ভবশঙ্করী (রায়বাঘিনী) ও রুদ্রনারায়ণের ইতিবৃত্ত, শেষ পর্বে উত্তর-রাজন্যবর্গের বিবরণ···এইরূপ তিনটি ভাগে এই গ্রন্থ সজ্জিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহা তথ্যবহুল এবং রাঢ়বঙ্গের ঐতিহ্যের একটি পূর্ণাবয়ব কাহিনী।

সাহিত্য-জগতে অবিমিশ্র সুখ্যাতি-লাভ করিয়াছে—এমন গ্রন্থ অতি-বিরল। "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" প্রকাশের বহুদিন পরে, ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে সমালোচনার উদ্ভব হইয়াছিল—তাহা অপ্রত্যাশিত বলা যায় না, বরং কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক টিপ্পনী-যোগে বিরুদ্ধ আলোচনা এই গ্রন্থের প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব প্রমাণ করে। উক্ত সমালোচক একনিঃশ্বাসে রায়বাঘিনী-প্রণেতাকে যেমন প্রশংসা করিয়াছেন কয়েকটি মূল্যবান্ তথ্য ও বংশলতা-প্রদানের জন্য, তেমনি আবার পরমুহূর্তেই প্রতিকূল মন্তব্য করিয়া বলিতে ছাড়েন নাই যে, ইহার অনেক বিষয় মনঃকল্পিত—এমন-কি রুদ্রনারায়ণ ও তৎপত্নী রায়বাঘিনীর কার্যকলাপ সন্দেহজনক। কিন্তু ইহা প্রণিধেয় যে, তিনি এবং তাঁহার পুচ্ছগ্রাহী দুই-একজন লেখক মূল বস্তুটিকে সমগ্রভাবে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার চেষ্টা করেন নাই, পরন্তু প্রকৃত বিষয়কে পরস্পর-বিরোধী কুলজীর মধ্য হইতে সন্ধান করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছেন। বিভিন্ন ভ্রান্ত কুলপঞ্জী তাঁহাদের কল্পনা-লোক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। স্থানভেদে ও

কালভেদে তথ্যের অনেক বিভিন্নতা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু সেগুলি সন্ধান ও সংগ্রহ করিয়া সম্ভাব্য বৃত্তান্তকে সুসঙ্গতরূপে গঠন করাই প্রকৃত তত্ত্ববিৎ লেখকের ধর্ম। "রায়বাঘিনী"-গ্রন্থকার সরস উপায়ে খণ্ড খণ্ড বিষয়গুলিকে কল্পনার সেতুবন্ধনে একটি অবিচ্ছিন্ন রূপ-দান করিয়া সেই ধর্ম যথাসম্ভব পালন করিয়াছেন। এ-স্থলে রবীন্দ্রনাথের একটি জ্ঞাতব্য উক্তি উদ্ধৃত করিলে বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হইবে। তিনি বলিয়াছেন : "অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁরা কেবল সংগ্রহ করতেই জানেন, কিন্তু আয়ত্ত করতে পারেন না, তাঁরা খনি থেকে তোলা ধাতু-পিণ্ডটার সোনা এবং খাদ অংশটাকে পৃথক্ করতে শেখেন নি ব'লেই উভয়কেই সমান মূল্য দিয়ে কেবল বোঝা ভারী করেন"।—একটা বিষয়-বস্তুকে সম্পূর্ণ রূপ দিবার পারদর্শিতা ইঁহাদের নাই। কারিকা- ও সমীক্ষা-বুদ্ধি ব্যতীত কোনো বিক্ষিপ্ত বস্তু-নির্বাচন ও বিচ্ছেদগুলি পূরণ করিয়া রচনার একটি অখণ্ড পরিপূর্ণতা আনিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। জন-শ্রুতি, ছড়া, গান, মন্দির, গ্রাম, জলাশয়, মাঠ প্রভৃতির মধ্যে অনেক জানিবার বিষয় নিহিত থাকে। 'সেগুলি তথ্যের টুকরা। সেই টুকরাগুলি যতই টুকরা হোক্, তাহাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসের একটা ব্যঞ্জনা আছে। তাহাদের জুড়িতে গেলে সেই ইতিহাসের বাঁধাধরা আদিম আদর্শ আপনিই অনেকখানি আসিয়া পড়ে। এই আদর্শকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া স্বাধীন হইতে না পারিলে আসল কাহিনীর উদ্ধার হয় না।...ইতিহাসকে কথার আকারে স্থান ও কালের উজ্জ্বল বর্ণনা-দ্বারা সজীব সরস করিয়া দেশের সর্বত্র প্রচার করিবার উপায় অবলম্বন করাই উচিত': ইহা বিজ্ঞেরই নির্দেশ-বাক্য। রবীন্দ্রনাথ আর-এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন: "ইতিহাসকে কেবল জ্ঞানে নহে, কল্পনার দ্বারা গ্রহণ করিলে তবেই তাহাকে যথার্থভাবে পাওয়া যায়"।—আমার পিতৃ-বিরচিত "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী" গ্রন্থে এই সুচিন্তিত অভিমতের সার্থকতা বহুলাংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং ক্রান্তদর্শী মহাজ্ঞানী কবিকুলগুরুর উপদিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া পিতার পূর্ব-কৃত ভূরিশ্রেষ্ঠরাজকাহিনী ও রায়বাঘিনী-বৃত্তান্তের আবশ্যক সংস্কার ও

অলিখিত নূতন বিষয়ের যোগ-সাধন দ্বারা সমগ্র-গ্রন্থটি একসূত্রে বাঁধিয়া অধিকতর চিত্তাকর্ষক ব্যঞ্জনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রকৃতপক্ষে, এই গ্রন্থের ভিত্তি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহার অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা-অবলম্বনে লিখিত—সমস্তটাই কাল্পনিক নহে, প্রমাণ-প্রয়োগে ও সমীক্ষণে তাহা সমর্থিত হইয়াছে। এই সুসংবদ্ধ রাজকাহিনী ও রায়বাঘিনীর ইতিবৃত্তকথাকে মর্যাদা দিতে গিয়া বিশ্বাস-অবিশ্বাসে দোলায়মান চিত্ত অর্ধপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে—'Just like an atheist who half-believes God at night'! "রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ-কাহিনী"-র পূর্ণতার সকল তথ্য সত্যের ন্যায় অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইলেই এই ইতিবৃত্তমূলক কাহিনী সার্থক, ইহাই ইতিহাস। পক্ষান্তরে আমার পিতৃ-প্রবর্তিত "রায়বাঘিনী"-কাহিনী আজিকে সর্বত্রই গৃহীত, অভিধানেও (দ্রঃ আশুতোষ দেব সঙ্কলিত) এই পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য অত্যন্ত শম্বুকগতিতে চলিয়াছে, সেজন্য ইহার প্রকাশে বিশেষ বিলম্ব ঘটিয়া গেল। তদুপরি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও এই গ্রন্থকে নির্ভুল করিতে পারি নাই। অন্যান্য বিষয়ের ত্রুটি ছাড়িয়া দিলেও মুদ্রাকরপ্রমাদ স্থানে স্থানে রহিয়া গিয়াছে, এই কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি শুদ্ধিপত্র যোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গের প্রতি ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবার অনুরোধ রহিল।

ভূরিশ্রেষ্ঠরাজগণ ভিতল রেৎমন্দিরে যে সমস্ত দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—প্রচ্ছদপটে তন্মধ্যে নয়টি বিশিষ্ট মূর্তির চিত্ররূপ অঙ্কিত হইয়াছে, প্রচ্ছদের উর্ধ্ব-ভাগে রায়বাঘিনীর পূজ্যরূপ এবং নিম্নে আকবর-প্রদত্ত সনন্দের চিত্রানুকৃতি। পশ্চাৎপ্রচ্ছদে রাজগণ-প্রতিষ্ঠিত রেখদেউল ও মন্দির চিত্রিত।

আমার পিতৃদেব-প্রদত্ত যে-বংশাবলী "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী"তে মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাই মূলতঃ অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থে রাজবংশলতা প্রকাশ করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে বংশের আরও শাখা-প্রশাখা এবং রাজগুরু-

বংশলতা যুক্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আমি এই রাজকুলের গুরুবংশীয়-হিসাবে পেঁড়োর গড়বাড়ীর ভারতচন্দ্র-বংশের সার্থক পুরুষ অশীতিবর্ষীয় শ্রীবিধুভূষণ রায়কে জানাই। তাহার উত্তরে তিনি লেখেন: "...ভুল বংশাবলী যাহা আপনার পিতাকে দিয়াছিলাম, তাহা খোয়া গিয়াছে, অতএব কিরূপে সে অভাব পূরণ হইবে? 'রায়বাঘিনী' প্রকাশ হইতে দেরী হওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, আমি কিছুদিন হইতে দেখিতেছি যে, চোরের বড় দৌরাত্ম্য বাড়িয়া উঠিয়াছে, ইহারা নানা ভাবে আপনার পিতার রায়বাঘিনী-বৃত্তান্ত নির্লজ্জের মত চুরি করিয়া ইচ্ছামত বিকৃত করিয়া তুলিতেছে। এখন আপনার উপরেই উক্ত চুরি ও ঘটনার বিকৃতি বন্ধ করার দায়িত্ব নির্ভর করে।....'রায়বাঘিনী' প্রকাশের পর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখাইলে, তিনি (বংশলতায়) কিছু ভুল আছে বলেন। সে ভুল সংশোধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও উপায় নাই, কারণ রাজবংশাবলী বসন্তপুরে ঘটকদের বাটীতে ছিল। যাহারা আছে, তাহারা বিশেষ কিছু জানে না। রাম ঘটক ও কেদার ঘটক মহাশয় জানিতেন, তাঁহারা জীবিত নাই। ভারতচন্দ্রের বংশ অমূল্য রায় তাহার মাতুলালয় ভদ্রেশ্বরের মনসাতলায় বাস করে। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই।...আপনি যাহা করিয়াছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। অসুস্থ থাকায় সাহায্য করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত। প্রণাম জানিবেন"।—তাহার পর তাঁহারই যোগাযোগে এই রাজবংশেরই পণ্ডিত শ্রীপঞ্চানন রায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে সময়োচিত সাহায্য-দানে কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

আর-একটি বিশেষ কথা এখানে বলা দরকার। আমার পিতৃ-রচিত "রায়বাঘিনী"-গ্রন্থটির পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ডবল-ক্রাউন ১৭৪; তিনি এই গ্রন্থটি মেদিনীপুর-অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁর নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থ "রায়বাঘিনী ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজকাহিনী" সজ্জায় ও বস্তু-বিন্যাসে নবকলেবর ও পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ইহার প্রকাশ অভিনব। তাই নূতন সংস্করণের নূতন উৎসর্গপত্র প্রবর্তন করা আমার অভিপ্রেত,

এবং এ-বিষয়ে আমার পূজ্যপাদ আচার্যপ্রধান শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত গ্রহণ করিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় আমার পিতাকে স্থানীয় ইতিহাস রচনা করিতে এবং তৎসঙ্গে সম্পূর্ণ ভূরিশ্রেষ্ঠরাজবংশের ইতিবৃত্ত ও ভারতচন্দ্রের বিষয় লিখিতে উৎসাহ ও প্রেরণা দান করেন। পিতৃদেব "হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস" রচনা করিয়া আচার্যপাদের উপদেশ মান্য করেন সত্য এবং আংশিকরূপে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের তান্ত্রিক ব্যাখ্যাও রচনা করেন, কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠরাজকাহিনী ও রায়বাঘিনীর উৎকর্ষ-সাধন অসমাপ্ত রহিয়া যায়। এক্ষণে আমি উভয়ের আশীর্বাদ পাথেয় করিয়া সেই গুরু কার্যভার মাথায় লইয়া সম্পূর্ণ করিয়াছি। ইহা আমার কর্তব্য-পালন মাত্র। আমার পিতৃদেবের সংকলিত বিষয়বস্তু এতদিনে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল, ইহাতেই আমি কৃতার্থ।

যে পুণ্যশ্লোক মহাজনের আশীর্বাদ-পূত জয়পত্র লইয়া "রায়বাঘিনী" আবির্ভূত ও বহুপ্রচারিত হইয়াছিল, সেই মহিমময়ের পুণ্য নাম এই গ্রন্থের সহিত জড়িত করিয়া আমি ধন্য হইলাম।

বাণীকুমার

“বঙ্গ-বীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী” সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

এম্-এ, সি. আই. ই. মহোদয়ের

মন্তব্য

শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “রায়বাঘিনী” নামক পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। ইহাতে মোগল পাঠানের যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব হইতে ভুরস্থটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশের ইতিহাস লেখা হইয়াছে। ভুরস্থট ও নিকটবর্ত্তী পরগণাসমূহে গ্রামে গ্রামে গিয়া এই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। তাহাতে বিধুবাবু বেশ পরিশ্রম করিয়াছেন ও বেশ ইতিহাস-নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর অপ্রতিহতপ্রভাবে দক্ষিণ-রাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীর্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশ ধ্বংস হইয়া যায় ও এই বংশের একজন বাঙ্গালার প্রধান কবি হইয়া উঠেন। ইনিই আমাদের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়। আক্‌বরের সময় এই বংশের একজন রাণী, রাণী ভবশঙ্করী, উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাঢ়দেশ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া বাদ্‌শাহ্ আক্‌বর তাঁহাকে “রায়বাঘিনী” উপাধি দিয়াছিলেন। এখনও বাঙ্গালাদেশে পরাক্রমশালিনী রমণী হইলেই তাহাকে “রায়বাঘিনী” বলিয়া থাকে।

বিধুবাবুর এই উদ্যম অতিশয় প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার উদ্যম যেন এইখানেই শেষ না হয়। ভুরস্থট অতি প্রাচীন স্থান। ৯৯১ খৃষ্টাব্দে এইখানে বসিয়া কায়স্থ পাণ্ডুদাসের জন্য শ্রীধর বৈশেষিক দর্শনের প্রধান ভাষ্য পদার্থ-ধর্ম-সংগ্রহের টীকা লিখিয়া বৌদ্ধগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন। ১০৯২ সালে কৃষ্ণমিশ্র যে প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক লেখেন,

তাহাতেও ভুরস্নুটের ব্রাহ্মণগণের বিদ্যাবুদ্ধি ও জাত্যভিমানের অনেক কথার উল্লেখ আছে। ভুরস্নুট এককালে বাঙ্গালার নবদ্বীপ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫৬ গ্রামীণ বা গাঞী হয়, তখন ভুরস্নুটের নামেও একটী গাঞী হইয়াছিল। ভুরস্নুটের ব্রাহ্মণদিগকে ভূরিশ্রেষ্ঠিক অথবা ভূরিগাঞী বলিত। এই ভূরিগাঞী ব্রাহ্মণেরা এখনও ভুরস্নুট পরগণায় আছেন কি না জানিবার জন্য সকল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরই কৌতূহল আছে। বিধুবাবু যদি এ সকলেরও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া দিতে পারেন, যথার্থ ইতিহাসের উপকার করা হয়।

বইখানি ইতিহাস হইলেও একেবারেই নীরস নহে। পড়িলে নবেলের মত লাগে। আমি ত একদমেই গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মাঝখানে ছাড়িয়া দিতে কষ্ট হইয়াছিল। ভাষা অতি সুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা গ্রামের, নানা দেব-মন্দিরের, নানা যুদ্ধের কথা থাকায় পড়িতে অতিশয় মনোহর হইয়াছে। বিধুবাবু যে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে কালাপাহাড়কেও এই বংশের লোক বলিয়া মনে হয়। কালাপাহাড় বাঙ্গালায়, উড়িষ্যায় অনেক মন্দিরই ভাঙ্গিয়াছেন কিন্তু ভুরস্নুটের একটীও ভাঙ্গেন নাই। ইহাতে তাঁহার কথা অনেকটা সত্য বলিয়াই বোধ হয়। বইখানি ভালই হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার লোকে, বিশেষ বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা পড়িলে অনেক উপকার হইবে। ইতিহাসের মাল-মসলা সব গ্রামেই আছে কিন্তু সব গ্রামে বিধুবাবু নাই, এই-ই দুঃখ।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী

নিবেদন

আমি বাল্যকালে আমার পূজনীয় পিতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য কেদারনাথ তর্কালঙ্কারের মুখে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্যের ব্রাহ্মণ-রাজবংশের কীর্তিকথা অতিশয় আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতাম। তখন মনে হইত, বড় হইলে, ব্রাহ্মণ-রাজগণের রাজধানী, ছাউনাপুরের ভূমধ্যস্থ দুর্গ, বীরাঙ্গনা রায়-বাঘিনীর পড়া, যে স্থলে বীরা রাণী অদ্ভুত বীরত্ব ও সমরকৌশল প্রদর্শন করিয়া মুসলমানগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও অন্যান্য রাজকীর্তি দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিব। এই উদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা করিয়া ও স্বয়ং বহু স্থানে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ-নরপতিগণের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। গড়ভবানীপুরের যে স্থানে রাজবাটী ছিল, সেই স্থানের, ছাউনাপুর গড়ের, রায়বাঘিনীর পড়ার ও অনেকগুলি দেবমন্দিরের ফটো লইয়াছি। গড়ভবানীপুরের মণিনাথ মন্দিরে রাজা দেবনারায়ণ রায়ের নাম ও ১৩০৬ শকাব্দা (!) এখনও খোদিত রহিয়াছে। কয়েক বৎসর হইল, ব্রাহ্মণ-নরপতিগণের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির কতকগুলি দলিল আমার হস্তগত হয়। পণ্ডিতশিরোমণি প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একখানি দলিলের মোহরাঙ্কিত অংশ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্যে পড়াইয়া লন; তাহাতে জানা গিয়াছে যে, মোহরে রাজা নরনারায়ণের নাম লিখিত আছে। নরনারায়ণ ভুরস্থটের একজন বিখ্যাত রাজা। ভুরস্থটে এমন ব্রাহ্মণ অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা নরনারায়ণ-দত্ত ভূসম্পত্তির অধিকারী নহেন।

ভুরস্থটের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় বাঁকিপুর-হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট তাঁহাদের বংশীয় নরপতিগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পেঁড়োর-গড়ের উক্ত রাজবংশীয় শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায়ের নিকট প্রাপ্ত বংশাবলী আমার কার্যের অনুকূল হইয়াছে।

এই পুস্তকের বর্ণিত ঘটনার সর্ব্বত্রই কল্পনাপ্রসূত নহে। নরপতি-গণের কীর্ত্তিকলাপ, শিলালিপি ও দলিলাদি হইতেই অধিকাংশ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। জনশ্রুতির উপরও যে নির্ভর করি নাই, তাহা নহে। কালাপাহাড়ের বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছি, তৎসমস্তই প্রবাদবাক্য অবলম্বন করিয়া। ভুরস্থটের অন্তর্গত মুসলমানপ্রধান পাহাড়পুর গ্রাম কালাপাহাডের স্থাপিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় রাজীবলোচন রায় সুন্দরী মুসলমানকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করেন—এই কথা ভুরস্থটের প্রাচীন লোকগণের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। কালাপাহাড় ভারতের যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের সমস্ত দেবমন্দির চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি যখন উড়িষ্যাবিজয়-মানসে গৌড় হইতে যাত্রা করেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, কিন্তু অনেক প্রাচীন দেবমন্দির শিলালিপি মস্তকে ধারণ করিয়া এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই রাজ্যে কালাপাহাড়ের কোন অত্যাচার-চিহ্ন লক্ষিত হয় না। দেশ-প্রচলিত জনশ্রুতি ও এই ব্যাপার দর্শনে বিশ্বাস হয় যে, পেঁড়োর-গড়ের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় রাজীবলোচনই কালাপাহাড়। কবিকুলকেশরী ভারতচন্দ্রও এই পেঁড়োর-গড়েই প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি রাজা নরেন্দ্র-নাথের পুত্র ছিলেন। পাঠক-পাঠিকাগণের বিশেষ অবগতির জন্য ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের ব্রাহ্মণনৃপতিগণের বংশলতা প্রদত্ত হইল।

পূজ্যপাদ পরমধার্ম্মিক শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থকার

ভূরিশ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণরাজ

বংশলতা

নৃসিংহ

গর্ভেশ্বর

মুরারি　　সূর্য　　গোবিন্দ

বনমালী　　অনিরুদ্ধ　　সৌরী　　ভৈরব

কৃত্তিবাস (কবি)　　গোপাল

মদন

সদানন্দ　　বৈদ্যনাথ

রাজা শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ (গড়ভবানীপুর—জ্যেষ্ঠশাখা)　　রাজা শ্রীমন্তনারায়ণ (পাঁড়ুয়া-গড়)

দেবনারায়ণ

দর্পনারায়ণ　　মুকুটরাম (দোগাছিয়া)　　ভবানী　　দুর্গাদাস　　বসন্ত

উদয়নারায়ণ　　অভিরাম　　বিধি　　গোবিন্দ

সত্যনারায়ণ　　চন্দ্রশেখর　　সাহেবরাম

শিবনারায়ণ　　মহাদেব　　হরিনারায়ণ

শিবনারায়ণ　　　　মহাদেব　　　　হরিনারায়ণ

রুদ্রনারায়ণ : পত্নী রাজ্ঞী ভবশঙ্করী　হরিদেব　　লক্ষ্মীকান্ত　　মৃত্যুঞ্জয়
(রায়বাঘিনী)

প্রতাপনারায়ণ　　বৈদ্যনাথ　　মাণিক

নরনারায়ণ　　ঠাকুরদাস　　কানাই　　রাম
তারিণী

পরাণ　　কৃষ্ণ

লক্ষ্মীনারায়ণ　হিরণ্য　সূর্য　চন্দ্র　কালী　জগৎ
(হীরারাম)

প্রবোধ　　গোবিন্দ

নগেন্দ্র

অতুল　ইন্দ্রপদ

রূপনারায়ণ　রামনারায়ণ　হরনারায়ণ　　হেম　শরৎ　সারদা　চুণী

সনৎ

শ্রীনারায়ণ　মদন　চণ্ডী　শম্ভু　　জানকী　মহিম　অনিল

অম্বিকা　চন্দ্র

ঋষি

সারদা　শশী　হরি

*　*　*

শ্রীমন্তনারায়ণ
(পাঁড়ুয়াগড়—কনিষ্ঠশাখা)

মহেন্দ্রনারায়ণ　　শ্রীবল্লভ

যোগেন্দ্র

অমরেন্দ্র

সুরেন্দ্র

গোপীরমণ　　রাজীবলোচন (কালাপাহাড়)

গোপীরমণ

ভূপতিকৃষ্ণ শ্যামচন্দ্র প্রাণবল্লভ জগজ্জীবন নরোত্তম জনার্দন মধুসূদন

সদাশিব চাঁদ রাজবল্লভ কিশোর কন্দর্প বাণেশ্বর রামসন্তোষ রামেশ্বর
(বাসুদেবপুর)

নরেন্দ্র বংশীধর কাশীশ্বর রসিকলাল শুকদেব

চতুর্ভুজ অর্জুন দয়ারাম ভারতচন্দ্র (কবি) কৃপারাম বাঞ্ছারাম

পরীক্ষিত ভাগবত রামতনু ভগবান্ পঞ্চানন রামশঙ্কর

তারকনাথ রামধন দিবাকর মুচিরাম

রাধাবল্লভ বিনোদরাম শ্রীবল্লভ

অমরনাথ রামকৃষ্ণ

পূর্ণচন্দ্র গোবিন্দ

বেচারাম (মেল্যক)

অমূল্য (ভদ্রেশ্বর)

রামভক্ত ঈশান উদয়চন্দ্র (ন্যায়ভূষণ)

অনন্তরাম ঘনশ্যাম শোভারাম আত্মারাম

সূর্য্যনাথ

রামরাম মাণিকরাম রামপ্রসাদ জয়কৃষ্ণ

সতীশচন্দ্র

গোকুলচন্দ্র গোবর্দ্ধন

পঞ্চানন ভবানীচরণ

রামতারক রামসদয় রামব্রহ্ম

প্রণব পিনাকী পুলক কনক

রামতারক

রামব্রহ্ম
|
পরেশচন্দ্র

বিধুভূষণ বিনয়ভূষণ কৃষ্ণচন্দ্র বিভূতিভূষণ বিজলীভূষণ

জয়গোপাল হরি শিব নৃত্য

অনিলচন্দ্র বঙ্কিম প্রফুল্ল বিমল বিজয় দক্ষিণা সুনীল

* * *

মুকুটরাম
(দোগাছিয়াগড়—প্রশাখা)
|
রূপনারায়ণ
|
জগদ্বল্লভ চন্দ্রশেখর নীলকণ্ঠ চিন্তামণি

জগদ্বল্লভ — শিবচরণ, শ্যামাচরণ

চন্দ্রশেখর — গণেশ (পুলসিট্যা)

চিন্তামণি — গঙ্গাধর — ভিখারীনাথ, নিমচাঁদ, রামচন্দ্র

শিবচরণ — বীরেশ্বর, নকুলেশ্বর (নকুড়)

নকুলেশ্বর (নকুড়) — বলভদ্র — ভবানীশঙ্কর, রামরাম

রাজগুরু-বংশাবলী

ভট্টনারায়ণ

(তদ্বংশ)

*

রামরাঘব

|

বাচস্পতিদেব

|

মতিরাম (ভট্টশিরোমণি)

|

সৌম্যদেব

*

হরিদেব

রাঘবদেব (সিংটি)   রামদেব (দেবীপুর)

(দেবীপুর—পুরোধা-শাখা) * বিদ্যাধর   চূড়ামণি   রামকিশোর * (আঁটপুর—পরমেষ্ঠী-শাখা)

রামচন্দ্র   শ্যামসুন্দর   কালীপ্রসাদ (তর্কশিরোমণি)

রামচাঁদ

মথুরামোহন   ভুবনমোহন

রাধানাথ (স্মার্ত)   মাধব (নৈয়ায়িক)   গোবিন্দ (স্মার্ত)   ক্ষীরোদ

মধুসূদন   মাধব   যাদব   যদু   কৈলাস

নফর   সুরেন্দ্র   নগেন্দ্র   হরিপদ   কেদারনাথ (স্মৃতি-তন্ত্র-শাস্ত্র-বিবুধ)   শশী

মুরারি   মহাদেব   পশুপতি   বিধুভূষণ

হিমাংশু   সনৎ   গোরা

বিধুভূষণ মাধব গোবিন্দ ক্ষীরোদ

বৈদ্যনাথ (বাণীকুমার) জগন্নাথ সাতকড়ি কুমারনাথ

দিলীপকুমার

নৃসিংহকুমার অমিতকুমার তপনকুমার

বামাচরণ পাঁচকড়ি হেরম্ব

আদিত্যভূষণ

আশু শ্রীপদ

প্রমথনাথ (বেদান্তভূষণ)

রজনী উপেন্দ্র নৃত্যগোপাল মন্মথ

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

অবতারণা ... ৵০
মন্তব্য—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৷৵০
নিবেদন—গ্রন্থকার ৷৶০
বংশলতা ১৷০

প্রথম পর্ব

রাজন্য-পুরাবৃত্ত

প্রথম আভাষ : দৈবপ্রেরিত দ্বিজকুমার ৩
চতুরানন ... ৯
ব্রাহ্মণ-রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ... ১৫
সদানন্দের পূর্বপুরুষ-বৃত্তান্ত ... ১৭
৫ সদানন্দ ... ২১
৬ উন্নত ভূরিশ্রেষ্ঠ .. ৩০
৭ রায় শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ ... ৪৫
৮ শ্রীমন্তনারায়ণ ৫১
৯ সংঘাত ও পরিণতি ৫৬
১০ দেবনারায়ণ .. ৭৩
১১ মহেন্দ্রনারায়ণ ৮৭
১২ দর্পনারায়ণ ... ১০৮
১৩ উদয়নারায়ণ ১২১
জনকল্যাণী বিন্দুরতি ও সত্যনারায়ণ ১৩২
শিবনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণের পূর্বকথা ১৩৭

পরাপর্ব

রায়বাঘিনী : বঙ্গবীরাঙ্গনা-ইতিবৃত্ত

রাজা রুদ্রনারায়ণ ও কালাপাহাড়

রাজীবলোচন-বৃত্তান্ত : সমরকাণ্ড ১৪৭
মধুর-নব সমস্যা ১৫৫
মুকুন্দদেব-সকাশে : ভ্রষ্টসন্ধি ... ১৬১

পৃষ্ঠা
৪ দৈবযোগ ১৬৫
৫ উড়িষ্যা-জয় ও দীপনির্বাণ ১৭২
৬ রুদ্রনারায়ণ ... ১৭৮
৭ সাধন-প্রতিমা ... ১৮৩

রাণী ভবশঙ্করী

১ অপূর্ব কিশোরী ... ১৯৫
২ প্রথম দর্শন ১৯৮
৩ মিলন-দৌত্য ... ২০৪
৪ মিলন-তত্ত্ব ... ২১০
৫ লোকমঙ্গল্যা ২১৮
৬ পটপরিবর্তন ২২১
৭ জগজ্জয়িনী বীরশক্তি ২৩৩
৮ প্রত্যাবর্তন ... ২৫৬
৯ নাটিকা ... ২৭৪
১০ অগ্নিচক্র ... ২৮৬
১১ পূর্ণ অভিষেক ২৯৭
১২ কর্মসূত্র ... ৩০৬
১৩ সংগ্রাম ও ভাগ্য-নির্ণয় . ৩১৮
১৪ হোমাগ্নিশিখা ... ৩৪৯
১৫ রায়বাঘিনী ... ৩৬৬

শেষপর্ব

উত্তররাজচরিত

১ প্রতাপনারায়ণ ৪০১
২ নরনারায়ণ ... ৪২০
৩ লক্ষ্মীনারায়ণ ... ৪৩০
পরিশিষ্ট .. ৪৪৫
শুদ্ধিপত্র ৪৪৮

রাজন্য পুরাবৃত্ত

রাজ্ঞী ভবশঙ্করী (রায়বাঘিনী)

দেবদত্ত অসি-চর্ম-হস্তে দৈত্যদর্পনিসূদনী রুদ্রাণীরূপে

মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মানা।

[রায়বাঘিনী : পৃঃ ২৪৬:]

রায়বাঘিনী

প্রথম অধ্যায়

দৈবপ্রেরিত দ্বিজকুমার

ভাগীরথীর দশ ক্রোশ পশ্চিমে, হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থ তারকেশ্বরের প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে এবং দামোদর নদের দেড় ক্রোশ পূর্বদিকে দিল-আকাশ নামক একখানি গ্রাম অবস্থিত। রোণ নামে দামোদরের এক শাখা দিল-আকাশের পশ্চিম প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রবাহিত।

কথিত আছে—এক সময়ে দামোদরের প্রধান স্রোত এই নদী দিয়া প্রবাহিত হইত এবং ইহার উপর বাণিজ্য-তরীসকল সর্বদা ভাসমান থাকিত। দামোদর-তীরস্থ আমতা হইতে এই গ্রাম পাঁচ-ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে দিল-আকাশ একটি ধন-জন-পূর্ণ সমৃদ্ধ স্থান ছিল। এক্ষণে এই গ্রাম ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত দুই-চারি ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও কতকগুলি দুলে-বাগদীর দ্বারা অধ্যুষিত। কেবল ভৈরবীদেবীর মূর্তি ইহার প্রাচীন স্মৃতি এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই গ্রামে অন্য দ্রষ্টব্য কিছু না—

থাকিলেও ভৈরবীদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলে, ইহার প্রাচীন ইতিহাস মনোমধ্যে উদিত হইয়া যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলে, সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে; মনে হয়, যেন পূর্ব-ঘটনাবলী অভূতপূর্ব ভক্তির সঞ্চার করিয়া মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে।

ভারতে মুসলমান-আগমনের বহু পূর্ব হইতে এই গ্রামে ক্ষত্রিয়েতর অবনত হিন্দুগণ রাজত্ব করিত। মুসলমান-শাসন-কালে বঙ্গদেশ বহু পরগনায় বিভক্ত হয়। ভূরশীট্ট পরগনার অধিকাংশ ও নিকটবর্তী অন্যান্য স্থান ইহাদের অধিকার-ভুক্ত ছিল। দশবল চণ্ডডামর নামক এক বাগ্‌দী-সর্দার তাহার কাপালিক-গুরুর নির্দেশে ও কূট বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিজ শক্তি-বলে ভুরস্ুটের বহুস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এই অল্পায়তন স্বাধীন অনার্য-রাজ্যের রাজধানী ছিল দিল-আকাশ। অধুনা দিল-আকাশের পূর্বদিকে খুঁড়ীগাছী নামক একখানি গ্রাম আছে। পূর্বে এই গ্রামে বহুসংখ্যক ভীমদর্শন চণ্ডাল বাস করিত। চণ্ডালগণ দিল-আকাশের পূর্বোক্ত সর্দাররাজগণের সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত থাকিয়া নরহত্যা, লুণ্ঠন ও অন্যান্য পাশবিক অত্যাচার-পূর্ণ কার্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিত। এই গ্রামে এখনও অনেক চণ্ডালের বাস আছে এবং তাহাদের স্থাপিত ভীষণাকৃতি এক কালীমূর্তিও এই স্থানে বিরাজিতা আছেন। এই কালী 'ডাকাতে-কালী' নামে বিখ্যাত।

বর্তমানে ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত দিল-আকাশের পশ্চিম প্রান্তস্থ রোণ নদী ও দামোদরের মধ্যস্থ তাবৎ ভূ-ভাগ প্রাচীনকালে গহন

অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। এই ভয়ঙ্কর বন-মধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, বন্যবরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ এবং হরিণ, বন্যমহিষ, বন্যছাগ প্রভৃতি তৃণভোজী পশুগণ অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়াইত।

বহুসংখ্যক কাপালিক এই অরণ্য-মধ্যে বাস করিত। অনার্য রাজসর্দারগণ তাহাদের পরম ভক্ত ছিল। এইজন্য কাপালিকগণের প্রভাব বহু-বিস্তৃত হইয়া উঠে। রোণ নদের তীরস্থিত দিল-আকাশ এই বাগ্‌দীরাজার শাসন-কেন্দ্র ছিল। রাজার গুরু কাপালিক ভৈরবঘণ্ট রোণ-অরণ্যে বাস করিতেন। কাপালিকের পরামর্শে বাগ্‌দীরাজা ভৈরবীদেবীর মূর্তি স্থাপন করিতে কৃত-সংকল্প হইল, এবং এক অমাবস্যা-তিথিতে এই কাপালিক গুরু দিল-আকাশে পূর্বকথিত ভয়ঙ্করী ভৈরবী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে প্রতি অমাবস্যায় এই ভৈরবীদেবীর সম্মুখে একটি করিয়া নরবলি প্রদত্ত হইত।

বাগ্‌দী-সর্দার শনিভাঙ্গড় এই অনার্য রাজবংশের শেষ রাজা। এই বাগ্‌দীরাজা ভারতে পাঠান-শাসনের প্রথমাবস্থায় রাজত্ব করিত। ইহার রাজত্বকালে দিল-আকাশের চতুর্দিকস্থ গ্রামসমূহে অত্যাচারের ভীষণ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কোন লোকই ধনরত্ন, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া নির্ভয়ে বাস করিতে পারিত না। বলিদানের নিমিত্ত যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আনীত ছাগশিশুর ন্যায় সকলেই আতঙ্কে সর্বদা কম্পিত হইত। সকলে ভাবিত—কখন তাহাদের ধনরত্ন-স্ত্রীপুত্রাদি অপহৃত হয়, কখন তাহারা এই ভীষণ নর-রাক্ষসের কবলে পড়িয়া জীবন বিসর্জন করে! এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়িয়া চতুর্দিকস্থ জনপদের লোকগণ সর্বভয়-

বারণ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবানের নিকট এই নর-রাক্ষসের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। ভগবানও বোধ হয়—তাহাদের অসহ্য দুঃখ আর দেখিতে পারিলেন না।

একদা শনিভাঙ্গড়ের অনুচরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগীরথী-তীরস্থ এক গ্রাম হইতে একটি সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত সুরূপ কিশোর ব্রাহ্মণবালককে অপহরণ করিয়া আনিয়া তাহাদের সর্দারের হস্তে সমর্পণ করে। শনিভাঙ্গড় শুভলক্ষণযুক্ত বালককে দেখিয়া মনে ভাবিল—'মায়ের নিকট ইহাকে আগামী অমাবস্যায় বলি দিয়া ধন্য হইব', এবং এই সংকল্প করিয়া গুরু কাপালিকের রক্ষণে বালককে অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ-কুমার বলি-রূপে প্রদত্ত হইবার বয়স প্রাপ্ত হয় নাই দেখিয়া কাপালিক তাহাকে আপনার নিকট অতিযত্নে লালন-পালন করিতে লাগিলেন। কাপালিক তাহাকে রক্ষা করিবার ছলে রাজাকে বলিলেন—"এই বালক ব্রাহ্মণ-তনয়, ইহাকে দেবীর সম্মুখে বলিদান করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ; অতএব অন্য লোকের অনুসন্ধান কর। ইহাকে বলি দিলে তোমার রাজ্যের অমঙ্গল হইবে।"

রাজা কাপালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালককে বধ করিল না। কাপালিক তাহাকে কয়েক বৎসর রক্ষা করিয়া নানাশাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন; বালকও অসাধারণ ধীশক্তিবশতঃ অল্পদিনের মধ্যে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল। তৎপরে কাপালিক রাজাকে বলিলেন—"এই বালক সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছে, উপস্থিত এখন ইহাকে সমর-কৌশল শিক্ষা দিবার জন্য আমার আন্তরিক অভিলাষ জন্মিয়াছে। বালককে

তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, এক্ষণে ইহাকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করিয়া আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর।"

শনিভাঙ্গড় গুরু কাপালিককে শূদ্রোচিত সংস্কার-বশে যেমন ভয় করিত, তেমনি সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় ভক্তিও করিত, কাজেই তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া বালকের যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষার ভার প্রধান সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিল। বালকও চারি-পাঁচ বৎসরের মধ্যে অশ্বারোহণে ও সমর-কৌশলে সেনাপতিকে পরাস্ত করিল।

এই ব্রাহ্মণ-যুবক চতুরানন নিয়োগী নামে পরিচিত। চতুরানন এই অনার্য-রাজ্যে বিদ্যা-বুদ্ধির প্রাখর্যে, শারীরিক শক্তিতে ও যুদ্ধ-কৌশলে অদ্বিতীয় হইয়া উঠেন। পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে চতুরানন প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির পদ লাভ করিয়া রাজ্যের মঙ্গল-বিধানে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্বে সৈন্যগণ ভিন্ন রাজ্য হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া আনিয়া রাজাকে দিত, রাজাও তাহাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য লুণ্ঠিত দ্রব্যের কিয়দংশ তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিত, এইজন্য প্রায়ই অন্যান্য রাজাদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ হইত। চতুরানন এই অশান্তি দূর করিবার মানসে সৈন্যগণের পদমর্যাদা অনুসারে তাহাদিগকে ভূ-সম্পত্তি দিলেন এবং কৃষিকার্যের দ্বারা যাহাতে সৈন্যগণ জীবিকা-নির্বাহ করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। অনেক বন-জঙ্গল কাটাইয়া, ভূমি কৃষিকার্যের উপযোগী করিয়া দিয়া, প্রজাগণ যাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ

রাজকর নির্দিষ্ট করিলেন। প্রজাদিগকে পশুপালন করিতে শিখাইলেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য বর্ত্ম নির্মাণ করাইলেন। দুর্ব্বৃত্তগণের উপদ্রব নিবারণ-কল্পে স্থানে স্থানে বিচারালয় স্থাপন করিলেন। পীড়া-শান্তির জন্য বৈদ্য আনাইয়া সেই জনপদে বাস করাইলেন। চতুরানন দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া রাজ্য-মধ্যে সুখ-বৃদ্ধি ও শান্তি-স্থাপন করিলেন। শীঘ্রই দেশ শস্য-সম্পদে বহুগুণে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, প্রজাগণের আর বিশেষ কোন কষ্ট রহিল না।

চতুরানন

চতুরানন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া রাজ্যের অনেক উন্নতি-বিধান করিলেন এবং তাঁহার চেষ্টায় বাগ্‌দীরাজার অত্যাচারের পথ কিছু কিছু বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ভৈরবীদেবীর সম্মুখে নরবলি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিলেন না। কি উপায়ে এই ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ ব্যাপার বন্ধ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তিনি সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন রাজ-অনুচর-গণ অমাবস্যার দুই-তিন দিন পূর্বে একটি বালককে ধরিয়া আনিল; রাজা সেই বালকের তত্ত্বাবধানের ভার চতুরাননের উপর অর্পণ করিয়া বলিল,—"অমাবস্যায় দেবীর নিশীথ-পূজা-কালে এই বালকের মস্তকচ্ছেদন করা হইবে; অতএব অতি সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিও। দেখিও যেন কোনরূপে ও পলায়ন করিতে না পারে, তাহা হইলে পূজার অঙ্গহানি হইবে, কারণ আজকাল বলির জন্য সহজে নর পাওয়া যায় না।"

চতুরানন সর্দাররাজের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যথিত হইলেন এবং নরবলি বন্ধ করিবার জন্য রাজাকে নানাপ্রকারে বুঝাইতে থাকেন। তিনি কাপালিক ও রাজাকে এই নিষ্ঠুর প্রথা পরিহার করিতে বারংবার অনুরোধ করেন, ইহা যে ধর্মের নামে অধর্ম—এ-বোধ উভয়ের মনে জাগাইয়া তুলিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইলেন না। কাপালিক ও রাজা কোনমতেই তাঁহার উপদেশ-বাক্য গ্রাহ্য করিল না। কিন্তু তিনি

সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন।—আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি বালককে নিজভবনে আনিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কি উপায়ে এই নিরপরাধ বালকের জীবন-রক্ষা হইতে পারে! তিনি একবার মনে করিলেন—এই বালককে লইয়া সপরিবারে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; আবার ভাবিলেন—না, পলাইব না, দেশের এই ঘোর অত্যাচার যে-কোন প্রকারে পারি বন্ধ করিতেই হইবে, এই উপদ্রব-নিবারণ আজ হইতে আমার জীবনের প্রধানতম ব্রত হইল। এই নরবলি বন্ধ করিতে গিয়া যদি আমার অন্নদাতা রাজাকে বধ করিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না…এই বালককে রক্ষা করিবার জন্য যদি আমার জীবনদাতা প্রতিপোষক কাপালিকের পর্যন্ত বিরাগভাজন হইতে হয়, তাহাতেও ক্ষতিবোধ করিব না…এই বালকের জন্য যদি স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি দ্বিধাগ্রস্ত হইব না। এই বালককে রক্ষা করিতেই হইবে।

চতুরানন এইরূপ স্থির করিয়া নিশীথকালে রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজাগণকে স্বীয় ভবনে আমন্ত্রণ করিলেন। প্রজাগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন: "অদ্য এক গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য তোমাদিগকে এই গভীর রাত্রে আহ্বান করিয়াছি। হে মণ্ডলগণ! আমার দ্বারা দেশের যদি কিছুমাত্র উপকার হইয়া থাকে, আমার প্রতি যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে, তবে আমার একটিমাত্র অনুনয় রক্ষা করিয়া আমার সন্তোষ বিধান কর, আমার জীবনের মহা উদ্বেগ দূর কর।"

সেনাপতির এই সানুনয় কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া প্রধানগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল ঃ "আপনি আমাদের ক্ষুধার অন্ন, পীড়ার ঔষধ, দুঃখের শান্তি, আপনি দেশের মঙ্গলবিধাতা, আমরা দুর্বৃত্ত সর্দাররাজের প্ররোচনায় অশান্তিকর দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করিতাম, আপনি আমাদিগকে সেই নিষ্ঠুর আচরণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, নির্দোষ আনন্দপূর্ণ জীবনোপায় কৃষিকার্য দেখাইয়া দিয়া, আমাদের সমস্ত অভাব দূর করিয়াছেন এবং হৃদয়ে পরমশান্তি দান করিয়াছেন; আপনি সর্ববিধ বিপদ্ হইতে সর্বদা আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আপনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, ভ্রাতা, আপনিই আমাদের সর্বস্ব। আপনি কাতর-ভাবে আমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাতে আমাদের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইতেছে। কি করিতে হইবে—আজ্ঞা করুন, প্রাণ দিলে যদি সে কার্য সাধিত হয়, আমরা তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না।"

মণ্ডলগণের এই বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুরানন বলিলেন ঃ "তোমরা যে আমাকে অন্তরের সহিত ভালবাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা কর—তাহা বুঝিলাম। ভগবান্ সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাদের সর্ববিধ দুঃখ দূর করিয়া সুখ-সম্পদের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিব, তোমাদের এই নিয়মহীন রাজ্যে রাজার ভয়ঙ্কর অত্যাচারে জনগণ সর্বদা ত্রস্ত থাকিত, কাহারও প্রাণে সুখ-শান্তি ছিল না, সকলেই বন্য হিংস্র জন্তুদিগের ন্যায় হিংসা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন-যাপন করিত। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক উপদ্রব নিবারণ করিয়াছি, প্রজাগণের সুখ-সম্পদের

জন্য দিবারাত্র চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একটি ভয়ানক নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবিধান কিছুতেই করিতে পারিতেছি না। এই যে বালক তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আগামী অমাবস্যায় দেবীর সমক্ষে ইহাকে বলি দিবার জন্য অপহরণ করিয়া আনা হইয়াছে। এই নৃশংস আচরণ কোনও উপায়ে নিবারণ করিতে পারিতেছি না। তোমরা সকলে যদি এ-বিষয়ে আমাকে সাহায্য না কর, তাহা হইলে আমি ইহার নিরাকরণে সমর্থ হইব না। আমার একান্ত ইচ্ছা তোমরা সকলে একমত হইয়া নরবলি বন্ধ কর।”

এই কথা শুনিয়া মণ্ডলগণ বলিল: “আপনি আমাদের পিতৃতুল্য হিতৈষী, আপনার আজ্ঞার প্রতিকূলাচরণ করা আমাদের সর্বথা অকর্তব্য, আপনার আদেশে আমরা দুরাত্মা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কুণ্ঠিত নহি, কিন্তু নরবলি বন্ধ করিলে পাছে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়া আমাদের সর্বনাশ করেন ও মহাপুরুষ কাপালিক অঘোরবজ্র অভিসম্পাতে আমাদিগকে সবংশে ধ্বংস করেন, কেবল এই ভয়!”

চতুরানন ইহা শুনিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন: “দেখ, একজনের প্রাণে কষ্ট দিয়া জগদ্ধাত্রী শিবস্বরূপিণী দেবীকে কখনও সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না, বরং তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধা হন। মনে কর—তোমাদের কাহারও পুত্রকে যদি বলপূর্বক লইয়া গিয়া কেহ দেবীর সম্মুখে বলি দেয়, তাহাতে তোমাদের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহাতে কি তোমাদের যৎ-পরোনাস্তি মানসিক কষ্ট উৎপন্ন হয় না? দেবী কি জীবের

প্রাণে কষ্ট দিতে অভিলাষিণী? তবে তাঁহাকে দুঃখহরা বলে কেন? নরবলিতে দেবী সন্তুষ্টা নহেন। তোমাদের দুষ্প্রবৃত্তি-নিচয় দেবীর সম্মুখে বলিদান দিয়া চিরশান্তি ভোগ কর; বহুনিন্দিত নরবলি একেবারে বন্ধ করিয়া দাও।"

চতুরাননের উপদেশপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ বাক্যে সকলেই প্রবুদ্ধ হইয়া বলিল: "কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, আমরা এই মুহূর্তেই তাহা সম্পাদনে কৃতসংকল্প।"

চতুরানন বলিলেন: "অত অস্থির হইলে চলিবে না, বিচক্ষণতার সহিত সমস্ত কার্য সমাধা করিতে হইবে; হঠকারিতা অবলম্বন করিলে রাজ্য-মধ্যে অচিরাৎ অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিয়া দেশ ভস্মসাৎ করিবে। এই নিষ্ঠুর কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য রাজাকে অনেক বুঝাইয়াছি, অনেক অনুনয় করিয়াছি, কিন্তু রাজা নরবলি বন্ধ করিতে কিছুতেই সম্মত নহে; অতএব রাজাকে বিনষ্ট করা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। একজনের বিনাশে যদি জগতের মঙ্গল হয়—তাহা শ্রেয়স্কর। কিন্তু রাজাকে এরূপভাবে বিনষ্ট করিতে হইবে, যেন লোকে আমাদিগের উপর কোন সন্দেহ করিতে না পারে। তাহা হইলে রাজপক্ষীয় ব্যক্তিগণ অত্যন্ত রোষ-পরবশ হইয়া রাজ্যে ঘোর অশান্তি উত্থাপন করিবে, শীঘ্রই যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিয়া দেশ ছারখার করিবে। রাজা অত্যন্ত পানাসক্ত, সর্বদা মদ্যপান করিতে পাইলে আর কিছুই চাহে না।—একটি পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহা মদ্যে পূর্ণ কর, এবং রাজার আত্মীয়, কুটুম্ব, ও বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া অমাবস্যার দিন প্রাতঃকাল হইতে

মহাউৎসবের আয়োজন কর, তাহা হইলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।”—

এই সমস্ত কার্য যথাবিহিত অনুষ্ঠিত হইলে বাগ্‌দীরাজা শনিভাঙ্গড় সবান্ধবে উৎসবামোদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল এবং মদ্য-পুষ্করিণীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া সুরা-পান করিতে লাগিল; অবশেষে তাহার সমস্ত দেহ অবশ হইয়া আসিলে ষড়্‌যন্ত্রকারী একজন মণ্ডল-সর্দার মদ্য-মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া দিল এবং রাজাও ইহলীলা সংবরণ করিল।

বাগ্‌দীসর্দারের মৃত্যুতে তাহার গুরু কাপালিক অঘোরবজ্র বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া সে-স্থান হইতে সত্বর অদৃশ্য হইলেন। চতুরাননের উন্নতির পথে আর কোন খরকণ্টক রহিল না।

৩

ব্রাহ্মণ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা

বাগ্‌দীরাজা শনিভাঙ্গড় নিহত হইলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রজাহিতৈষী চতুরাননকে রাজপদে অভিষিক্ত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। চতুরানন রাজশক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া দিল-আকাশ পরিত্যাগপূর্বক দামোদর-তীরবর্তী ভবানীপুর গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং পূর্ব রাজসর্দারের পরিবার-বর্গের ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া তাহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে একজন সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি ভবানীপুরে প্রাসাদ নির্মাণ ও দেবালয় স্থাপন এবং সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া গভীর পরিখা দ্বারা রাজপুরী পরিবেষ্টিত করিলেন। এই পরিখা দামোদরের সহিত সংযুক্ত হইল। সেই অবধি ভবানীপুর গড়-ভবানীপুর নামধারণ করিল। ভূস্বামীরাজ চতুরানন ভবানীপুর ও তাহার নিকটস্থ গ্রামসমূহে বহু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায়, কুম্ভকার, ক্ষৌরকার, মালাকার প্রভৃতি জাতীয় লোক আনিয়া বাস করাইলেন, অল্পদিনের মধ্যেই ভবানীপুর বহুজনপূর্ণ নগরীতে পরিণত হইল।

রাজা চতুরাননের একটিমাত্র কন্যা-সন্তান ছিল। ফুলিয়া হইতে সদানন্দ মুখোপাধ্যায় নামক এক সর্বগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-যুবককে আনাইয়া তিনি স্বীয় কন্যার সহিত বিবাহ দেন। রাজা চতুরানন সদানন্দকে রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়া রাজ-কার্যের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন এবং সস্ত্রীক হিন্দুদের

পবিত্র তীর্থ কাশীধামে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। চতুরানন চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে অবনত হিন্দুজাতির অনার্যরাজ্য উচ্ছেদ করিয়া ব্রাহ্মণরাজ্য স্থাপন করেন। অসভ্য প্রজাগণকে সভ্য করিতে তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। অনেকাংশে তিনি দেশে কৃষিকার্যের উন্নতিবিধান করেন। তিনি রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য বংশ-পরিচয় সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত।

সদানন্দের পূর্বপুরুষ-বৃত্তান্ত

রাজা চতুরাননের জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া, 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজা সদানন্দের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিবার পূর্বে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের কিঞ্চিৎ পরিচয়-প্রদান এস্থলে আবশ্যক। মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন, তন্মধ্যে শ্রীহর্ষ অন্যতম। এই শ্রীহর্ষের বংশে নৃসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। নৃসিংহের প্রপৌত্র বনমালী; বনমালীর পুত্র বঙ্গসাহিত্যের আদিকবি কৃত্তিবাস।

বিশ্রুতকীর্তি মহাকবি কৃত্তিবাস প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইনি বাল্মীকি-রামায়ণ সুললিত সরল ভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অভূতপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তাঁহার সেই অমৃতোপম মধুর ঝঙ্কার এখনও বঙ্গমাতৃকার নর-নারীর হৃদয়ে আনন্দ-বর্ধন করিতেছে; বঙ্গবাসী সেই রামায়ণ-কাব্যামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছে। এই কবিচূড়ামণি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে ফুলিয়া নামক গ্রামে। এক সময়ে ফুলিয়া গ্রাম অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও পণ্ডিতের আবাস-ভূমি ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ স্থান কালের কুটিল আবর্তনে নিষ্পেষিত হইয়া মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে; কবিবরের বাসভবনের চিহ্ন পর্যন্ত নাই; কিছুদিন

হইল, বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীগণের উদ্যোগে কবিবরের স্মৃতিরক্ষার্থ সেইস্থানে একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস স্বরচিত রামায়ণের অনেকস্থলেই জন্মভূমির সুখ্যাতি করিয়াছেন—

"স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস।
রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ॥"

কৃত্তিবাসের বাল্যজীবনের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে তাঁহার স্বরচিত আত্মবিবরণ হইতে যতদূর জানা যায়, তাহা এই,—

"আদিত্যবারে শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
পথি-মধ্যে জন্ম লইলেন কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লইল কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিল প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বার-তে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারে উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা-তথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে॥

বিত্তা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হইল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিত্তা সমাপন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উঝাকার।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিত্তার উদ্ধার ॥
গুরুস্থানে মেলানি হইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিল মোরে অশেষ বিশেষে ॥"

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, কৃত্তিবাস নানা বিত্তায় পারদর্শী এবং অশেষ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। নিম্নলিখিত কবিতায় স্পষ্ট প্রকাশ রহিয়াছে যে, তিনি কবিরত্ন উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন।

"পুনঃ পুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে।
সুন্দরাকাণ্ডেতে গীত কবিরত্ন ভণে ॥"

কবির নিজের কথা ব্যতীত, ধ্রুবানন্দ মিশ্র ফুলিয়ার মুখটি বংশের পরিচয়-দান-কালে বলিয়াছেন : "কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সৌম্যঃ শান্তঃ জনপ্রিয়ঃ।"

কৃত্তিবাস তদানীন্তন গৌড়েশ্বরের রাজসভায় সভাপণ্ডিত হইবার জন্য পাঁচটি শ্লোক রচনা করিয়া রাজসমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত বাক্যে তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইতেছে—

"রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥"

অশেষ শাস্ত্রবিৎ না হইলে, কেহ রাজপণ্ডিত হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা

মনোমধ্যে স্থান দেয় না। অধিকন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ লোভশূন্য ছিলেন, তাহাও সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়······তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন—

"নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্র-মিত্র বলে—রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র-মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথা গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥"

গৌড়েশ্বর কবি-শিরোমণি কৃত্তিবাসের কবিতা-শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া, তাঁহাকে বহু অর্থদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিস্পৃহ ধার্মিক কবি বিদ্যায় তন্ময় হইয়া, রাজার দান অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাই তাঁহার নিকট মহামূল্য রত্ন এবং বিদ্যার

গৌরবই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল। এই মহাপুরুষ শুভক্ষণে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; ইঁহার অমৃতময়ী রামায়ণী কথা বঙ্গের গৃহে গৃহে, এমন কি, রাজভবন হইতে সামান্য ভিখারীর পর্ণকুটীর পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিকল্প মহাপণ্ডিতের গৃহ হইতে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান-শূন্য মহামূর্খের গৃহ পর্যন্ত সকল স্থানেই সমানভাবে বহু শতাব্দী যাবৎ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। এরূপ শুভাদৃষ্ট অতি অল্প কবির ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। বঙ্গের ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সুখী, দুঃখী, রোগী, শোকী, সকলেই যে সুধা-স্রোতে আজ প্রায় ছয় শতাব্দীকাল ভাসমান হইয়া অপার আনন্দ-রস ভোগ করিতেছে, এই অপ্রমেয় সুখ-বিধাতা—কবি কৃত্তিবাস। বঙ্গদেশে এই চিরানন্দ দান করিয়া, কৃত্তিবাস আজ দেবতুল্য পূজনীয়, কৃত্তিবাস আজ অমর পদবী-প্রাপ্ত। যে-বংশে এ-হেন মহাকবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশও ধন্য। সেই বংশের সন্তানগণের কি মহাভাগ্য! কি মহা-আনন্দ যে, তাঁহাদের বংশীয় পূর্ববর্তী একজন মহাপুরুষের মহাদানে সমস্ত বঙ্গভূমি আজ আনন্দ-বিভোর। এরূপ সর্বজনভোগ্য দান কেহ কখনও বঙ্গদেশে করে নাই, করিতে পারিবে কি-না সন্দেহ!

মহাকবি কৃত্তিবাসের এক ভ্রাতা গোপাল পণ্ডিতের বংশধরগণ বঙ্গদেশে যে অলোকসামান্য কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণও লোক-সমাজের গোচর করিতে পারিলে, এক গৌরবপূর্ণ প্রচ্ছন্ন ইতিবৃত্তের নব-ব্যঞ্জনায় বাঙালীর অন্যতম কীর্তির অধ্যায় সন্নিবিষ্ট হইবে।

সদানন্দ

গোপাল পণ্ডিতের মদন নামে এক পুত্র ছিল। মদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র সদানন্দ অত্যন্ত রূপবান্ ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ অবয়ব, উন্নত ললাট, আকর্ণবিশ্রান্ত নয়ন, সুবঙ্কিম ভ্রূযুগ, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, গোলাপ-গঞ্জিত বর্ণ ও সহাস্য বদন দেখিলে বোধ হইত যেন কামদেব নর-দেহ ধারণ করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুন্দর দেহ বোধ হয় তৎকালে বঙ্গদেশে অতি-বিরল ছিল। তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, অতি যত্ন-সহকারে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেন এবং সর্বক্ষণই আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন, এমন-কি সামান্য সময়ের জন্যও তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতেন না। একদা গড়-ভবানীপুরের ভূস্বামী-রাজ চতুরানন ধর্ম-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের মীমাংসার জন্য বঙ্গদেশীয় প্রধান পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করেন। সেই সময় গোপাল পণ্ডিতও আহূত হন। তিনি রাজসভায় আসিবার সময় প্রিয় পৌত্র সদানন্দকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন সদানন্দের বয়স পঞ্চদশবর্ষ। সদানন্দ রাজসভায় উপনীত হইলে, সভাস্থ সকলেই তাঁহার রূপে আকৃষ্ট হইল, সকলেই নির্নিমেষ-লোচনে তাঁহার রূপ-লাবণ্য সন্দর্শন করিয়া সৌন্দর্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। রাজাও তাঁহার রূপে চমৎকৃত হইলেন। প্রথম দর্শনেই

বালকের উপর রাজা অন্তরে অন্তরে একটা বিপুল স্নেহের আকর্ষণ অনুভব করিলেন। রাজা চতুরানন তাঁহার একমাত্র সুরূপা ও গুণময়ী কন্যার সহিত সদানন্দের শুভমিলন ঘটাইবার অভিলাষ করিয়া, শুদ্ধান্তচারিণী রমণীদিগকে দেখাইবার জন্য সদানন্দকে অন্তঃপুর-মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। পুরনারীগণ বালকের মনোহর মূর্তি দেখিয়া বিমোহিত হইল এবং রাণী তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে সদানন্দের হস্তে সমর্পণ করিতে দৃঢ়সংকল্পা হইলেন। অতঃপর প্রজা-বৎসল ধার্মিক নরপতি চতুরানন এই বিবাহে গোপাল পণ্ডিতকে স্বীকৃত করাইলেন। শুভদিনে শুভকর্ম সম্পন্ন হইল।

রাজকন্যা তারাদেবী স্বামীর একান্ত অনুগতা হইয়া প্রাণপণে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বহু দাস-দাসী সত্ত্বেও তারাদেবী স্বীয় হস্তে পতির সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন, তাঁহাকে বুঝিতে দিতেন না যে—তিনি শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। সদানন্দ আচারবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজজামাতা ও রাজার উত্তরাধিকারী হইয়াও ব্রাহ্মণের আচারমত অনেক কার্য করিতেন; তিনি নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা ও পূজা করিতেন। তারাদেবী স্বহস্তে পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেন এবং স্বামী পূজায় অভিনিবিষ্ট হইলে, একান্ত মনে ইষ্টদেব বোধে তাঁহার ধ্যানে মগ্ন হইতেন। স্বামীর আহার্য-দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক তাঁহাকে ভোজন করাইতেন, স্বয়ং স্বামীর শয্যা-রচনা করিয়া দিতেন এবং স্বামী শয়ন করিলে পদ-প্রান্তে বসিয়া চরণ-সেবা

করিতেন ; স্বামীর বিনা অনুমতিতে কখনও শয়ন করিতেন না। সংক্ষেপতঃ স্বামীর সকল কার্যে তিনি সহায় ছিলেন। এই সকল কার্য তিনি বাধ্য হইয়া বা সংস্কার-বশে যে করিতেন —তাহা নহে ; স্বামীর কার্য করাই তাঁহার জীবনের আনন্দ ছিল, স্বামীর সুখ-বিধানই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

সদানন্দ রাজ-কার্যে সুদক্ষ হইলে, রাজা চতুরানন শেষ বয়সে সংসার-ত্যাগ করিয়া পত্নীসহ তীর্থ-বাসে তৃতীয়-আশ্রমী হইলেন। সদানন্দ রাজা হইয়া রাজ-কার্য চালাইতে লাগিলেন। চতুরানন রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, বাগ্‌দীরাজড়া-বংশীয় সেনানী অতি গোপনে রাজগদি পুনরুদ্ধার করিবার চক্রান্ত করিতে লাগিল, এবং বাগ্‌দী ও চণ্ডালদিগকে ব্রাহ্মণ-রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে সচেষ্ট হইল। রাজ্য-মধ্যে কিছু বিশৃঙ্খলার লক্ষণ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। তখন পঞ্চদশ শতাব্দের পূর্বার্ধ।

রাজা সদানন্দ দিবসের অধিকাংশ সময় জপ, তপ ও অধ্যয়নে যাপন করিতেন, অবশিষ্ট সময় রাজকার্য পর্যালোচনায় ও আহারাদি কার্যে অতিবাহিত করিতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও শিষ্টাচারী ছিলেন। সহজাত ঋজুপ্রকৃতি ও সারল্য-হেতু কাহাকেও তিনি সহজে অবিশ্বাস করিতেন না, কাজেই সেনানীর কার্যে তিনি প্রথমতঃ সংশয়ান্বিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু তারাদেবী পিতার শিক্ষা-গুণে কূট রাজনীতিতে যথাশক্তি পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন ; তিনি স্বামীর কার্যের সহায়তা করিবার জন্য রাজ্য-সম্বন্ধীয় সমস্ত সংবাদ গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়া অবগত হইতেন ; তিনি সেনানায়কের কার্যে সন্দিহান হইয়া

রাজ্য-সম্পর্কে সমস্ত বিশৃঙ্খলা এবং সেনানী যে গোপনে গোপনে ভুক্তপূর্ব পিতৃসম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে, তদ্বিষয়ে রাজা সদানন্দের মনে প্রতীতি আনিয়া দিলেন। তারা দেবীর পরামর্শে সদানন্দের চৈতন্যোদয় হইল; তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও এক্ষণে রাজ্য-শাসন-রূপ ক্ষত্রিয়-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন, সর্বদা জপে-তপে দিন অতিবাহিত করিলে চলিবে না—এ-কথা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ সৈন্যই বাগ্‌দী ও চণ্ডাল-বংশীয় ছিল। তজ্জন্য তিনি ভাবিতে লাগিলেন, যদি সেনানায়ক সেই নিরক্ষর সৈন্যদলকে স্ববশে আনয়ন করিয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে, তাহা হইলে কিরূপে তিনি বিদ্রোহ দমন করিবেন!

অতঃপর তিনি সম্যক্ বিচার করিয়া স্থির করিলেন যে, অন্য জাতীয় সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি ব্যতিরেকে রাজ্য রক্ষা করিবার উপায়ান্তর নাই। তদনুসারে তিনি মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক ধুরন্ধর ধীবর-কৈবর্ত আনাইয়া সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করিলেন এবং তাহাদিগকে সমর-কৌশলে সুনিপুণ করিয়া তুলিতে বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার রাজ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক নদ-নদী-পূর্ণ ছিল; তিনি বহু রণতরী নির্মাণ করাইয়া স্থানে স্থানে নৌ-সেনা-নিবাস স্থাপন করিলেন। তৎকালীন রণতরী বর্তমান কালের রণতরীর ন্যায় ছিল না। এই তরীর গঠন: ৫০।৬০ দাঁড়-বিশিষ্ট লম্বা লম্বা ছিপ, ইহাতে ৩০০।৪০০ লোক বসিতে পারিত। ছিপগুলি গণ্ডার-চর্মে আচ্ছাদিত হইত এবং ছাউনির দুই পার্শ্বে তীর-নিক্ষেপের জন্য বহুসংখ্যক ছিদ্র

থাকিত। ধনুর্ধর যোদ্ধৃগণ ছিদ্রের পার্শ্বে বসিয়া তীর নিক্ষেপ করিত। রাজা সদানন্দ অল্পদিনের মধ্যে ২০-হাজার কৈবর্ত-ধীবর-সেনাকে স্থলযুদ্ধে ও জলযুদ্ধে সুনিপুণ করিয়া, শশাঙ্ক চক্রবর্তী নামক এক ব্রাহ্মণকে সেনাপতি করিলেন। পুনরায় রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। বাগ্‌দী ও চণ্ডালদিগের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি কাড়িয়া লইলেন এবং সামান্য বেতনে তাহাদিগের কতকগুলিকে চৌকিদার ও পাইকের কার্যে এবং কতকগুলিকে অধস্তন সৈনিকের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বর্বর অবনত জাতিদিগের সমস্ত ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া স্বীয় রাজ্য সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ করিলেন। রাজধানীর চতুর্দিকস্থ সুগভীর পরিখার পার্শ্বে প্রায় আধ ক্রোশ বিস্তৃত বেউড় বাঁশ রোপণ করিয়া রাজপুরীকে অভেদ্য দুর্গে পরিণত করিলেন। এই উপায়ে অন্ত্যজ-শ্রেণীর দুর্দান্ত ব্যক্তিগণকে দমনপূর্বক রাজধানী সুদৃঢ় করিয়া তিনি নির্বিঘ্নে কৃষির উন্নতি-কল্পে মনঃসংযোগ করিলেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—দামোদর নদ ও অধুনা রোণ বা মাদারের খাল নামে বিখ্যাত সরিতের অন্তর্গত সমস্ত ভূভাগ নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ ছিল। রাজা চতুরানন বন পরিষ্কৃত করাইয়া দিল-আকাশের নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ ভূমি-ভাগ কৃষিকার্যের উপযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত নদীদ্বয়ের মধ্যস্থিত অধিকাংশ ভূমি তখনও হিংস্র শ্বাপদ-পূর্ণ গভীর বনে আচ্ছন্ন ছিল। রাজা সদানন্দ দেশে শান্তি স্থাপন করিয়া, বন পরিষ্কৃত করাইতে আরম্ভ করিলেন এবং ধীবর ও কৈবর্তদিগকে বাস করাইয়া বহু গ্রামের

প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে কৈবর্তগণ সুদক্ষ কৃষক হইয়া উঠিল এবং দেশ ক্রমশঃ ধন-ধান্যে সমৃদ্ধিশালী হইতে লাগিল। রাজ্যের আয় শতগুণ বর্ধিত হইল। ধান্য, ইক্ষু, কার্পাস ও তামাকের চাষে প্রজাগণ ধনশালী হইতে লাগিল। দামোদর-তীরস্থ ইক্ষুজাত গুড় সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বঙ্গদেশে সর্বত্র আদৃত হইয়া আসিতেছে; এখনও এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহা ভুরস্টে-তামাক বলিয়া পরিচিত।—যে সমস্ত প্রজা নূতন কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারিত, রাজা তাহাদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য পুরস্কৃত করিতেন এবং সম্মান-সূচক 'মণ্ডল' উপাধি দিতেন। কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করিবার অভিপ্রায়ে রাজা অনেক কৃষিতত্ত্ববিৎ কর্মচারী নিযুক্ত করেন; তাঁহারা রাজকীয় ক্ষেত্রে নানাবিধ শস্য ও ফলবান্ বৃক্ষ উৎপন্ন করিতেন এবং কৃষির সহজ ও সুবিধাজনক উপায়-উদ্ভাবনে সর্বদা চেষ্টমান থাকিতেন। এই রাজকর্মচারীগণ প্রজাবৃন্দকে কৃষিকর্মে শিক্ষা দিতেন এবং ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে সকল কৃষক আলস্য-বশতঃ কৃষিকার্যে অবহেলা করিত, রাজা তাহাদিগকে দণ্ডিত করিতেন। এইরূপে রাজা সদানন্দ স্বল্পকালের মধ্যে অরণ্যময় সমস্ত ভূমি শস্যশালিনী করিয়া তুলিলেন। 'অভাব' শব্দ নাম মাত্রে পর্যবসিত হইল। প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধি দেখিয়া অন্যস্থান হইতে বহুলোক আসিয়া এই জনপদে বাস করিতে লাগিল। রাজ্য ধনে-জনে পূর্ণ হইল। পশ্চিমবঙ্গে ভুরসুট উর্বরতার জন্য পূর্বে এবং এখনও সুবিখ্যাত।

দামোদর ও মাদারের খালের মধ্যবর্তী যে-সমস্ত গ্রাম অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, সেই গ্রামগুলির প্রতিষ্ঠাতা রাজা সদানন্দ। কর্মবীর সদানন্দ বহুসংখ্যক গ্রাম ও নগর স্থাপন করিয়া, শিল্পের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মানবজাতির জীবনধারণের প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় অশন-বসন। কৃষির উন্নতি করিয়া রাজা খাদ্যাভাব দূর করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্য-মধ্যে বস্ত্রের অত্যন্ত অভাব লক্ষিত হইল ; এই অভাব দূরীকরণ মানসে রাজা সদানন্দ বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে তন্তুবায় আনাইয়া রাজ্যে বাস করাইলেন। এখনও তন্তুবায়-প্রধান অনেক গ্রাম ভুরস্থটে বর্তমান, এখনও ভুরস্থটে শতসহস্র বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে। প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবারে হাওড়ায় যে দেশী কাপড়ের হাট বসে, সেই হাটে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার দেশী বস্ত্র বিক্রীত হয়, এবং সেই বস্ত্রের জন্যই বঙ্গবাসী আজিও তাঁতের দেশীয় বস্ত্র পরিধান করিতে পাইতেছেন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই সকল বস্ত্রের অর্ধেকেরও অধিক আজিও ভুরস্থটে উৎপন্ন হইতেছে। এখনও কৃষ্ণনগর, আঁটপুর, রাণীবাজার, বিড়ালা, রাজবলহাট, পেড়েলা, আটঘরা, কল্‌মে, লোহাগাছী, মোড়া প্রভৃতি গ্রাম বস্ত্র-বয়নের শব্দে দিবারাত্রি মুখরিত। রাজবলহাটে গমন করিলে, মনে হয়—যেন ইংলণ্ডের মান্‌চেস্টার নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই রাজবলহাট গ্রামে ৩।৪ হাজার তন্তুবায়ের বাস।

ভূস্বামীরাজ সদানন্দ বস্ত্রবয়ন-শিক্ষার ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি করিয়া বঙ্গদেশের যে মঙ্গল-সাধন করিয়াছেন, অনেক

প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতিও তাহা করিতে পারেন নাই। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এই সাধনযোগী মহাপুরুষের নাম পর্যন্ত আজ বঙ্গবাসীর অপরিজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গে কার্পাস-বস্ত্রের যিনি প্রবর্তয়িতা বলিলেও অতিবাদ-দোষ জাগে না, সেই জনহিতৈষী মহাত্মার সামান্য জীবন-চরিত পর্যন্ত আজ বঙ্গ-ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অণুমাত্র স্থান পায় নাই। ইহা বিস্মৃত, অবহেলিত। এই রাজবলহাট গ্রামের বিষয় যখন বর্ণিত হইবে, রাজার অদ্যাপি বর্তমান কীর্তিসকল যখন বঙ্গবাসী মল্লিখিত ইতিহাসে পাঠ করিবে, আমার কথায় যদি কাহারও সন্দেহ হয়, যদি কেহ এই গ্রন্থ উপন্যাস বিবেচনা করেন, তিনি যেন স্বয়ং অন্তত: রাজবলহাট গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাজার কীর্তিকলাপ স্বচক্ষে দেখিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করেন।

৬

উন্নত ভূরিশ্রেষ্ঠ

রাজা সদানন্দ বস্ত্রবয়ন-শিল্প ভিন্ন অন্যান্য শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তিনি খিলে-বারুইপুর গ্রাম স্থাপন পূর্বক অনেক কর্মকার ও সূত্রধর আনাইয়া, তাহাদের বসবাসের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। খিলের সূত্রধর এবং কল্যাণচকের কুম্ভকার এখনও প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজত্বকালে বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। রাজবলহাট, গড়ভবানীপুর, আমতা, উলুবেড়িয়া ও তমলুক তৎকালে প্রধান বন্দর ছিল; শত সহস্র বাণিজ্যতরী নানাবিধ পণ্যদ্রব্য এ-দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাইত এবং অন্য দেশ হইতে শাল, সেগুন, এবং লৌহ, পিত্তল, তাম্র প্রভৃতি ধাতু, পশমী ও রেশমী বস্ত্র এ-দেশে আনয়ন করিত। কাংস্য ও পিত্তল নির্মিত পাত্রের জন্য আমতা পূর্বকালে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল।

রাজ্যের এই সমস্ত উন্নতি-বিধান করিয়াও রাজার মনে শান্তি হইল না, কারণ—রাজ্যমধ্যে তখনও বিদ্যা-চর্চার ও ধর্ম-আলোচনার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। তিনি এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক গ্রামেই বিদ্বান্ ও ধার্মিক ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনেন এবং তাঁহাদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করেন। প্রায় প্রত্যেক গণ্ডগ্রামেই তিনি সংস্কৃত-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তন্মধ্যে খানাকুল (কৃষ্ণনগর), আঁটপুর, পশপুর, কুল-আকাশ প্রভৃতি গ্রামগুলি বিদ্যা-চর্চার জন্য তদবধি সমধিক

প্রসিদ্ধি-লাভ করে। রাজা অনেক গ্রামে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রত্যেক দেবালয়ে সন্ধ্যারতির পর সাধারণ ব্যক্তি-গণকে ধর্মশিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে শাস্ত্রজ্ঞ কথক নিযুক্ত করেন। দিবসের কাজকর্ম সম্পন্ন করিয়া জনগণ নিকটস্থ দেবালয়ে উপস্থিত হইত এবং ভক্তির সহিত আরতি দেখিয়া ও ধর্মকথা শুনিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। এই সমস্ত দেবালয়ের মধ্যে অদ্যাপি বর্তমান দুই-চারিটি বহুবিদিত দেবালয়ের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।

মুসলমানদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া এবং হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়া—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য নবশাকগণ এই রাজ্যের গণ্ডগ্রামগুলিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। রাজা সদানন্দের রাজ্য অচিরে আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ হইয়া উঠিল, দুঃখ যেন সভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিল। দস্যু-তস্করের ভয় বিদূরিত হইল।—প্রজাগণ যেন রামরাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

প্রজাগণের জলকষ্ট দূর করিবার জন্য সদানন্দ তাঁহার অধিকারভুক্ত জনপদের অনেক স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর খনন করাইয়া দেন। এখনও স্বচ্ছ সলিল-কুমুদ-কহ্লারে শোভিত বহু সরোবর অতীত কীর্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখনও এই স্বচ্ছ সরসী-নীর পান করিয়া অসংখ্য লোক তৃষ্ণা দূর করিতেছে। এই সকল দীর্ঘিকা বা সরোবরের নিকটস্থ গ্রামে কখনও জলকষ্ট হইবে কি-না সন্দেহ, কারণ—এখনও এই সমস্ত দীঘি ৭০।৮০ হাত গভীর রহিয়াছে।

সদানন্দের রাজত্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থকেই পশু-পালন করিতে হইত। প্রতি গ্রামে পশুদিগের চারণ-ভূমি নির্দিষ্ট থাকিত। গো-মহিষাদি পশুগণ সমস্ত দিন চরিয়া বেড়াইত এবং সন্ধ্যাগমে স্ব স্ব আবাস-স্থানে গমন করিত। যাহার অন্ততঃ একটি গাভী কিংবা একটিও ধানের মরাই না থাকিত, সে লোক-সমাজে নিন্দিত হইত। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়, যে ব্যক্তি চাল ও দুধ কিনিয়া খায়, তাহাকে লোকে লক্ষ্মীছাড়া বলিয়া ঘৃণা করে। প্রাচীনকালে হিন্দুমাত্রেই গো-পালন করিত বলিয়া, অতি দরিদ্র ব্যক্তি পর্যন্ত পরম উপাদেয় সর্বশ্রেষ্ঠ গব্য দুগ্ধ পান করিতে পাইত এবং তাহারা নীরোগ শরীরে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিবার সৌভাগ্য-লাভ করিত।

হিন্দুগণ পূর্বের ন্যায় যদি আবার গাভীকে ভগবতীজ্ঞানে পালন করিতে পারে, যদি আবার তাহারা ঘরে ঘরে গোধন রক্ষা করে, তবেই আবার পূর্ববৎ দীর্ঘজীবন-লাভে সমর্থ হইবে। বঙ্গবাসীর বাঁচিবার প্রধান মন্ত্র হওয়া উচিত—কৃষিকার্য ও পশু-পালন। একদা রাজা সদানন্দ এ-বিষয়ে অবহিত হইতে জনগণকে কেবল বাধ্য নয়, উৎসাহিতও করিতেন।

সদানন্দ একজন আদর্শ রাজন্য ছিলেন। এই পরম-ধার্মিক রাজাকে কর্মযোগী ও রাজর্ষি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। যে মহাপুরুষের শিক্ষা-গুণে সদানন্দ এতদূর আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই শিবতুল্য মহাযোগীর নাম রামরাঘব ভট্টাচার্য। ইনি ভট্টনারায়ণের পুত্র সিদ্ধপুরুষ সুবুদ্ধি মিশ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তন্ত্রোক্ত সর্ববিধ সাধনায়

শ্রীশ্রীরাজবল্লভী দেবী

[রায়বাঘিনী—রাজন্যপুরাবৃত্ত : পৃঃ ৩৩]

সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাশক্তিমান্ হন। এই মহাত্মাই সদানন্দের গুরু। ইঁহারই উপদেশে রাজা রাজকার্য পরিচালনা করিতেন, ইঁহারই উপদেশে রাজা ভুরসুট পরগনার উত্তরদিকে দামোদর-তীরে একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় রাজবল্লভীদেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবীর নামানুসারেই গ্রামটি রাজবল্লভীহাট বা রাজবলহাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেবী গৌরাঙ্গী, মৃন্ময়ী, চতুর্ভুজা। দেবীর চতুঃপার্শ্বে চারিটি শিবমূর্তি বিরাজিত। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির, পশ্চাতে রন্ধনশালা। নাটমন্দিরের দক্ষিণে পুষ্করিণী। এখনও বহু নর-নারী নানাবিধ ব্যাধি-প্রশমনের আকাঙ্ক্ষায় এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া দেবীর পূজা দিয়া থাকে। রাজা দেবীর পূজা ও ভোগের জন্য বহু দেবত্র দান করিয়া গিয়াছেন। সেই সম্পত্তির আয় হইতে এখনও পূজা ভোগ সেবা চলিয়া থাকে। রাজা সদানন্দ রাজবল্লভীদেবীর সেবার জন্য রাজবলহাট গ্রামে বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বাহ ও পালধি উপাধিধারী তিনজন আচারবান্ ধার্মিক ব্রাহ্মণকে নিবাসী করিয়া, পৌরোহিত্য কার্যের জন্য তাঁহাদিগকে ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এখনও উক্ত বংশীয় দেবল ব্রাহ্মণগণ দেবীর পূজাদি ও সেবায় ব্রতী থাকিয়া রাজদত্ত ভূমি ভোগ করিতেছেন। পুরোহিত প্রথমে ফল ও মিষ্ট দ্রব্য-যুক্ত তণ্ডুল-নৈবেদ্য দ্বারা দেবীর পূজা করেন, তৎপরে অন্ন, ব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টকাদি রন্ধন করিয়া দেবীকে উৎসর্গ করেন। সমাগত দীন-দুঃখী ও সন্ন্যাসীগণ এই উৎসর্গীকৃত অন্ন-প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য হয়। পূর্বে ভারতবর্ষে কি যে সুন্দর নিয়ম ছিল—ভাবিলে চমৎকৃত হইতে

হয় ; সমস্ত কার্যই ধর্মের সহিত বিজড়িত। অতি পাষণ্ড কুকর্ম-রত মহামূর্খ, দীন-দুঃখী আতুরগণও প্রসাদের লোভে দেবালয়ে আগমন করিয়া দেবীর পূজাদি সন্দর্শনে হৃদয়ের পাপ-তাপ দূর করিতে সমর্থ হইত, তাহাদের হৃদয়ে ধর্মভাবের উদয় হইত, ক্রমশঃ ঈশ্বর-প্রেমে অনুরক্ত হইয়া তাহারা নরজন্ম সফল করিত। দেবীর পূজক ব্রাহ্মণগণ এবং ঢাকী, মালাকার, কুম্ভকার, ঘড়িয়াল প্রভৃতি সকলেই অদ্যাপি রাজ-দত্ত ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতেছে।

রাজবল্লভী দেবী সম্বন্ধীয় একটি সুন্দর আখ্যান প্রচলিত আছে।

•••একদিন রাজা সদানন্দ মৃগয়ানন্তর রাজবলহাট গ্রামের নিকটবর্তী দামোদর-তীরস্থ শিবিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং তাঁহার সম্মুখে শিকার-লব্ধ পশুগণের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি এই সকল নিহত মৃগ দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন : হায়! আমি কি নরাধম, আমি পবিত্র ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেন রাজকন্যাকে বিবাহ করিলাম ; কেন আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের সাত্ত্বিক আচার পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষত্রিয়গণের রাজসিক বৃত্তি অবলম্বন করিলাম! আমি কি কুকর্মই না করিয়াছি! আমি কোথায় ব্রাহ্মণোচিত অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবনে শান্তি লাভ করিব, না—বর্মাচ্ছাদিত কলেবরে অসি-চর্মে সজ্জিত হইয়া ক্ষত্রিয়োচিত কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অবিরত উদ্‌বেগ ও আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছি। সত্যব্রহ্মকে ভুলিয়া অসত্য জগতের

মায়ায় মোহিত হইয়া ভোগ-বিলাসে পশুবৎ জীবন-যাপন করিতেছি, প্রাণবিহঙ্গ যে এই মুহূর্তেই দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া পলাইতে পারে, তাহা একবারও ভাবিতেছি না। তখন রাজ্য ধন কোথায় পড়িয়া থাকিবে, স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জন কেহই আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। যখন কৃতান্তের করাল কিঙ্করগণ আসিয়া শিয়রে দণ্ডায়মান হইবে, তখন এই ভবধাম ত্যাগ করিয়া কোন্ অনির্দেশ্য স্থানে চলিয়া যাইতে হইবে, মৃত্যুর পর কোথায় যাইব, কিরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইব, তাহা কি জানিবার কোন উপায় নাই!—রাজা এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শিবিরের বহির্দেশে আসিয়া দামোদর-সৈকতে উপস্থিত হইলেন। দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন, দিবসের আলোক তখনও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নাই, পক্ষীগণ আশ্রয়-অন্বেষণে ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়াইতেছে, দামোদর-নীর রজতধারার ন্যায় উভয় পার্শ্বে বহুদূরবিস্তৃত সুবর্ণসৈকতের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, দূরে গ্রাম-মধ্যে সান্ধ্য মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি যেন তমোময়ী নিশাদেবীর আবাহন-সুর তুলিতেছে···রাজা ধীরে ধীরে দামোদর-পুলিনে পদচারণা করিতেছেন। তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন—কিয়দ্দূরে নদীতটে একটি মনুষ্যমূর্তি উপবিষ্ট। রাজা কৌতূহল-পরবশ হইয়া সেই স্থানে গমনপূর্বক দেখিলেন—বালার্ক-দীপ্তিশালী, রুদ্রাক্ষমালা-বিলম্বিতকণ্ঠ, উন্নতবপু, ধ্যান-স্তিমিতলোচন এক ব্রাহ্মণ পদ্মাসনে ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন। তিনি ব্রাহ্মণের উন্নত ললাট, গভীর ভাবোদ্দীপক বদনমণ্ডল ও তেজোময় দেহ দেখিয়া ভক্তিভরে নতজানু হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

সেই মহাপুরুষের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপ অবস্থায় প্রায় অর্ধপ্রহর অতীত হইলে ব্রাহ্মণের ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন : "আপনি কে ? আমার সম্মুখে এরূপভাবে বসিয়া আছেন কেন ? আপনাকে মহাশক্তিশালী, উন্নতচেতা পুরুষ বলিয়া অনুমান হইতেছে, রাজলক্ষণ আপনার দেহে বর্তমান, আপনি কি রাজা সদানন্দ ?"

রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পদধূলি গ্রহণপূর্বক মস্তকে ধারণ করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে বলিলেন : "প্রভো, দাস আপনার কৃপা-ভিখারী সদানন্দই বটে। আপনার দিব্যমূর্তি দর্শনে দাস আজ কৃতার্থ হইল। ভগবন্! অনুগ্রহপুর্বক দাসের সহিত শিবিরে আগমন করুন। সংসার-সাগরোর্মিতে পড়িয়া আজ আমার জীবন-তরণী মহা-বিক্ষুব্ধ—দয়াপূর্বক জীবন-তরীর কর্ণধার হইয়া তাহাকে সুপথে চালনা করুন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন : "চল বৎস ! তোমাকে দুই-একটি উপদেশ দিবার জন্যই আমি এখানে অদ্য আগমন করিয়াছি।"

রাজা সদানন্দ ব্রাহ্মণকে শিবিরে লইয়া গিয়া উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট করাইলেন, এবং যথেষ্ট সৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "মহাত্মন্, আমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের আচার পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষত্রিয়-ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি; ঈশ্বর-আরাধনায় জীবন-যাপন না করিয়া মিথ্যা সাংসারিক কার্যে সময় অতিবাহিত করিতেছি; আমার হৃদয় ছাড়িয়া শান্তি যেন নির্বাসনে গিয়াছে, দুঃখানলে মন সর্বদা পুড়িয়া যাইতেছে; কিরূপে ভগবান্ লাভ হইবে, কিরূপে মায়ামোহ দূরীভূত হইবে,

কিরূপে প্রাণে অনন্ত শান্তি-ধারা প্রবাহিত হইবে—তাহার উপায় বলিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন। এ রাজকার্য আর ভাল লাগিতেছে না, ব্রাহ্মণ হইয়া ক্ষত্রধর্ম পালন করিতে আর ইচ্ছা হয় না।"

দ্বিজবর উত্তর করিলেন ঃ "রাজন্! আপনি কি রাজপুত্র, অথবা নিজের ইচ্ছায় রাজা হইয়াছেন? মহাশক্তির মহা-ইচ্ছায় আপনাকে রাজদণ্ড ধারণ করিতে হইয়াছে। আপনার কি সাধ্য যে, আপনি রাজকার্য পরিত্যাগ করেন! অহঙ্কার বিসর্জন দিন, ভগবানের ইচ্ছার সহিত ন্যায়-ইচ্ছা মিলিত করুন। আপনি কি জানেন না—যখন ক্ষত্রিয়শক্তি সমাজ রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়, তখন ভগবান্ ব্রাহ্মণ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া ধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিয়াছেন, আবশ্যক-বোধে কখনও কখনও দুর্বৃত্ত-দমনের জন্য অস্ত্র-ধারণ পর্যন্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশে আর ক্ষত্রিয় রাজা নাই, আপনি আদর্শ ভূপতি হইয়া কিরূপে রাজ্য-শাসন করিতে হয়, বঙ্গদেশে অন্যান্য রাজন্যদিগকে শিক্ষা দিন, ইহাই আপনার জীবনের উদ্দেশ্য। মুসলমান-শাসনে হিন্দুধর্ম শিথিলমূল হইয়া পড়িতেছে; বিধর্মীগণ বলপূর্বক লোকদিগকে মুসলমান-ধর্মে দীক্ষিত করিতেছে, সুন্দরী স্ত্রী কাড়িয়া লইতেছে, দেবমন্দির চূর্ণ করিতেছে। এখন যদি ভারতে আপনার ন্যায় নিঃস্বার্থ কর্মবীরগণ হিন্দুর জাতি ও ধর্ম রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে অচিরে এই উন্নত ধর্ম ছিন্নমূল তরুর ন্যায় অধঃপতিত হইবে। দেখুন, ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতিই আজ বিধর্মীরাজের অনুগত; তাহারা যাবনিক পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছে, মুসলমানরাজগণ তাহাদিগকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত

করিয়া তাহাদের সাহায্যে দেশ শাসিত করিতেছে। তাহারাও ব্যক্তিগত অস্থায়ী স্বার্থের বশবর্তী হইয়া সামাজিক স্বার্থ ধ্বংস করিতে অগ্রবর্তী হইয়াছে। দেশের এই দুর্দিনে আপনাকে রাজদণ্ড চালনা করিতেই হইবে, সাধারণ লোকদিগকে সনাতন হিন্দুধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার উপায় করিতে হইবে। মুসলমান-গণ অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ ভস্মীভূত করিয়াছে, ধর্মোপদেশক ব্রাহ্মণগণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতেছেন—আপনি তাঁহাদের আশ্রয় হউন, তাঁহাদিগকে ধর্মকার্যে উৎসাহিত করুন। গ্রামে গ্রামে ব্রাহ্মণগণ যাহাতে ধর্মোপদেশ দান করেন, তাহার বিধান করুন। রাজ-শক্তির আশ্রয় না পাইলে ব্রাহ্মণগণ সমাজের আর কোন উপকারই করিতে পারিবেন না; ব্রাহ্মণগণের বিধান স্বার্থপরতা-প্রসূত বলিয়া লোকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। উন্নত শূদ্রদিগকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কার্য অর্পণ করিয়া ঐ অভাব পূর্ণ করুন। সুবিস্তৃত কর্মক্ষেত্র আপনার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, সেই কার্য পরিত্যাগ করিয়া যদি আপনি তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন, তাহাতে কেবল আপনার নিজেরই উন্নতি-সাধন হইবে, জগতের কিছু উপকার হইবে না। সংসার কর্মক্ষেত্র—সেই ক্ষেত্রের প্রধান কৃষক ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্মের শিক্ষাদাতা। সম্প্রতি আদর্শ হিন্দুরাজা বঙ্গদেশে নাই, আপনি সুন্দররূপে রাজ-কার্য পরিচালনা করিয়া দেশ ও সমাজ সুদৃঢ় করুন, হিন্দু-ধর্ম রক্ষা করুন। ধর্মরক্ষা করাই ব্রাহ্মণ-জীবনের প্রধানতম কর্তব্য। অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের কার্য করিতেছেন—বিবেচনা

করুন। প্রাণপণে কর্ম করিয়া যান, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন না, ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করুন। দেখিবেন—জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূরে পলায়ন করিবে, শান্তির আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হইবে।"

রাজা বলিলেন: "ভগবন্! আমার এমন শক্তি নাই, যাহাতে আপনার আদেশ-মত কার্য করিতে সমর্থ হইব। আমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সাত্ত্বিক আচরণই আমার অত্যন্ত প্রিয়। যদি বুঝিয়া থাকেন, পরমেশ্বরের ইচ্ছানুসারেই আমাকে রাজদণ্ড ধারণ করিতে হইয়াছে—তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার করুন, যাহার দ্বারা আমি স্বার্থজ্ঞান ধ্বংস করিয়া ভগবৎ-কার্যবোধে জনগণের সেবা-রূপ রাজকার্য পরিচালনা করিতে পারি। দাস আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল—অদ্য হইতে আপনি তাহার জীবনের নিয়ামক ও পরিচালক।"

তৎপরে এই মহাতেজা ব্রাহ্মণ রাজাকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, এবং এই মহর্ষির উপদেশ অনুসারেই রাজা সদানন্দ 'শবসাধনায়' সিদ্ধিলাভ করেন। এই ব্রাহ্মণের নামই পূর্বোল্লিখিত রামরাঘব ভট্টাচার্য। শবসাধনা-কালে মহামায়া গৌরবর্ণা, চতুর্ভুজা, ষোড়শী রমণীমূর্তিতে রাজাকে দর্শন দেন এবং প্রত্যাদেশ করেন: "বৎস! তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি এই গ্রামে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমার শিবতুল্য গুরুদেবের আদেশক্রমে কার্য করিবে। তোমার দেহে ও হৃদয়ে সর্বদা মহাশক্তির সঞ্চার থাকিবে; তুমি যখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিবে—তাহাতেই সিদ্ধিলাভ করিবে।"

এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অতঃপর রাজা ঐ গ্রামে চতুর্ভুজা যুবতী রমণীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার রাজবল্লভী নাম রাখেন, এবং রাজবল্লভীদেবীর নামানুসারেই ঐ গ্রাম রাজবল্লভীহাট নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজা রাজবলহাট গ্রামে এক প্রকাণ্ড সরোবর এবং বহুসংখ্যক দীঘি খনন করান। রাজবলহাট-বাসী জনগণ আজ পর্যন্ত সেই দেবী-দীঘির সুনির্মল জলে স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করিতেছে এবং পবিত্র বারি পান করিয়া ধন্য হইতেছে।

রাজা সদানন্দ রাজবলহাটের উপকণ্ঠে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ সৈন্য এই দুর্গে বাস করিত; এখনও ঐ স্থান লশকর- বা নস্করডাঙ্গা নামে অভিহিত। বেতন-ভুক্ সৈন্য ব্যতীত ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতীয় বলিষ্ঠ ব্যক্তিকেই সমর-কৌশল শিক্ষা করিতে হইত এবং আবশ্যক হইলে তাহাদের সকলকেই শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া দেশ রক্ষা করিতে হইত। রাজবল্লভীদেবী-প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা বৎসরের অধিকাংশ সময় রাজবলহাটে বাস করিতেন। কথিত আছে—রাজা সদানন্দ একদিবস রাজবল্লভীদেবীর পূজা করিতে করিতে সমাধিস্থ হন, তাঁহার সেই সমাধি আর ভঙ্গ হয় নাই।

রাজার দেহত্যাগের পর রাণী তারাদেবী সমস্ত ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেন এবং গুরুদেব রামরাঘব ভট্টাচার্যের নিকট ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেন। রাণী রাজবলহাটের প্রায় আধ ক্রোশ পূর্বে এবং আঁটপুরের নিকটবর্তী স্থানে অষ্টধাতু-নির্মিতা এক

দেবীমূর্তি স্থাপন করেন। ঐ দেবীমূর্তি সিদ্ধেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধা। দেবীর মন্দিরের দুইপার্শ্বে দুইটি শিবমন্দির ও সম্মুখে নাটমন্দির। চতুর্দিক প্রাচীর-বেষ্টিত। প্রাচীরের চতুর্দিকে ২০-বিঘা পরিমাণ উদ্যান; উদ্যানের চারিপার্শ্বে গভীর পরিখা। পরিখার পূর্বদিকে একটি প্রকাণ্ড দীঘি। পরিখার কিছু পশ্চিমে আর একটি প্রকাণ্ড দীঘি। এই দুইটি দীঘি অদ্যাপি 'রাণীর দীঘি' নামে পরিচিত, এবং যে গ্রামে দেবীমূর্তি বিরাজিত, সেই গ্রামটির নাম 'রাণীর-বাজার',—রাণী তারাদেবীর নামানুসারে এই গ্রামটির নাম রাণীর-বাজার হইয়াছে। রাণী এই গ্রামেও বহু তন্তুবায়-বাসের ব্যবস্থা করেন। দেবীর পূজা ও ভোগসেবা নির্বাহের জন্য রাণী বহু দেবত্র সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, এবং রাজবল্লভী দেবীর যেরূপ নিয়মে পূজা-ভোগসেবাদি নির্দিষ্ট আছে, সিদ্ধেশ্বরী দেবীরও তদ্রূপ নির্দিষ্ট ছিল।

দেবীর সেবার জন্য বহু সম্পত্তি উৎসৃষ্ট থাকিলেও আজকাল আর নিয়মিত সেবা-পূজাদি হয় না; দেবীর মন্দির সংস্কারাভাবে পতনোন্মুখ, নাটমন্দির ও চতুর্দিকস্থ প্রাচীর বহুকাল ভূমিসাৎ হইয়াছে। সুন্দর উদ্যান নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে; বহু প্রাচীন দুই-একটি আম্রবৃক্ষ অতীত সৌভাগ্যের সাক্ষ্যদান করিবার জন্যই যেন এখনও দণ্ডায়মান। চারিধারের পরিখা প্রায় ভরাট হইয়া আসিয়াছে। পরিখার পূর্বপার্শ্বস্থ সুবৃহৎ সরোবর এখনও চারিদিকের গ্রামসমূহের পানীয় জল দান করিতেছে বটে, কিন্তু দীঘির উচ্চ পাহাড় বনে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দুইটি বাঁধাঘাট ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার চিহ্ন

পর্যন্ত লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। মন্দিরের কিছু পশ্চিমে রাণীর বড়দীঘি। দীঘির চতুর্দিক উচ্চ মৃত্তিকা-পাহাড়ে বেষ্টিত। এই সরোবরের পরিমাণ প্রায় দুইশত বিঘা, ইহার একপ্রান্তে দাঁড়াইলে অন্য প্রান্তের লোক ক্ষুদ্রাকারে দর্শন-সাধ্য হয় এবং সুপরিচিত ব্যক্তিকেও চিনিতে পারা যায় না। কাকচক্ষুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অগাধ জলরাশি এখনও সরোবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গ্রীষ্মকালে পবন-হিল্লোলে যখন এই জলরাশি তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উত্থাপন করিয়া তটদেশে আসিয়া আহত হয়, তখন দর্শক-চিত্তে যে অদ্ভুত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। মনে হয়—যেন কালিন্দী-তটে দণ্ডায়মান হইয়া বিচিত্র তরঙ্গ-লীলা সন্দর্শন করিতেছি। সরোবরের পূর্বতটে আভীর-পল্লী। এই সরোবর এখনও 'রাণীর দীঘি' নামে পরিচিত।

ভূ-সম্পত্তির যে আয় আছে, তাহা যদি দেবসেবায় সমস্ত অর্পিত হয়, তাহা হইলে পূর্বের ন্যায় আবার প্রত্যহ ১৫।২০জন দীন-দুঃখী ভোগের প্রসাদ পাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে। আবার সন্ধ্যারতি দেখিয়া গ্রামীণ জনগণের প্রাণে ধর্মভাবের উদ্রেক হইতে পারে এবং রাজরাণীর অতীত কীর্তি রক্ষিত হয়। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি, হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেব-সেবা না করিয়া লোকে এখন নিজের উদর পূর্ণ করিতে তৎপর। প্রাচীনকালে ধনী হিন্দুগণ দেবালয় স্থাপন করিয়া অনেক অসমর্থ লোকের অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেন এবং স্থানীয় লোকসকলও বিশুদ্ধ আনন্দের সন্ধান পাইয়া ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত থাকিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর, দায়িত্বজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিগণ

এরূপ লোকহিতকর দেবালয় স্থাপন, পুষ্করিণী খনন করা দূরে থাক্, যাহাতে প্রাচীন কীর্তিকলাপ রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে সামর্থ্য সত্ত্বেও চেষ্টিত নহে। এই সিদ্ধেশ্বরীদেবীর সম্পত্তি একজন নিঃস্বার্থ পরোপকারী ব্যক্তির হস্তে পড়িলে, দেশের যে কত উপকার সাধিত হইতে পারে—তাহা বলা বাহুল্য। আশা করি রাজবংশীয় যাঁহারা এক্ষণে বর্তমান আছেন, তাঁহারা যেন সচেষ্ট হইয়া পূর্ব মহাপুরুষগণের কীর্তি রক্ষা করেন এবং সেই রাজবংশের উপযুক্ত বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে প্রমাণ করেন। ক্ষমতাসত্ত্বে যাঁহারা পিতৃপুরুষের নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্ন না করেন, তাঁহাদিগের প্রকৃত গৌরব-বোধ নাই, তাঁহারা মর্যাদাশালী মনুষ্য নামের অনুপযুক্ত। তাঁহারা কুলভূষণ আখ্যার পরিবর্তে কুলদূষণ নামেরই যোগ্য।

রায় শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ

রাজা সদানন্দ পরলোকগমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ সিংহাসনারোহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য ও মধ্যোত্তর-ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময়ে দিল্লীর সুলতানের নিরন্তর অত্যাচারে অনেক রাজপুত ভাগ্যান্বেষী দিল্লীর বহুদূরবর্তী নদ-নদী পরিপূর্ণ বঙ্গদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ তাঁহারা নিজ ভুজবলে এক-একটি অঞ্চলের নায়ক হইয়া উঠেন। রাজপুতবংশীয় বিষ্ণুদাস নামক জনৈক বীরপুরুষ জঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগরের পূর্বদিক্‌বর্তী একটি স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থান সুগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া অগম্য দুর্গে পরিণত করিয়াছিলেন; এই স্থান অধুনা 'বাহিরগড়' নামে প্রসিদ্ধ। রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাহিরগড়ে বাস করিতেছেন।

রাজপুত বিষ্ণুদাস একজন যুদ্ধবিদ্যা-পারদর্শী বীরপুরুষ ছিলেন। * কথিত আছে—তিনি 'মাল্যরাজ বা ধীবররাজের গড়' অধিকারপূর্বক যে বিস্তৃত ও সুদৃঢ় গড় নির্মাণ করেন—তাহাই 'বাহিরগড়' নামে পরিচিত।···তিনি স্থানীয় বাগ্‌দী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ-গোষ্ঠীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে লাঠি ও তরবারি চালনায় সুনিপুণ করিয়া, তাহাদের সাহায্যে তত্রত্য ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের ধনীদিগের ধনরত্ন বলপূর্বক আহরণ এবং

---

* এই রাজপুত "বিষ্ণুদাস" সম্বন্ধে মতভেদ আছে, ইঁহার স্বরূপ নির্ণয় কঠিন হইলেও—একদা অস্তিত্ব ছিল।

অন্যান্য সম্ভবপর উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ করিয়া নিজ ধনভাণ্ডার পূর্ণ ও স্ফীত করিতে তৎপর হন। এইরূপে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়া 'রাজা' উপাধি গ্রহণপূর্বক বাহির-গড়ের নিকটবর্তী স্থানসমূহ শাসন করিতে থাকেন ও ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ রায় শ্রীকৃষ্ণনারায়ণের প্রাধান্য অস্বীকার করেন।

বিষ্ণুদাসের এইপ্রকার অন্যায় আচরণে কৃষ্ণনারায়ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দমন করিবার জন্য স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর মহেশ্বাস রণনিপুণ শ্রীমন্তনারায়ণকে বহুসংখ্যক সৈন্যসহ প্রেরণ করিলেন। শ্রীমন্ত দিল-আকাশের অদূরবর্তী (পরে খ্যাত) তাড়াজল নামক গ্রামে শিবির স্থাপন করিলেন। এক্ষণে রোণ বা মাদারের খাল নামে প্রখ্যাত নদীতে একটি সুসজ্জ বৃহৎ নৌবহর শ্রীমন্তের পৃষ্ঠরক্ষা করিতে লাগিল।

একদিন নিশীথকালে বিষ্ণুদাস রাজা শ্রীমন্তকে আক্রমণ করিলেন; রাজা শ্রীমন্তের সৈন্যগণ তখন ঘোরনিদ্রায় অভিভূত। এইরূপ অতর্কিত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া রাজা শ্রীমন্তের বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইল এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ প্রাণ-ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। রাজা শ্রীমন্ত রণতরীর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিষ্ণুদাসের সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া রাজা শ্রীমন্তকে বন্দী করিবার জন্য নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রণতরীসকল গণ্ডারচর্মে আবৃত ছিল, সেইজন্য বিষ্ণুদাসের সৈন্যগণ বিপক্ষ নৌ-সেনার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল

না, কিন্তু নৌকাস্থিত তীরন্দাজগণের অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহার বহু সৈন্য হতাহত হইতে লাগিল। এদিকে রাজা শ্রীমন্ত পলাতক সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া শত্রুর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবার জন্য অরবিন্দ নামক জলযুদ্ধকুশল এক ধীবরকৈবর্তকে অনুমতি করিলেন। অরবিন্দ তাড়াজলের উত্তরদিকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে সৈন্যগণকে দেখিতে পাইল এবং তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া শত্রুর দক্ষিণপার্শ্ব আক্রমণ করিল। উভয় দিকে আক্রান্ত হইয়া বিষ্ণুদাসের সৈন্যগণ ভগ্নোদ্যমে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অরবিন্দের সৈন্যগণ শত্রুর পশ্চাদ্ধাবমান হইল। পথিমধ্যে বিষ্ণুদাস নিহত হইলেন।

নদী হইতে নৌবল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষ্ণুদাস সসৈন্যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া ঐ স্থান 'তাড়াজল' নামে এবং অরবিন্দ যেস্থানে পলাতক সৈন্যগণকে সমবেত করিয়াছিলেন, সেইস্থান 'অরবিন্দপুর' নামে অভিহিত হয়। এখনও ধীবরগণ অরবিন্দপুরের প্রধান অধিবাসী।

রাজসৈন্য বাহিরগড় অবরোধ করিল। বৎসরাধিক কাল উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিল, তৎপরে খাদ্যাভাবে গড়ের সকল লোক অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। সঞ্চিত শস্য নিঃশেষিত হইলে, তাহারা ছাগ মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিল। পুরী-মধ্যে ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি হইল এবং অনেক বালক-বালিকা উপযুক্ত খাদ্যাভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। পুরীর ভিতরে এই মহাদুর্দৈব উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুদাসের বীরা রমণী নিষ্কাশিত

অসি-করে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, দুর্গদ্বার উন্মোচনপূর্বক শত্রুসৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়াইলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন : "আমি সেনাপতি রাজা শ্রীমন্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষিণী।"

সৈন্যগণ দুর্গদ্বার উন্মুক্ত দেখিয়া মহোল্লাসে পুরী-মধ্যে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল। রমণী অসি উত্তোলনপূর্বক বলিলেন : "সৈন্যগণ—তোমরা আর অগ্রসর হইয়ো না; আমি দুর্গদ্বারে জীবিতাবস্থায় উপস্থিত থাকিতে তোমাদের পুরী-প্রবেশের সাধ্য নাই। তোমরা রাজা শ্রীমন্তকে আমার প্রণাম জ্ঞাপন কর। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আমি দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছি।"

সৈন্যগণ মহাশক্তি-স্বরূপিণী বীরা নারীর এই তেজোগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরস্ত হইল এবং রাজা শ্রীমন্তের নিকট গমন করিয়া সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র শ্রীমন্ত সসম্ভ্রমে রমণীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নির্ভীক ভাব-দর্শনে অতীব চমৎকৃত হইয়া কহিলেন : "আমিই রাজা শ্রীমন্ত; আপনি কুলমহিলা, আমার সহিত আপনার সাক্ষাতের প্রয়োজন কি?"

রমণী সগর্বে উত্তর করিলেন : "যুদ্ধে আমার স্বামী নিহত হইয়াছেন; সুদীর্ঘ অবরোধে পুরীমধ্যস্থ জনগণ খাদ্যাভাবে ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে; আমি জীবিত থাকিয়া পুরীর এই দুরবস্থা আর দেখিতে পারিতেছি না। আমার প্রার্থনা—আপনি এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তাহাতে

যদি অস্বীকৃত হন, তবে অসি গ্রহণ করুন, শক্তি থাকে—দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমায় পরাস্ত করিয়া পুরীতে প্রবেশ করুন।"

রাজা শ্রীমন্ত গম্ভীরভাবে কহিলেন: "স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধ করা কাপুরুষতা।"

রমণী বলিলেন: "পুরী অবরুদ্ধ করিয়া অনাহারে শত শত নরনারীর প্রাণবধ করাই কি মহাপৌরুষ?"

তেজস্বিনী মহিলার এই শ্লেষোক্তি শ্রবণে রাজা শ্রীমন্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন: "আপনি বশ্যতা স্বীকার করিলেই তো সকল দিক্ রক্ষা হয়। আপনার স্বামীই বলপূর্বক আমাদের রাজ্যাংশ হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইজন্যই এই অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বৃত্তকে দমন করা রাজার কর্তব্য। ভূরিশ্রেষ্ঠপতি কৃষ্ণনারায়ণের আমি আজ্ঞাধীন। অতএব আপনি আমার কার্যে দোষারোপ করিতে পারেন না। আপনার নির্ভীকতায় আমি অতিমাত্র প্রীত হইয়াছি, আপনি রাজা কৃষ্ণনারায়ণের প্রাধান্য স্বীকার করুন, আমি এই মুহূর্তেই সসৈন্যে এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।"

রাজা শ্রীমন্তের এই কথা শুনিয়া রমণী বলিলেন: "আমি রাজা কৃষ্ণনারায়ণের প্রাধান্য স্বীকার করিলাম। কিন্তু আমার স্বামীর অধিকৃত অঞ্চল আমার বংশধরগণ শাসন করিবে।"

রাজা শ্রীমন্ত উত্তর করিলেন: "আপনার স্বামী রাজদ্রোহী দুরাচারী এক সুগঠিত দস্যুদলের নায়ক ছিলেন, তিনি রাজা ছিলেন না; অনিয়মকেই তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং পরস্বাপহরণই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য ছিল; আমাদের

রাজ্যের যে অংশ তিনি বলপূর্বক অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পুনরুদ্ধারের জন্য এই যুদ্ধের অবতারণা। অতএব আপনি কিংবা আপনার বংশধরগণ আপনার স্বামীর অধিকৃত স্থান আর শাসন করিতে পাইবেন না। তবে আপনার বীরত্বে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, সেইজন্য বাহিরগড় আপনাকে জায়গীর স্বরূপ দান করিলাম; কিন্তু যুদ্ধকালে আবশ্যক হইলে আপনার বংশধরগণ ভুরস্থটরাজকে সাহায্য করিতে বাধ্য রহিল।"

বাহিরগড়ের এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাজা শ্রীমন্ত ভবানীপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বাহিরগড় অবরোধ-কালে রাজা শ্রীমন্ত যে-স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থান রাজা কৃষ্ণনারায়ণের নামানুসারে অদ্যাপি কৃষ্ণনগর নামে প্রসিদ্ধ। রাজার অভিপ্রায়ে ও সুব্যবস্থায় বহুসংখ্যক তন্তুবায় ও ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকে। 'বাগীশ' উপাধিকারী ব্রাহ্মণগণ এখনও এই গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ পূর্বকালে মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহারাই রাজার স্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যালয়সমূহে অধ্যাপনা-কার্য করিতেন বলিয়া 'বাগীশ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

কৃষ্ণনগরের পূর্ব ও উত্তর দিকে অনেক দুর্দান্ত রাজপুত বাস করিত; তাহারা লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিত; নগরবাসী নিরীহ প্রজাগণ তাহাদের ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক থাকিত; সেইজন্য রাজা কৃষ্ণনারায়ণ রাজপুতগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য কৃষ্ণনগরে প্রভূত বলশালী, মহাধনুর্ধর, সমরনিপুণ, সুদীর্ঘদেহ তারাশঙ্কর নামক এক ব্রাহ্মণকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ কৃষ্ণনগরের উত্তর-সীমায় বাস করিত বলিয়া সেই স্থান জঙ্গীপাড়া নামে অভিহিত হয়। তারাশঙ্করের কলেবর সুবৃহৎ ছিল, সেজন্য রাজা তাঁহাকে 'দীর্ঘাঙ্গী' উপাধি দান করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি দীর্ঘাঙ্গী অভিধায় জঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন। তৎকালে কৃষ্ণনগরে হাট, বাজার, বিদ্যালয়, বিচারালয় ও বহুলোকের বাস থাকায়, ইহা একটি মহানগরীতে পরিণত হইয়াছিল। অধুনা এই স্থানে ম্যালেরিয়ার মহাপ্রকোপ সত্ত্বেও তিন-চারি হাজার লোকের বাস আছে এবং ইহা একটি গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিচিত। আজকাল কৃষ্ণনগর বস্ত্রবয়ন-শিল্পের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

রাজা কৃষ্ণনারায়ণ আর-একটি নগর স্থাপন করিয়া তথায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানেরও কৃষ্ণনগর নাম হয়। জঙ্গীপাড়া-কৃষ্ণনগর হইতে প্রভেদ করিবার জন্য ইহাকে খানাকুল-কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করা হয়।

তৎকালে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে উক্ত বিদ্যায়তনে মনোবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, স্মৃতি, চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা হইত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন, প্রবর্তন ও পরিবর্তন করিতেন। বহুকাল পর্যন্ত খানাকুল-কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশে সংস্কৃত ও অন্যান্য বিদ্যাচর্চার একটি কেন্দ্রস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও হিন্দুসমাজে খানাকুল-কৃষ্ণনগরের মতে অনেক শাস্ত্রীয় কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্তনারায়ণ

রাজা কৃষ্ণনারায়ণ অনুজ শ্রীমন্তের বুদ্ধি ও বাহুবলে রাজ্য-মধ্যে শত্রু-নাশ ও পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই সাহায্যে রাজ্যের আয়তন ও আয় বহুগুণে বর্ধিত হইয়াছিল। রাজা শ্রীমন্তনারায়ণ ছিলেন বিদ্বান্, বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ ও অসাধারণ বীরপুরুষ। তজ্জন্য কৃষ্ণনারায়ণ ভুরসুটরাজ্যের (কিঞ্চিন্ন্যূন) দক্ষিণার্ধ-ভাগ সুশাসনের জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। রাজা শ্রীমন্ত গড়ভবানীপুর হইতে কিছু দক্ষিণে দামোদরের এক শাখা-(অধুনা মাদারের খাল নামে বিখ্যাত) নদীতীরে পার-রাধানগর নামক স্থানে পুরী নির্মাণ করিয়া তাহা অগভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত করেন এবং রাজা কৃষ্ণনারায়ণের অনুবর্তী হইয়া নিজ রাজ্যাংশ পরিচালনে মনোযোগী হন। অধুনা পার-রাধানগর পাঁড়ুয়া নামে পরিচিত।

শ্রীমন্ত অপরিমিত বলশালী, রণনিপুণ ও অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ইনি পৃথক্ অঞ্চল লাভ করিলেও জ্যেষ্ঠ সহোদর রাজা কৃষ্ণনারায়ণের দক্ষিণবাহু-স্বরূপ ছিলেন ও ইঁহারই পরামর্শে কৃষ্ণনারায়ণ সমস্ত রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। শ্রীমন্ত বাঙ্গালার সুলতানের অল্পবিস্তর পৃষ্ঠপোষকতায় সুকৌশলে ও বীর্যবলে উড়িষ্যারাজকে পর্যুদস্ত করিয়া মেদিনীপুরের পূর্বসীমা হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকে এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য উড়িষ্যাপতির

আক্রমণ প্রতিহত করিতে একাধিকবার বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার সুসজ্জিত নৌবহর দামোদর ও রূপনারায়ণ নদে ভাসমান থাকিয়া শত্রুর গতিরোধ করিত। তিনি তমলুকে বর্গভীমা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। রাজা শ্রীমন্তের কূট-কর্মকৌশল, অসমসাহস ও পরাক্রমে বঙ্গদেশীয় ভূস্বামী ও সামন্তগণ সর্বদা সতর্ক থাকিতেন। তিনি যেমন শত্রুদিগের দুর্বোধ্য সংশয়-স্থল ছিলেন, সেইরূপ প্রজাবর্গের সুখ-সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার নিজের ভোগবিলাস কিছুই ছিল না, তিনি সাধারণ লোকের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন, এবং রাজকর্মচারীদিগের হস্তে রাজকার্য নির্ভর করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। তিনি প্রায় ছদ্মবেশে রাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাগণের ও রাজকর্মচারিগণের কার্যাদি পর্যালোচনা করিতেন।

শ্রীমন্তের বাল্যজীবন সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। —রাণী তারাদেবীর পরিণত বয়সে শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করেন। সর্বকনিষ্ঠ বলিয়া শ্রীমন্তকে রাণী অত্যন্ত ভালবাসিতেন....বহু পরিচারিকা সত্ত্বেও শিশুর লালন-পালন-কার্য স্বীয় হস্তে সম্পন্ন করিতেন এবং তাহাকে একদণ্ডও চক্ষুর অন্তরাল করিতে পারিতেন না। তারাদেবী একদিন স্বামীর ক্রোড়ে শিশুকে অর্পণ করিয়া সানুনয়ে বলিলেন: "নাথ, আপনার নিকট দাসীর একটি প্রার্থনা আছে; যদি অভয়-দান করেন, তাহা হইলে মনের অভিলাষ শ্রীচরণে নিবেদন করি।"

সদানন্দ রাণীর এই বিনয়-নম্র বচন-শ্রবণে স্নিগ্ধস্বরে

কহিলেন: "তোমার অভিলাষ স্বচ্ছন্দে প্রকাশ কর, যদি অন্যায় না হয়, তবে তোমার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।"

রাণী বলিলেন: "মহারাজ, আপনার ক্রোড়স্থ শিশু আপনার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি। আমার এই সন্তান এত প্রিয় যে, ক্ষণকালের জন্যও ইহার বিচ্ছেদ সহিতে পারি না। এই শিশু আপনার কনিষ্ঠ পুত্র, আমার ইচ্ছা ইহাকে রাজ্যের কিছু অংশ দান করেন।"

রাণীর এই কথা শুনিয়া রাজা সহাস্যে উত্তর দিলেন: "অতিরিক্ত মায়ায় তোমার মন দুর্বল, এই পুত্র-স্নেহ তোমার ন্যায়বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তুমি কি জানো না যে, জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজ্যের পূর্ণ অধিকারী? কনিষ্ঠকুমার তাহার ন্যায্য মর্যাদা বা অধিকার লাভে বঞ্চিত হইবে না, প্রতিনিধি-স্বরূপ কোন অঞ্চলের শাসন-কর্তৃত্ব পাওয়া সম্ভবপর; কিন্তু রাজ্য-ভাগ করা যে নিতান্ত অপরিণামদর্শীর কার্য, ইহা তুমি সবিশেষ জ্ঞাত আছ। ভগবান্ ইচ্ছা করিলে এই পুত্র রাজ্যাধিকারী হইতে পারে। তুমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি ভিন্ন আর কেহই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিবে না।"

রাণী স্বামী-বাক্য শিরোধার্য করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে কনিষ্ঠ পুত্রকে লইয়া শিবিকারোহণে রাজবলহাটে উপনীত হইলেন, এবং রাজবল্লভী দেবীর নাটমন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া শিশুকে মাটির উপর শয়ন করাইলেন ও প্রহরীদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, কুমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়াও যদি যায়, তথাপি তাহারা যেন তাহাকে স্পর্শ না করে।...অতঃপর রাণী

যুক্তকরে দেবীর সম্মুখে উপবেশনপূর্বক নিবেদন করিলেন ঃ "মা জগজ্জননি ! দাসী আজ শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিল, দেখিস্ মা, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। রাজবিধি অনুসারে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যাধিকারী—আমার সেই পুত্র রাজা হইয়া দীর্ঘ-জীবন-লাভে যেন সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হয়, আর ভূমি-নিপাতিত আমার এই সুকুমারও যেন রাজ-তিলকে অভিষিক্ত হয়। মা! তোর করস্থিত বিল্বপত্রের মালা যখন ভূপাতিত পুত্রের শিরোভাগে আসিয়া পড়িবে, তখন বুঝিব—ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আর তখনই তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া স্তন্যপান করাইব, নচেৎ আমি তোর প্রতিমা-সমক্ষে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধ্যানস্থ হইলাম এবং কুমারও মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিল।"

প্রার্থনান্তে রাণী ধ্যানস্থা হইলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তিনি তন্ময় হইয়া রহিলেন। এইরূপ প্রায় প্রহরাধিক কাল অতিবাহিত হইল। শিশুকুমার প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু রাণীর নিষেধে কেহই তাহাকে স্পর্শ করিতে সাহস করিল না। শিশুর বয়ঃক্রম তখন পাঁচ মাস মাত্র—শক্তিহীন অপোগণ্ড। কাজেই সে নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া নির্জীব হইয়া পড়িল, হস্ত-পদের গতি বন্ধ হইল, চক্ষু নিমীলিত হইয়া জীবনের সমস্ত লক্ষণ তিরোহিত হইল। এই নির্মম দৃশ্য দর্শনে উপস্থিত জনগণের হৃদয় বিচলিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, অথচ দৈবকার্য ভাবিয়া সংস্কার-নিয়মের গণ্ডি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। সকলেই জড়পুত্তলবৎ অলোক-সামান্য কোন ফলাফলের প্রত্যাশায় সে-স্থলে দাঁড়াইয়া বিপত্তি-

নাশন শ্রীমধুসূদনকে মনে মনে ডাকিতে লাগিল…হয় দেবতা প্রসন্ন হইয়া জননীর অভীষ্ট সিদ্ধ করুন, নতুবা সেই দৃঢ়সংকল্প ত্যাগ করিবার মতি জননীকে তিনি দান করুন।

এই ভাবে উদ্বেগ ও অশঙ্কায় কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, শেষ পর্যন্ত জননীর ইচ্ছাশক্তি দেবীর আশীর্বাদ-রূপে শিশু-শ্রীমন্তের ভবিষ্যৎ-জীবনের শুভ-ইঙ্গিত আনিয়া দিল। উত্তরকালে শ্রীমন্তের ললাটে দেবতার বর-স্বরূপ রাজটিকা শোভান্বিত হইয়াছিল।

সংঘাত ও পরিণতি

এস্থলে পূর্ববৃত্তান্তের ছায়াপাত করিলে সমসাময়িক অবস্থার সূত্র-সন্ধান মিলিতে পারে।—

খ্রীষ্ট পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ হইতে পূর্বতন ইলিয়াস্ শাহী সুলতান-শাসিত গৌড়-বঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলে একটা অনুপূর্ব শূন্যতা জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ, গিয়াস্-উদ্দীন আজম শাহের অধস্তন ওয়ারিসান অপচ্ছায়ার ন্যায় বঙ্গ-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইঁহাদের রাজ্যকাল ছিল অস্থায়ী এবং বিলাস-ব্যসন-প্রমোদ-আরামের পঙ্কিল স্রোতে ক্লেদাক্ত। প্রায় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদেই রাজা গণেশ-প্রমুখ কয়েকজন গণ্যমান্য নায়ক অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠেন। এই অপদার্থ রাজ্যাধিকারীগণ ছিলেন তাঁহাদের শক্তির খেলায় ক্রীড়নক-স্বরূপ। বস্তুতঃ, ইঁহাদের উত্থান-পতন এমন-কি জীবন-মরণ পর্যন্ত ঐ সকল নায়কের দ্বারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। রাজা গণেশ ছিলেন সর্বদর্শী, তীক্ষ্ণধী, সকলের শ্রেষ্ঠ এবং হিন্দু-মুসলমানের সমান প্রিয়পাত্র। তখন বঙ্গের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনিই হইয়া উঠিলেন সর্বেসর্বা। পটপরিবর্তন ঘটিল, হিন্দুরাজ্যের হইল প্রতিষ্ঠা। কিন্তু ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা যে, তাহা ক্ষণস্থায়ী হইল। গণেশের রাজ্য-শাসনের পর, তাঁহার স্বধর্মত্যাগী পুত্র যদুসেন—জলাল্-উদ্দীন মহম্মদ গৌড়বঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন, এবং তৎপুত্র দুর্নীতিপরায়ণ শমস্-উদ্দীন আহ্‌মদকে

তখ্‌তে বসিবার কয়েক বৎসর পরেই স্বেচ্ছাচারিতার মূল্য দিতে হয় জীবন-দান করিয়া। তৎপরে কিছুদিন বিশৃঙ্খলা ঘটে এবং হত্যার পর হত্যা চলিতে থাকে। অবশেষে ইলিয়াসের এক বংশধর নাসির্‌-উদ্দীন মহ্‌মুদ্‌ জনগণ-কর্তৃক রক্তরঞ্জিত শূন্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মহ্‌মুদ্‌ সুলতান হইয়া রাজ্য-মধ্যে শান্তি-স্থাপনে চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই।···

এক্ষণে অতীতের ভগ্নাবশেষ হইতে বর্তমানের নূতন ঘটনার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসা যাক্‌।—

পূর্বকথিত মুসলমান-আধিপত্য যখন অনিশ্চিত ও শোচনীয় হইয়া উঠে, সেই ব্যর্থতার দুর্বল-মুহূর্তে কয়েকজন ভূস্বামী নিজ নিজ অঞ্চল বিস্তারপূর্বক স্বতন্ত্র অধিকার সাব্যস্ত করেন। সম্ভবতঃ, সেই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের বহুতর বিস্তৃত ভূভাগ উড়িষ্যারাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। গঙ্গবংশীয় কপিলেন্দ্র-দেব তখন উড়িষ্যার অধিপতি। তিনি গৌড়ের মুসলমান শাসককে পরাস্ত করিয়া আপনাকে 'গৌড়েশ্বর' বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং ভাগীরথীর জলধারা ও নদীতীরবর্তী সাতগাঁ-ত্রিবেণীর স্বামিত্ব লইয়া সুলতানের সহিত তাঁহার অবিরত বিরোধ ঘটিতে থাকে। কিন্তু কোনদিকেই ইহার সুমীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

মেদিনীপুরের দক্ষিণ-ভাগ কপিলেন্দ্রদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল*।

* সে সময়ে মেদিনীপুর নামে কোন জেলা অভিহিত হইত না। মেদিনীপুরের দক্ষিণ-ভাগ বলিতে বোঝায়—বর্তমান মেদিনীপুর নগর হইতে উড়িষ্যার সীমা পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ।

কিন্তু ইহার পূর্বাংশ রাজা শ্রীমন্ত অধিকার করিয়া লইবার পর—উড়িষ্যাপতি তাহা পুনরধিকার করিতে সচেষ্ট হইয়াও বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। কারণ, মেদিনীপুরের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ ছিল সুগভীর অরণ্যে সমাকীর্ণ। সেই বিপদ্‌সঙ্কুল অরণ্যের অন্তর্ভেদ করিয়া একটিমাত্র সামরিক পায়ে-চলার সড়ক বৰ্দ্ধমান হইতে কটক পর্যন্ত উম্মুক্ত ছিল, আবার সেই পথের পশ্চিমপ্রান্ত বরাবর সারবন্দী জঙ্গলে ও হিংস্র অসভ্য জাতিতে পূর্ণ ছিল, উপরন্তু মানুষ বা অশ্বের জন্য এককণাও খাদ্যদ্রব্য মিলিত না। এ ক্ষেত্রে এক ভূস্বামীর স্পর্ধিত আচরণে শক্তিশালী কপিলেন্দ্রদেব রুষ্ট হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তথাপি তাঁহার ধারণা হইল—ইহার পশ্চাতে নিশ্চয় কোন বৃহৎশক্তি কার্য করিতেছে। ইতঃপূর্বে তিনি ভুরস্যুটের রাজা কৃষ্ণনারায়ণের বুদ্ধির ও শ্রীমন্তের শৌর্য-বীর্যের কথা চর-মুখে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। যখন সেই ক্ষুদ্র জনপদের ভূস্বামীরাজের পক্ষ হইতে অপ্রত্যাশিত আঘাত আসিয়া পড়িল, তখন তাঁহার শক্তি-দর্প হঠাৎ নাড়া খাইয়া উঠিল। তিনি মনস্থ করিলেন—ঐ ক্ষুদ্র জনপদ-রাজকে কঠিন প্রত্যাঘাতে তাঁহার পদানত করা অনায়াস-সাধ্য হইবে। কিন্তু কার্যকালে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইল। আর তিনি উদাসীন থাকিতে পারিলেন না, সংবাদ লইয়া জানিলেন—দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ভুরস্যুট-রাজ কৃষ্ণনারায়ণ সুপরিকল্পিত আপন শাসন-নীতির গুণে এবং স্বীয় সহোদর শ্রীমন্তের বীর্যবত্তা ও বুদ্ধিবলের সহায়তায় পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

উড়িষ্যারাজ ছিলেন ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁহার মনে আশঙ্কা উঁকি মারিতে লাগিল এই সন্দেহে যে, সুলতানের সমর্থন-পুষ্ট ভুরসুটের বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণরাজ-শক্তি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে যদি কোনক্রমে প্রাধান্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহার অধিকৃত ঐ স্থানের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল হস্তচ্যুত হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা। বাঙ্গালার মুসলমান-রাজের সহিত তাঁহার কোনকালেই সদ্‌ভাব ছিল না, কোন-না-কোন বিষয়ে মনান্তর-হেতু উভয়তঃ তুষাগ্নির ন্যায় বৈরভাব দীর্ঘ-স্থায়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য তিনি সমস্যায় পড়িলেন, একদিকে সুলতান—অন্যদিকে ভুরসুট-রাজন্য, দুই প্রতিকূল পক্ষকে একসঙ্গে নির্জিত করিবার সহজ সমাধান তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। কিন্তু প্রতাপশালী কপিলেন্দ্রদেব নিরুৎসাহ না হইয়া, বহু বিবেচনার পর বৈরনির্যাতনের একটি উপায় স্থির করিলেন।

সাতগাঁর দক্ষিণ-পশ্চিম দিগ্‌বর্তী আরামবাগ মহকুমায় মন্দারণের অবস্থান। ইহা মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার প্রবেশপথ-রূপে ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে মন্দারণ উড়িষ্যাপতি কপিলেন্দ্র-দেবের অধিকারভুক্ত ছিল, এবং তাঁহার নির্দেশে রাজা গজপতি মন্দারণ শাসন করিতেন। কিছুদিন হইতে ইহার দখল লইয়া বর্তমান সুলতানের সহিত বিরোধ চলিতেছিল। কিন্তু সেই মন্দারণকে কেন্দ্র করিয়া উড়িষ্যারাজ শত্রুপক্ষ-দমনের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তদনুসারে তাঁহার সমর-আয়োজন চলিতে লাগিল, এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু সংখ্যক কুশলী তেলেঙ্গা যোদ্ধা গিয়া মন্দারণ-বাহিনীর সহিত মিলিত হইল।

দুই শতাব্দী পূর্বে সংঘটিত লক্ষ্মণাবতী-জাজনগর সংগ্রামে মন্দারণের যে গুরুত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, এ-যাবৎ তাহার কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই ; বরঞ্চ এই মন্দারণ সীমান্তপ্রদেশের সুরক্ষিত দুর্গপুরী-রূপে প্রখ্যাত ছিল। সুতরাং ইহার উপর সকলের লোলুপ দৃষ্টি থাকায়, বারংবার হস্তান্তর ঘটিত।

যে-সময়ের কথা হইতেছে, তখন গৌড়-বঙ্গের সুলতান রুকন্-উদ্দীন বারবক্ শাহ্ (১৪৫৯—১৪৭৪ খ্রীঃ অঃ)। তিনি ছিলেন সূক্ষ্মদ্রষ্টা কৃতকর্মা দণ্ডধর। তিনি যখন রাজ্যাধিকার-লাভের পূর্বে রাজপ্রতিভূস্বরূপ সপ্তগ্রামের শাসক ছিলেন, তখনই গড়-ভবানীপুরের রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ও তাঁহার শ্রেষ্ঠ সহায় বীর শ্রীমন্তের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছিলেন, এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও ইঁহাদের শাসনতন্ত্র ও কার্যনীতির সন্ধান রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। ইঁহারা যে মেদিনীপুরের আসমুদ্র-পূর্বসীমাঞ্চল নিজ শক্তি-প্রয়োগে উড়িষ্যারাজের অধিকার-মুক্ত করিয়া রাজ্য প্রসারণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে সুলতান রুকন্-উদ্দীন প্রীতি-লাভ করিয়াছিলেন। একদা এক শক্তিমানের সাধনায় লোকালয়ে পরিণত শ্বাপদ-সঙ্কুল নিবিড় বনভূমির সহিত বর্বর-শাসনচ্ছিন্ন অঞ্চল যুক্ত হইয়া যে বৃদ্ধিশীল জনপদ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারই কৃতধী উত্তরপুরুষগণের সমন্বয়বাদ, সুবিবেচনা ও পৌরুষ কয়েক দশকের মধ্যে সেই জনপদকে অনেকাংশে বিস্তৃত ও গৌরবোন্নত করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মণরাজের এই বৃদ্ধি ও আধিপত্য বিচক্ষণ বারবক্ শাহের নিকট বিসদৃশ বোধ হইল না, বরং তাহা ন্যায়সংগত এবং তাঁহার রাজ্যের পক্ষে অনুকূল বলিয়াই

তিনি মনে করিলেন। কারণ, পরাক্রান্ত উড়িষ্যাপতিকে দমন করিতে হইলে ভুরসুটরাজের সাহচর্য সৈন্য-সংস্থানে অনেক সুবিধা আনিয়া দিবে, এবং ঐ সমস্ত অঞ্চলের অপরিচয়-হেতু স্থলাভিষিক্ত ফৌজদারসকল বিভ্রান্তির হাত হইতে নিস্তার পাইবে। এই মর্মে তিনি দূতমুখে কৃষ্ণনারায়ণের কাছে প্রস্তাব পাঠাইয়া চুক্তি-বদ্ধ হইতে চাহিলেন। কৃষ্ণনারায়ণ অনুজ শ্রীমন্তের সহিত পরামর্শ করিয়া সুলতানের সময়োপযোগী প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

বারবক্ শাহ্ প্রত্যন্তদুর্গস্থলী-হিসাবে মন্দারণের বিশেষ গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে মন্দারণ ছিল উড়িষ্যাপতির শক্তিকেন্দ্র। এই মন্দারণকে সম্পূর্ণ স্বাধিকারে আনিবার জন্য রুকন্-উদ্দীন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি রাজা গজপতিকে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে একাধিকবার নির্দেশ পাঠাইলেন। কিন্তু মন্দারণরাজ কালক্ষেপের ছলে প্রতি-বারই কথা ঘুরাইতে লাগিলেন। রাজা গজপতি বিপদ্ আসন্ন বুঝিয়া গোপনে সৈন্যসংখ্যা বর্ধনে মনোযোগী হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যারাজের নিকট দ্রুতগামী বার্তাবহ প্রেরণ করিলেন। কয়েকদল তেলেঙ্গা-সেনা ব্যতীত উড়িষ্যা হইতে আশানুরূপ সামরিক সাহায্য আসিয়া পৌঁছাইতে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। এদিকে সুলতান বিরক্ত হইয়া তাঁহার চূড়ান্ত অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন। আর সাহায্যের অপেক্ষায় কাল-গণনা করিতে থাকিলে বিপদ্ নিবারণ করা দুরূহ হইয়া উঠিবে—এই আশঙ্কায় রাজা গজপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে,

উপস্থিত যে-সৈন্যবল তাঁহার আছে, তাহাদের অধিকাংশই যুদ্ধ-কুশলী, সুলতানের সেনাগণকে প্রতিরোধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট, এমন-কি যুদ্ধজয়ও অসম্ভব নয়, ইতোমধ্যে উড়িষ্যা হইতে সৈন্য ও সমর-সম্ভার আসিয়া পড়িতে পারে।

বারবক্ শাহ্ রাজা গজপতির বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। অল্প কয়েকদিন পূর্বে ইস্‌মাইল্ গাজী নামক এক কোরেশজাতীয় আরব গৌড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুলতান ইস্‌মাইল্‌কে সেনাপতি করিয়া গজপতির বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন এবং ভুরসুটরাজের সহায়তা গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিলেন। ইস্‌মাইল্ গাজী বারবকের আদেশানুযায়ী গড়ভবানীপুরে গমনপূর্বক রাজা কৃষ্ণনারায়ণকে মন্দারণরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে উৎসাহিত করেন এবং ইহাও বলেন যে, তাঁহার সাহায্য পাইলে মন্দারণ-অধিকারে কালবিলম্ব হইবে না। কৃষ্ণনারায়ণ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কারণ—উড়িষ্যারাজের ক্ষমতা খর্ব হইলে—তাঁহারও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে।

অতঃপর ইস্‌মাইল্ গাজী সত্বর প্রস্থান করিয়া তাঁহার সৈন্য-বাহিনীর সহিত মিলিত হইলেন। সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল, যথাসময়ে তাহারা মন্দারণ আক্রমণ করিল। মন্দারণের বীর যোদ্ধারা প্রাণপণে সুলতানের ফৌজ প্রতিহত করিতে লাগিল, সুলতান-সেনা সেই প্রচণ্ড বেগ সহিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। কূটচক্রী যোদ্ধৃবর ইস্‌মাইল্ গাজী ভগ্নোত্তম সৈন্যগণের মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া

আনিবার জন্য অশেষ উৎসাহ-বাক্যে তাহাদিগকে পুনর্বার উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। এই অবসরে রাজা গজপতি একটি দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া শত্রু-সেনাদলকে বিতাড়িত করিতে বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। এদিকে সেনাপতি ইস্মাইল্ নিপুণ সৈন্য-বিন্যাস করণানন্তর পুরোবর্ত্তী হইয়া অসমসাহসে মন্দারণ-সেনার উপর চাপিয়া পড়িলেন। সুলতানের সৈন্যবাহিনী ভীমবিক্রমে বিপক্ষ সেনাদলের সম্মুখভাগ আক্রমণ করিল। দেখিতে দেখিতে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইতে লাগিল। কোন্ পক্ষ জয়ী হইবে—তাহা বোঝা গেল না। কিন্তু কঠিন নিয়তির বিধানে অল্প সময়ের মধ্যে মন্দারণের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। মহাবীর শ্রীমন্ত উপস্থিত হইয়া গজপতির সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করিলেন। গজপতির সৈন্যগণ এইরূপ অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, এবং অল্পক্ষণ শত্রুসৈন্যের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া পশ্চাৎপদ হইতে থাকে। কিন্তু সুলতান-সেনা ও ভুরসুট-সেনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কায় মন্দারণ-সেনা দিগ্‌বিদিকজ্ঞান-শূন্য হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। তথাপি গজপতি রণে ভঙ্গ দিলেন না, তিনি দুর্গরক্ষক কতকগুলি রণকুশল যোদ্ধার সহিত রাজা শ্রীমন্ত ও সেনাপতি ইস্মাইল্‌কে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষে আবার তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইল। গজপতি যুদ্ধকালে আহত অবস্থায় পরাজিত ও বন্দী হইলেন। মন্দারণের পতন হইল।

রাজা গজপতি এইরূপে বন্দী হইলে, ইস্মাইল্ গাজী দুর্গ অধিকার করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মন্দারণ লুণ্ঠন করিবার

জন্য ধাবিত হন। অযথা উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিবার সংশয়ে রাজা শ্রীমন্তও সসৈন্যে ইস্‌মাইলের অনুগমন করেন। দুর্গনগরীতে প্রবেশ করিয়া বিজয়োল্লাস-মত্ত ইস্‌মাইল্‌ গাজীর সৈন্যগণ ধনী হিন্দুপ্রজাগণের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে কুণ্ঠিত হইল না, এমন-কি পুরবাসিনী স্ত্রীগণও ইহাদের পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইল না। মন্দারণ-বাসী জনগণের আর্তনাদে রাজা শ্রীমন্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া ইস্‌মাইলের সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সৈন্য-গণকে লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত করিতে অনুনয় করিলেন। কিন্তু শক্তি-দৃপ্ত মুসলমান সেনাপতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীমন্ত স্বীয় সৈন্য-বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "এই শ্যামল মাটিতে তোমাদের জন্ম, এই পবিত্র মাটি কি অকারণ কলুষিত হইবে? তোমরা বঙ্গজননীর বীর সন্তান, তোমরা জীবিত থাকিতে আজ তোমাদের সম্মুখে নিরীহ প্রজাগণেয় ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইতেছে, হিন্দু রমণীগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইতেছে, তাহাদের আর্ত চীৎকারে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছে। তোমাদের বাহুবলের সহায়তায় আজ অত্যাচারী যবন সমর-বিজয়ী ইস্‌মাইল্‌ বিজয়-মদে প্রমত্ত হইয়া আমার ন্যায্য প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়াছে। আমার ধারণা—এই অন্যায়-কার্য সুলতান বারবক্‌ শাহের নীতিবিরুদ্ধ। যদি তোমাদের আত্মগৌরব রক্ষা করিবার বিন্দুমাত্র বাসনা থাকে, তবে এই মুহূর্তেই অত্যাচারী বিধর্মীদিগের উদ্যতহস্ত পঙ্গু করিয়া দাও, নিরুপায় নিরপরাধ পুরবাসীর ধন-প্রাণ ও পুরাঙ্গনাগণের সম্মান

রক্ষিত হোক্। অন্যথায় আমাদের সকলকে অপৌরুষের কলঙ্ক স্পর্শ করিবে।"

মহাতেজা শ্রীমন্তের এই উদ্দীপক বাণী শ্রবণমাত্র সহস্র হিন্দুবীর নিষ্কাশিত অসি-হস্তে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় মরণ-পণে মুসলমানসৈন্যের উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহাদের হঠাৎ প্রহারে বহুসংখ্যক সৈন্যের ছিন্নমুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইল। মুসলমান সৈন্যগণ সেই আকস্মিক বিপৎপাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া অপহরণ ও নির্যাতন করিতে নিবৃত্ত হইল। মহাপ্রভাব উদারমতি রাজা শ্রীমন্ত বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া নগরীর চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং নগরবাসী জনগণের ক্ষুব্ধ চিত্ত হইতে সমস্ত কুণ্ঠা-ভয় বিদূরিত করিলেন। তখন আরব ইস্‌মাইল্ গাজী মনে মনে প্রমাদ গণিয়া এবং তাঁহার কৃতকর্মের জন্য সুলতানের বিরাগভাজন হইবার সংশয়ে ন্যায়নিষ্ঠ শ্রীমন্তের নিকট নিজ দোষ স্বীকার পূর্বক সন্ধি-প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু শ্রীমন্ত মুসলমান সেনাপতির উপর বীরের অযোগ্য নিন্দিত আচরণে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, সহসা তাঁহার আত্ম-নিবেদনে বিশ্বাস-স্থাপন করিলেন না। তিনিও দৃঢ়কণ্ঠে জ্ঞাপন করিলেন: "আপনি যদি আপনার সৈন্যগণকে এই মুহূর্তেই মন্দারণ-পুরী ত্যাগ করিতে অনুমতি দেন, তবেই আমি যবন-বধে নিবৃত্ত হইব, নচেৎ একটি অত্যাচারী সৈন্যও আজ অনাহত দেহে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অন্য কোন লোভ বা আকাঙ্ক্ষা রাখি না, আপনি নির্বিবাদে পূর্ণ বিজয়-গৌরব, এমন-কি এই মন্দারণ-রাজ্যাংশ ভোগ করুন, কিন্তু আমার সম্মুখে

নিরীহ প্রজাবৃন্দ এবং অবলা রমণীগণের উপর অত্যাচার না হয়।”

ইস্‌মাইল্ অগত্যা শ্রীমন্তের কথায় সম্মত হইয়া সৈন্যগণকে দুর্গপুরী হইতে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, মন্দারণে পুনর্বার শান্তি ফিরিয়া আসিল। ইস্‌মাইল্ গাজী বাহ্য কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ রাজা শ্রীমন্তকে ধন-রত্নাদি ও গৃহীত হয়-হস্তী উপহার দিলেন। কিন্তু শ্রীমন্তের দাম্ভিক ব্যবহারে তিনি মনে মনে বিরক্ত হইলেন। ইস্‌মাইল্ বারবক্‌কে প্ররোচিত করিয়া রাজা কৃষ্ণনারায়ণ-শাসিত ভুরস্থট-রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

অল্লায়াসে গড়মন্দারণ পুনরায়ত্তে আসিল দেখিয়া বারবক্ শাহ্ ইস্‌মাইল্ গাজীর উপর অতিরিক্ত আস্থাবান্ হইয়া উঠিলেন। সুতরাং ইস্‌মাইল্ ভুরস্থট-সেনাধ্যক্ষ শ্রীমন্তের বিরুদ্ধে যে অতি-রঞ্জিত বিবরণ প্রদান করিলেন, তাহার সত্যাসত্য নির্ধারণ না করিয়াই বারবক্ অতিমাত্রায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার এরূপ ধারণাও হইল যে—হিন্দুরাজা সাহায্য-দানের ছলে পারতপক্ষে সুযোগ ধরিয়া নিজ রাজ্যের সমীপবর্তী দুর্গপুরী অধিকারের দুরভিসন্ধি মনে মনে লালিত করিতেছিলেন। কিন্তু পূর্বাপর ঘটনার প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহার অজ্ঞাত রহিয়া গেল। এদিকে ইস্‌মাইল্ গাজী প্রতিশোধ লইবার আশায় মন্দারণে সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে উদ্যোগী হইলেন। তদনন্তর বারবক্ অন্যায়ভাবে তাঁহার সৈন্য-নিধন ও আহুতির অভিযোগ তুলিয়া কৃষ্ণনারায়ণের নিকট প্রভূত ক্ষতি-পূরণ দাবি করিয়া পাঠাইলেন, এবং বিশ্বাস-

ভঙ্গের নিমিত্ত তাঁহার সহিত মৈত্রী-বন্ধন রক্ষা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিলেন।

কৃষ্ণনারায়ণ এই দুঃসংবাদে বিচলিত হইলেন। ইস্‌মাইল্ গাজী যে—নিজের অন্যায় আচরণ সম্পূর্ণ গোপন করিয়া মিথ্যা-ভাষণে বারবক্‌কে প্রভাবিত করিয়াছেন, সে-বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহই রহিল না। অতঃপর তিনি সুলতানের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত করাইবার জন্য নানা উপঢৌকন-সহ লক্ষ্মণাবতীতে তাঁহার প্রীতিভাজন ধীমান্, প্রিয়ভাষী ও নির্ভীক সন্ততি মুকুটরামকে প্রেরণ করিলেন, এবং সাক্ষ্যস্বরূপ মুকুটরামের সঙ্গী হইল মন্দারণ ও তৎসন্নিহিত স্থানের প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা ভুক্তভোগী কয়েকজন নগরমণ্ডল।

বারবক্ ছিলেন বিশদদর্শী নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা। মুকুটরাম সুনিপুণ দৌত্যে ও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ-প্রয়োগে বারবকের মনে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেন। সুলতান আপনার ভুলের জন্য লজ্জিত হইয়া তাঁহার অহেতুক অভিযোগসকল প্রত্যাহার করিলেন এবং রাজা কৃষ্ণনারায়ণকে বহু উপহার-প্রতিদানে ন্যায়পরতার পরিচয় দিলেন।···কিন্তু ভুরসুটরাজ পূর্ব অবমাননা ভুলিলেন না, কুচক্রী ইস্‌মাইলের উপর তাঁহার ভীষণ আক্রোশ গিয়া পড়িল। উপরন্তু তিনি গুপ্তচর মুখে সংবাদ পাইলেন যে, আরব সেনাপতি তাঁহার রাজ্যের সর্বনাশ-সাধনে তৎপর হইয়াছেন, এবং কার্য-সিদ্ধি হইলে সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগের শাসন-ভার লাভ করিবার গোপন আকাঙ্ক্ষা রাখেন।

রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ইস্‌মাইলের কুটিল উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কয়েকজন ছদ্মবেশী রণকুশল যোদ্ধা দুই দলে বিভক্ত করিয়া একদল মন্দারণে ও আর-একদল লক্ষ্মণাবতী নগরে পাঠাইয়া দেন। ইস্‌মাইল্‌কে হতমান বা নিহত করিবার অভিপ্রায়েই রাজা ঐরূপ কার্য করিয়াছিলেন। রাজ-প্রেরিত যোদ্ধাগণ প্রত্যয়-উৎপাদনে মুসলমানরূপে গণ্য হইয়া তাঁহার সৈন্যবিভাগে নিযুক্ত হয়, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধিবলে উচ্চকর্মচারীর পদ-প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান-রাজের অতীব প্রিয়পাত্র হইয়া উঠে।

ঘটনাচক্রের হইল আবর্তন, ইস্‌মাইল্ গাজীকে তাঁহার অভীষ্ট-পূরণের সমস্ত আয়োজন পশ্চাতে ফেলিয়া বারবক্ শাহের আদেশে কামরূপরাজ কামেশ্বরের বিরুদ্ধে অচিরে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হইল। ইঁহার রাজ্য করতোয়া-তীর পর্যন্ত বহুবিস্তৃত কামতাপুর নামে বিখ্যাত ছিল। ইস্‌মাইল্ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত সন্তোষের নিকট প্রথম সংঘর্ষে কামেশ্বর কর্তৃক পরাজিত হন, কিন্তু পুনর্বার যুদ্ধে ইস্‌মাইল্ বিজয়ী হইলে কামরূপরাজ নদীতীরবর্তী স্থান ত্যাগ করেন। তৎপরে ইস্‌মাইল্ (রঙ্গপুর জেলায় পীরগঞ্জ থানা এলাকা) কাঁটাদুয়ার পল্লীতে বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু করতোয়া-তীরস্থ ঘোড়াঘাটের দুর্গাধিপ ভান্দসী রায় ও তৎসহযোগী কৃষ্ণনারায়ণ-প্রেরিত পূর্বোক্ত যোদ্ধপুরুষের চক্রান্তে পড়িয়া ইস্‌মাইল্ রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন, এবং বারবক্ শাহের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল। কাঁটাদুয়ারে ইস্‌মাইলের মস্তক এবং মন্দারণে তাঁহার কবন্ধ প্রোথিত হয়।

বারবক্ শাহের রাজ্যকালে হিন্দুরাজগণ-শাসিত দক্ষিণ-বঙ্গের অটবী-প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইয়াছিল এবং বহুদূর পর্যন্ত তাঁহার আধিপত্য বিস্তার-লাভ করিয়াছিল, কিন্তু ভুরসুটরাজ-অধিকৃত কোন অংশে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নাই। বারবক্ শাহ্ রাজ-শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে প্রায় অষ্টসহস্র হাব্‌শী ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া ইহাদিগকে রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে উন্নীত করেন। বারবকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র শমস্-উদ্দীন য়ুসুফ্ শাহ্ গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

এই সময়ের মধ্যে প্রায় এক দশক রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ও শ্রীমন্ত ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যকে বহুগুণে সুরক্ষিত ও সমুন্নত করিয়া তুলিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা দুই সহোদরে মিলিয়া রাজ্য-ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে কৃতকার্য হইলেন। রাজ্য সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যে নন্দিত হইয়া উঠিল।

অল্পকাল পরে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ইহলীলা সংবরণ করিলে, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দেবনারায়ণ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

অধিককাল গত হইল না, য়ুসুফ্ শাহ্ রাজ্য-বিস্তারের পরিকল্পনায় দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র ভূভাগ অধিকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উপযুক্ত সময়ে রাঢ়ে সৈন্য-চালনা করিয়া, উড়িষ্যারাজের সামন্ত-শাসিত পাণ্ডুয়া-রাজ্যে হানা দিলেন। সংগ্রামে তিনি জয়ী হইলেন, এবং হিন্দুরাজের হস্তচ্যুত পাণ্ডুয়ায় তিনি সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। সেই বিজিত স্থানে য়ুসুফের আদেশে ব্রহ্মশিলা-নির্মিত সূর্যদেবের দেউল এবং পবিত্র নারায়ণ-মন্দির, মসজিদ ও মিনারে পর্যবসিত হইল। হিন্দু-

মন্দিরের বহু শিলা-স্তম্ভ ও অন্যান্য উপাদানে তিনি 'বাইশদরওয়াজা' নামে মসজিদটি পাণ্ডুয়া-বিজয়ের চিহ্ন-স্বরূপ নির্মাণ করিলেন। য়ুসুফের এই হিন্দুধর্মের অবমাননাকর অন্যায় কার্যে রাজা শ্রীমন্ত ও ভুরসুটপতি দেবনারায়ণ অত্যন্ত মর্মপীড়িত হইলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন য়ুসুফ্ মহাউৎসাহে গড়ভবানীপুর আক্রমণ করিবার জন্য সদলবলে অগ্রসর হইতে উদ্যত, তখন রাজা শ্রীমন্ত বিংশ-সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান পার হইয়া পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী একস্থানে য়ুসুফের সৈন্যগণকে বাধা দেন। হুসেন (জলাল্-উদ্দীন ফতে) নামক এক হুসেনী শাহ্জাদা সেই সময়ে য়ুসুফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজা শ্রীমন্তের সহিত মিলিত হন। এই যুদ্ধে য়ুসুফ ব্যতিব্যস্ত হইয়া সৈন্য অপসারণ করেন। য়ুসুফের পরে অকর্মণ্য দ্বিতীয় সিকন্দর শাহ্ পদচ্যুত হইলে, জলাল্-উদ্দীন ফতে শাহ্ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন এবং পাণ্ডুয়ার সীমান্ত-যুদ্ধেই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিল বলিয়া, পাণ্ডুয়ায় দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। উদারপন্থী তীক্ষ্ণধী ফতে শাহ্ কোরাণ স্পর্শ করিয়া রাজা শ্রীমন্তের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উভয়েই পরস্পরের বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার (পেঁড়ুয়া) প্রান্ত-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহার স্মৃতিরক্ষা-হেতু রাজা শ্রীমন্তও স্বীয় রাজধানীকে পেঁড়ুয়া নামে অভিহিত করেন।

সিংহাসন-আরোহণের প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পরে ফতে শাহ্ লক্ষ্য করিলেন—রাজ্যের শিরোপরি হাবশী ক্রীতদাসগণ প্রধান

প্রধান রাজপদ ও আভিজাত্য-গৌরব লাভ করিয়া কুগ্রহের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। শাসনকার্যে সেই দুর্বৃত্তগণের দুর্বিনেয় বাধা দুঃসহ হইয়া উঠিতে—ফতে শাহ্ ইহাদের ক্ষমতা অপহরণ করিলেন। কিন্তু ইহারা প্রতিহিংসা লইবার জন্য চক্রান্তে লিপ্ত হইল। সুলতানের বিশ্বস্ত হাবশী সেনাপতি মালিক আন্দিলের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া (সুলতান শাহ্‌জাদা) বারবগ্ নামক এক হাবশী ফতে শাহ্‌কে হত্যা করিল।

মৈত্র্য-সম্বন্ধ সুলতান ফতে শাহের অপমৃত্যুতে রাজা শ্রীমন্ত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং শান্তিপ্রিয় গড়ভবানীপুর-রাজ দেব-নারায়ণ গৌড়-বঙ্গের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনায়মান দেখিয়া রাজ্য-লোলুপ অপকৃষ্ট হাবশী-নায়কের শাসন-দৌরাত্ম্য আশঙ্কা করিয়া বিষণ্ণ হইলেন। কিন্তু রাজনীতি-কুশল শ্রীমন্ত যথাসম্ভব নবভাবে রাজ্য-সীমান্ত-রক্ষণের ব্যবস্থা দ্বারা দেবনারায়ণের শঙ্কা দূর করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যাপহারী বারবগ্‌কে হত্যা করিয়া মালিক আন্দিল্ প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ লইলেন, এবং রাজমহিষী ও উচ্চপদস্থ ওমরাহ্‌গণের নির্বন্ধে তিনি সৈফ্-উদ্দীন ফিরোজ শাহ্ আখ্যায় গৌড়ের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার তিন বৎসর ব্যাপী সুনিপুণ শাসন-কালে দেশবাসিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আপন রাজ্যে কোন উপদ্রবের সংশয় নাই ভাবিয়া দেবনারায়ণ নিশ্চিন্তচিত্তে সমাজ-ধর্মের উন্নতিকল্পে মনঃসংযোগ করিলেন।

ইতোমধ্যে রাজা শ্রীমন্তের মৃত্যুতে সারা রাজ্যে অতিশয় হতাশা ও শোকের ছায়া পতিত হইল। তাঁহার অভাবে সকলে

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ অগ্রসর হইয়া সর্বজনকে অভয়-দান করিলেন। মহেন্দ্রের সাহস ও বীর্যের দীক্ষাগুরু এবং রণগুরু ছিলেন তাঁহার যশস্বী শূরশ্রেষ্ঠ পিতা রাজা শ্রীমন্তনারায়ণ।

দেবনারায়ণ

দেবনারায়ণ রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া পুত্রনির্বিশেষে প্রজা-পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন খুল্লতাত রাজা শ্রীমন্ত, তিনিই তাঁহার সকল শক্তির উৎস ছিলেন। রাজা দেবনারায়ণের রাজত্বকালে বঙ্গের তৎকালীন রাজন্যবর্গ তাঁহাকে দেবতুল্য সম্মান করিতেন। তিনি শান্তিপ্রিয়, ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন। দীনদরিদ্র প্রজাগণের অভিযোগ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিছুক্ষণ প্রাসাদের সম্মুখস্থ এক প্রশস্ত মণ্ডপে উপবেশন করিতেন। প্রজাগণ নির্ভয়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত অভিযোগ-অনুযোগ, আবেদন-নিবেদন তাঁহাকে জ্ঞাপন করিত, এবং রাজাও তাহাদের সমস্ত কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিয়া ন্যায্য ক্ষেত্রে প্রার্থীগণের অভাব দূরীকরণে ও মঙ্গল-বিধানে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। প্রজাগণ তাঁহাকে সর্বদুঃখ-বিনাশন মঙ্গলকারণ ভাগ্যবিধাতা-বোধে পূজা করিত এবং সর্বান্তঃকরণে ভালবাসিত। তাঁহার রাজত্বকালে দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। কারণ, অত্যাচারী কোনক্রমে ক্ষমা পাইত না। প্রজাগণের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি-বিধানে যত্নপর হইয়া, রাজা পল্লীতে পল্লীতে উন্নতচেতা, ন্যায়নিষ্ঠ বৈদ্য ও ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজ-ব্যয়ে বৈদ্যগণ দুঃস্থ প্রজাবর্গের রোগ-শান্তি

করিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালাদি ইতর জাতিগণকেও নানা সৎশিক্ষা দানে স্বধর্মপরায়ণ করিতে প্রয়াসী হইতেন। এই সকল সুবিধানে দেবনারায়ণের রাজ্য ধর্মরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার কঠোর শাসন না থাকিলেও প্রজাগণ, সুসংযত নিয়মরক্ষার জন্য, উচ্ছৃঙ্খল বা কুপথগামী হইতে সাহস করিত না।

রাজা দেবনারায়ণ শক্তি-উপাসক ছিলেন। তিনি স্বীয় ভবনে অষ্টধাতু-নির্মিতা জয়দুর্গা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবৎসর শারদীয়া মহোৎসবের সময় লক্ষ লক্ষ নর-নারী, অন্ধ-আতুর, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই মহানন্দে বিভোর হইয়া দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইত। রাজা সমাগত ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সৎকার করিয়া বিদায়কালে পট্টবস্ত্র ও পাথেয় দান করিতেন।

এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় মণিনাথ গোস্বামী নামক এক সন্ন্যাসী রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; রাজা উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়া সন্ন্যাসীকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন: "আমি শ্রীশ্রী৺গোপালজীউর ভোগ ভিন্ন অন্য খাদ্য গ্রহণ করি না; অতএব আমাকে নারায়ণের প্রসাদ অন্ন দান কর।"

রাজা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া সন্ন্যাসী-চরণে গললগ্নীকৃতবাসে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন: "ভগবন্! আমি অকৃতী, আমায় ক্ষমা করুন। গোপালজীউর ভোগ-প্রসাদ আপনাকে দিতে পারিলাম না। আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতেছি,

আপনি অনুগ্রহপূর্বক সেই সকল উপকরণ-নৈবেদ্য গোপালকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করুন, এবং অধীনকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়া কৃতার্থ করুন।"

সন্ন্যাসী রাজার বিনীত বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে উপযুক্ত সময়ে রাজা একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়া গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখনও গোপালের মন্দির গড়ভবানীপুরে ভগ্নাবস্থায় তাহার পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। রাজা গোপাল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ভোগ-সেবা নির্বাহের জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করেন। গোপাল জীউর পুরোহিত এক্ষণে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া গোপাল-জীউকে সে-স্থান হইতে লইয়া মাতো গ্রামে প্রস্থান করিয়াছে। কেবল মন্দিরটি জীর্ণাবস্থায় এখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন মনুষ্যগণকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, কাল সকলই ধ্বংস করে, কাল মহাপরাক্রান্ত বীরের পরাক্রম নষ্ট করে, উন্নত-মস্তক দৃক্‌পাতশূন্য গর্বোদ্ধত ব্যক্তির অহঙ্কারও চূর্ণ করে। পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, সুন্দরী ললনার মনোহারিণী কান্তি, রাজাধিরাজ মহারাজের আসমুদ্র রাজ্য—কালে সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ, আমার এখন কি অবস্থা! এক সময়ে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের স্তব-মন্ত্রপাঠে আমার প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকিত, ধূপ-ধুনা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের সুগন্ধে ভবন আমোদিত থাকিত, শত শত দীনদরিদ্র উদর পূর্ণ করিয়া দেব-প্রসাদ ভক্ষণ করিত, আমার নাটমন্দির সর্বদা সাধু-সজ্জন, ধনী-নির্ধন, অন্ধ-আতুর প্রভৃতি সর্বজাতীয় নরনারীতে পরিপূর্ণ

থাকিত; কিন্তু এক্ষণে সেদিন আর নাই, আর ব্রাহ্মণগণ এখানে সুললিত স্বরে ভগবানের স্তুতি-গান করে না, আর প্রাঙ্গণতল কাঁসর-ঘণ্টার রবে ধ্বনিত হয় না, আর কোন লোক প্রসাদ-ভক্ষণ করিবার আশায় এখানে আগমন করে না। এখন এস্থান শৃগাল কুক্কুর ও সর্পের আবাসভূমি হইয়াছে। মানব! কিছুই চিরস্থায়ী নহে—সকলেরই পরিণাম আমার ন্যায়।

রাজা দেবনারায়ণ মহাপুরুষ মণিনাথ গোস্বামীকে স্বীয় পুরীতে বাস করিবার জন্য অত্যন্ত অনুনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু বাসনা-রহিত শুদ্ধসত্ত্ব উদাসীন যোগীশ্রেষ্ঠ গোস্বামীঠাকুর বলিলেন: "বৎস! আমি সন্ন্যাসী, ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিবার জন্যই আমি যোগাসন পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে আসিয়া সময়ে সময়ে উপস্থিত হই। তুমি পরমধার্মিক আচারবান্ ভগবদ্ভক্ত নরপতি, সেইজন্য তোমার ভবনে আমি এতদিন বাস করিতেছি, অন্য কোথাও আমি একদিনের অধিক কাল থাকি না। হিন্দুসমাজ দিন দিন যেরূপ অধঃপতিত হইতেছে, দেবদ্বিজের প্রতি লোকের ক্রমশঃ যেরূপ অনাস্থা হইয়া উঠিতেছে, হিন্দুর আচার-বিচার যেরূপ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে হিন্দুদিগের অশেষ দুর্গতি হইবে, হিন্দুধর্ম নামমাত্রে পর্যবসিত হইবে। এই কারণে, লোকালয়ে বাস করিতে আর বাসনা নাই। ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করিতে ও সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া প্রকৃত সার পদার্থ কি—তাহা ধারণা করিতে এখন আর কাহারও ইচ্ছা নাই; সকলেই বালকের ন্যায় ভোগবিলাসে লালায়িত। তবে ধর্মের যখন অত্যন্ত গ্লানি

হইবে, তখন সনাতনধর্ম রক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন।"

সন্ন্যাসী আরও বলিলেন: "বৎস! তুমি দুঃখিত হইয়ো না। তোমার যখনই আমাকে আবশ্যক হইবে, তখনি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইব, এবং তোমার এই পবিত্র পুরীতে অন্তিমে এই নশ্বর দেহ রক্ষা করিব।"

অনন্তর গোস্বামী ভবানীপুর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে—একদা কুমার বসন্ত হঠাৎ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন্, এবং বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁহাকে উজ্জীবিত করা কঠিন হইয়া উঠে। অনেকক্ষণ তাঁহার অসাড় অবস্থা দেখিয়া, রাজবৈদ্য নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, কুমারের অচেতন দেহে জীবনীশক্তি নাই। এই আকস্মিক বিপদে কুমার-জননী রাণী শোকে অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিতা হইতে লাগিলেন। আনন্দপূর্ণ রাজপুরী শোকে নিরানন্দ হইয়া উঠিল। রাজা আত্মহারা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে একান্ত মনে যোগীবর মহাপুরুষ গোস্বামীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়াবেগ সহিতে না পারিয়া তিনি অসহায়ের ন্যায় আর্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন: "ভগবন্, আপনি বলিয়াছিলেন—অনিবার্য কারণ ঘটিলে আপনি দর্শন দিবেন। ওগো অন্তর্যামী, আজ যে আমার ঘরে মহাবিপদ্, আমার প্রাণপ্রতিম নয়ন-রঞ্জন কুমার আজ এ-মরলোক ত্যাগ করিয়া অমরলোকে প্রয়াণ করিয়াছে! এখনও কি আমার এই মর্মজ্বালা আপনার অন্তরে গিয়া বাজে নাই? তবে কি আমার মহাপ্রস্থানকালে আপনি দৃষ্টিপ্রসাদ-দানে দাসের তাপিত

প্রাণ শীতল করিবেন? প্রভু, আপনাকে যে এখন বড় প্রয়োজন!"

এই বলিয়া রাজা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া যেমন দামোদর নদে ঝম্পপ্রদান করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার লক্ষ্যে পড়িল—দামোদরনীরে পরিবিস্তৃত ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করিয়া প্রশান্তমূর্তি গোস্বামী ভাসিয়া আসিতেছেন। রাজা গোস্বামীকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তীরদেশে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়া পতিত হইলেন। গোস্বামী ঠাকুর তীরে অবতরণ করিয়া রাজার হস্ত ধারণ করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীর করস্পর্শে সংজ্ঞা-লাভ করিয়া যোগীবরের পদতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। গোস্বামী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন: "রাজন্! তুমি মহাত্মা হইয়া সামান্য লোকের ন্যায় এরূপ শোকে বিহ্বল হইয়াছ কেন? তুমি তো জান—মৃত্যু দেহের অবস্থান্তর মাত্র। কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকিয়ো, তোমার পুত্রের এখনও মৃত্যু হয় নাই, এ-সংসারে তাহার এখনও অনেক কার্য অসমাপ্ত রহিয়াছে, কর্ম শেষ না হইলে কাহার সাধ্য তাহাকে এ-সংসার ছাড়াইতে পারে! সংসার কর্মক্ষেত্র, কর্ম-সাধনের জন্যই জীব নরাকার ধারণ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। চল—শীঘ্র যাইয়া রাজকুমারকে অবলোকন করি।"

অতি সত্বর সন্ন্যাসী নৃপতি-সমভিব্যাহারে পুরীমধ্যে উপস্থিত হইয়া মৃতকল্প রাজপুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহার দেহে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন: "হে প্রাণময় বিশ্বরূপ

ভগবান্! আমার প্রাণ কুমারকে অর্পণ করিলাম। ইহাকে সঞ্জীবিত কর।"

এই কথা বলিবামাত্র কুমার সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন। রাজা ও রাণী আনন্দে আত্মহারা হইয়া গোস্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। সমস্ত রাজপুরী আবার আনন্দে যেন জাগিয়া উঠিল। পুরীমধ্যে মহা-উৎসব আরম্ভ হইল। রাজা অকাতরে দীন-দরিদ্রদিগকে ধন-বিতরণ করিতে লাগিলেন।

নিভৃতে ঠাকুর গোস্বামী রাজাকে বলিলেন: "দেবনারায়ণ! আমার কর্ম শেষ হইয়াছে; রাজপুরীর এক নির্জন স্থানে আমার যোগকুটীর নির্মাণ করিয়া দাও; আমি উত্তরায়ণে যোগ অবলম্বন পূর্বক পরমাত্মায় লীন হইব।"

রাজা গোস্বামীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্য অন্তঃপুরের নিকটস্থ একস্থানে যোগকুটীর নির্মাণ করিয়া দিলেন। গোস্বামী কুটীর-মধ্যে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া যোগ-নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সে সমাধি আর ভাঙ্গিল না।

রাজা সেই পবিত্র স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবস্থাপন করেন। ঐ মহাপুরুষের নামানুসারে শিবের নাম 'মণিনাথ' রাখা হয়, এবং সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের হস্তে রাজা শিবের ভোগসেবাদির ভার অর্পণ করিয়া বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। গড়ভবানীপুরে এখনও (রূপান্তরিত) মণিনাথের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও মণিনাথের মন্দির-গাত্রে রাজা দেবনারায়ণের নাম ক্ষোদিত

রহিয়াছে। বর্তমান যুগে মহান্ত পরেশনাথ গিরির তত্ত্বাবধানে মণিনাথের ভোগোৎসব নির্বাহ হইত *।

দেবনারায়ণ পবিত্রদুর্লভ কৃষ্ণশিলার যে অপূর্বসুন্দর অচর পিনাকমণ্ডিত শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন, তাহা তাঁহার মুখ্যকল্প ছিল। তিনি এই বিগ্রহকে কালজয়ী করিবার আকাঙ্ক্ষায় অতিসুদৃঢ় ও সুচারুরূপে দেবতার বাসমন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। কিন্তু কালের প্রহার-সহনে অক্ষম মনোহারী ইষ্টকায়তনের সুগঠিত দেহ-প্রসর জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইয়া একদা অবলুপ্ত হইয়াছে, এবং তৎপরিবর্তে দেববিগ্রহের আচ্ছাদন-স্বরূপ সাধারণ অপ্রশস্ত মন্দির পুনর্নির্মিত হইয়া বর্ণবৈচিত্র্যহীনরূপে বিরাজ করিতেছে। সম্ভবতঃ রাজ্যের ভগ্নদশায় ঔদাসীন্যের ফলে এই মন্দিরের আদি-রূপ নষ্ট হয়, এবং তৎকালীন রাজার ভাগ্য-বিপর্যয়ে মন্দিরের শোভা-সম্পদ্ রাজ্যাপহারী শত্রুর লোভী ও রূঢ় হস্তক্ষেপে রিক্তসম্বল হইয়া উঠে। দ্বারশীর্ষে যে শিলালিপি ছিল, তাহা স্খলিত বিকৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু বহুজনের তপস্যাসঞ্চিত দেবতার শিলা-প্রতীক আপন মাহাত্ম্যে অনিন্দ্য অপ্রতিম প্রকাশে অধিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে দেববিগ্রহের বাসমন্দির স্বল্পায়তনে অনাড়ম্বরে পুনর্বার উত্তরপুরুষ কিংবা ভারপ্রাপ্ত পূজারী সেবক দ্বারা উত্তোলিত হওয়াই সম্ভবপর, এবং শিলালিপির ভগ্নাংশ উদ্ধার করিয়া ক্ষীণ স্মৃতি-রক্ষার জন্য অনিপুণহস্তে কথঞ্চিৎ সংস্কৃত হয়। এই কারণে অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তি-লাঞ্ছিত ইহার প্রকাশ অদ্যাপি

* এখন এই দেব-কার্য শূদ্রযাজী দেবল কর্তৃক সম্পন্ন হয় বলিয়া জানা যায়।

বর্তমান রহিয়াছে। নিঃসন্দেহই নানা হস্তান্তরের নিমিত্ত এই প্রকার বৈষম্য ঘটিয়াছে। কিন্তু যে অংশটুকু রক্ষা পাইয়াছে—তাহার মধ্যে বর্ণ-হিসাবে দুই-একটি অস্পষ্ট অক্ষর সংস্কারের দোষে প্রমাদ-ত্রুটীপূর্ণ হইলেও, 'দেবনারায়ণ' নামটি যে সংস্কারকের কল্পনার পরিণতি, তাহা একেবারেই মনে হয় না, বরঞ্চ সংস্কারক কর্তৃক প্রাচীন লিপিটি জ্ঞান ও সামর্থ্য-অনুসারে রক্ষা করিবার প্রয়াস লক্ষিত হয়। যাহাই ঘটিয়া থাকুক্—শিলালিপি-চিহ্নিত মণিনাথ শিবমন্দিরটি যে বিভিন্ন অনুকূল ও প্রতিকূল করস্পর্শে পূর্বরূপ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, কয়েকবার সংস্কার-কার্যে অজ্ঞতা-জনিত ভুলের উৎপত্তি। শিলালিপি যে পূর্ণাঙ্গরূপেই ক্ষোদিত হইয়াছিল, ইহা সহজবুদ্ধিতে স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীত, কিন্তু যে কোন কারণে অঙ্গচ্ছেদ হওয়াতে তাহার বর্তমান অসংলগ্ন রূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই যুক্তিযুক্ত যে—ইহার পূর্ণাঙ্গ রূপের লিখন সংস্কৃতে হইয়াছিল, এবং ইহার পাঠ নিম্নরূপেই হওয়া ন্যায়সংগত :

শ্রীভগবতঃ বাম[দেব মণিনাথস্য ।] ‖ শুভমস্তু।
দেবনারায়ণ-[স্থাপিতমিদং দৈবতম্ ।] ‖ ১(৪)০৬শকে। ২১ শ্রাবণ (দিনে)।

মণিনাথ-শিবলিঙ্গটি সুপ্রাচীন, এবং মন্দিরটি সংস্কৃত হউক্ বা পরবর্তী কালে পুনর্গঠিত হউক্, এই মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে দেবনারায়ণের নাম সুস্পষ্ট লিখিত আছে, লিপি অনুসারে দেবনারায়ণ মণিনাথশিববিগ্রহ ও মন্দিরের আদি ও প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ কোন কুটিল দৃষ্টিকৃপণতায়

অসিদ্ধ হইতে পারে না †। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে তাঁহার ন্যায় হৃদয়বান্ শান্তিপ্রিয় ভৌমিকরাজন্য বিরল ছিল। প্রেমধর্ম ও

---

† কেহ কেহ এ-বিষয়ে উদ্ভট ও অপ্রকৃত যুক্তি দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ভগবান্ শিবের মন্দির-সংলগ্ন শিলালিপিতে "শ্রীভগবতঃ বাসুদেব নারায়ণস্য" ক্ষোদিত ছিল—এই অনুমানে যে অযুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সারবত্তা তো কিছুই নাই, বরং কল্পনা-দৈন্যের চূড়ান্ত। এমন কোন নির্বোধ হিন্দু নাই যে শিবের মন্দিরে নারায়ণের নাম লিপিবদ্ধ করিতে পারে। পরন্তু 'দেবনারায়ণ' নাম ক্ষোদিত থাকা সত্ত্বেও পরস্পর-বিরোধী কুলজির কাঁচা ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব পর্যন্ত উড়াইয়া দিবার যাহারা দুর্বল চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সকল যাচনদারদের যাচাই তুচ্ছ করিয়া দেবনারায়ণ ভুরসুটব্রাহ্মণ-রাজবংশের ইতিবৃত্তে এক গৌরবময় স্থানের অধিকারী হইয়াই প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। দৃশ্যতঃ, ঢাকার বা বসন্তপুরের কুলজিগুলি অনবধানতা-প্রসূত, এই কুলজি-লেখকগণ উত্তরসাক্ষী বলিয়াই বিশ্বাস হয়, নহিলে একের সন্তান অন্যের স্কন্ধারূঢ় হইয়া 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে'-চলিত কথাটিকে সপ্রমাণ করিত না। 'মাছি-মারা কেরানী'-র মনোবৃত্তি লইয়া প্রকৃত তথ্যের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটন করা দুরাশা মাত্র। দক্ষিণ রায়ই যে দেবনারায়ণ—এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইতিহাসের যথার্থ স্বরূপ এই প্রকার কুলজিগ্রন্থের মধ্যে পাওয়া দুষ্কর, কেননা ইহা অভ্রান্ত নয়, সেইখানে ইহার প্রাণ-সন্ধান করিতে যাওয়াও যেরূপ—আসশেওড়া-ভেরেণ্ডা বনে আমলকীর সন্ধান করাও তদনুরূপ। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরে কুলজিগ্রন্থের প্রাধান্য কোন বিজ্ঞানী ঐতিহাসিকই দেন নাই, কেবল ঐ সকল গ্রন্থ হইতে মিথ্যার আবর্জনা ঠেলিয়া সত্য আহরণের চেষ্টা করা চলিতে পারে। কুলজিকে মাত্র মূলধন করিলে স্বেচ্ছাকৃত অনেক অলীক অনুমানের উদ্ভব হওয়াই সম্ভবপর।

ধর্মনিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। দেবোপম গুরু মণিনাথের অনুপ্রেরণায় হিন্দুধর্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনকল্পে তিনি স্থানে স্থানে ধর্মালয় ও দেববিগ্রহ স্থাপন করেন, এবং জনগণের ধর্মচর্যার নিমিত্ত বেদবেদাঙ্গ-পুরাণাদি পাঠ-ব্যাখ্যায় ও ধর্মালাপে সুদক্ষ তত্ত্বজ্ঞানী উপাধ্যায়গণকে রাজবৃত্তি-দানে কর্ম-নিরত রাখেন। এই সকল কার্য তাঁহার ধর্মানুরাগেরই পরিচয় প্রদান করে। তিনি প্রিয়পুত্রের প্রাণরক্ষার পর দেবতার প্রত্যাদেশে গোপাল-লীলা-রূপ-প্রতিমা-সকল নির্মাণ করেন।....দেবনারায়ণের রাজ্য-কালে নির্মিত দেবালয় ও অট্টালিকাসমূহের মধ্যে একমাত্র মণিনাথ-শিবমন্দিরটি বিদ্যমান থাকিয়া অতীত স্মৃতির সাক্ষ্য বহন করিয়া আনিতেছে।

সর্বদিক্ বিবেচনা করিয়া ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, রাজা দেব-নারায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন।

দেবনারায়ণের চরিত্র প্রণিধান করিলে, ইহাই বোধগম্য হয় যে, তিনি প্রজাশক্তিকে কোনদিন অমান্য করেন নাই। মানবত্তাকেই তিনি বড় করিয়া মানিতেন। তিনি প্রেমের দ্বারা সকলকে জয় করিয়াছিলেন। স্বদেশের স্বার্থই যে আপন স্বার্থ—এই শুভবুদ্ধি প্রজাগণের অন্তরে জাগরিত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীরামচন্দ্র যেমন প্রেমের পথে অশক্তগণকে একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবল শক্তির প্রবর্তন করিয়া-ছিলেন, সেই প্রেমনীতির অনুসরণ করিয়া তিনি জনগণকে সমমন্ত্রে মিলিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে উৎসাহিত করিতেন। নিজের প্রতাপবৃদ্ধি ও সুখসম্ভোগ মুখ্য হইয়া প্রজাসাধারণের

হিত-সাধন তাঁহার নিকট গৌণরূপে প্রতিভাত হয় নাই, সেইজন্য তিনি আত্মাপহারক রাজা ছিলেন বলিয়া কাহারও মনে অণুমাত্র সন্দেহ জাগিত না। দেবনারায়ণের দাক্ষিণ্য ও উদারতা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল। ইহাই সম্ভাব্য যে, তিনিই লোক-মুখে স্বীয় কর্মগুণে দক্ষিণ রায় নামে প্রচারিত হন।

এককালে এরূপ জনশ্রুতিও দমকা বাতাসের মত ভাসিয়া আসিয়া জানাইয়া দিত : তিনি ছিলেন ললনাভিলাষী এবং একাধিক রমার প্রেমসুন্দর। তাঁহার প্রথমা ও দ্বিতীয়া সহধর্মিণী রাজ্ঞী থাকা সত্বেও কয়েকজন সাধারণ অল্পবিত্ত কুটুম্বীর মনোরমা কন্যার প্রতি সহানুভূতি-লালিত অনুরাগ ও পরিণয়-প্রীতির কথা পল্লীকবি ও গায়ন দ্বারা সরস বর্ণনে বহুল প্রচলন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পঞ্চকুমার একাধিক পত্নীর গর্ভজাত বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি রসিকসমাজে দক্ষিণনায়ক রূপে আখ্যাত ছিলেন। সাধারণতঃ বহুক্ষেত্রে তিনি দেবনারায়ণ নামের পরিবর্তে দক্ষিণ রায় নামে অভিহিত হইতেন, ইহা মোটেই অমূলক নয়। গতযুগের শেষভাগে ও বর্তমান শতকের প্রথম পাদেও একদা পল্লীর মাঠে-বাটে পথচারী বাউল ও ভিখারী-গায়কের মুখে এইরূপ পদ * শোনা যাইত :

---

* বহুদিন পূর্বে শ্রুত গান বিচ্ছিন্নভাবে স্মৃতি-গর্ভে লীন ছিল, সেজন্য আবশ্যক-বোধে উত্তরকালে দুই-একজন বিশিষ্ট গ্রামবৃদ্ধের নিকট হইতে যাহা উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত হইল। এমন-কি সেদিন পর্যন্ত বহু-অনুরূপ পদ গাহিতে শোনা গিয়াছে।—

দেবানন্দ দক্ষিণ রায় !
দেবদেব নারায়ণ দোঁহা একে ভায়।
(মরি রে ভবানীপুরের রায়গুণমণি) ॥ ধুয়া ॥
এমত রে আচরিত রসমিত কথা !
উরে দেবী অম্বিকা বাঁয় ভোগবতী সতা।
চৌদিশে বেঢ়নে রমা ভুঞ্জে সুখ মনে,
দেব বৃহস্পতি শুক্র দোসর দেবনারায়ণে।
সুতহিবুক ভাগ্যের ফল মেলায় মেলানি,
বরগলে সাজে মণিহার গাঁথা পঞ্চরাণী।
(মরি রে রায়গুণমণি) ॥
এ বটে পীরিতি রীত, তবু বলে সুনাসীর,
অবরেসবরে ধরে রে করে বজরতীর।
দীনদুখীজন পিতামাতা পাইল রে রাজায়,
ভাবে দক্ষিণে দক্ষিণা সগুণ বাখানি নে যায়।
(মরি রে রায়গুণমণি) ॥

দেবনারায়ণ তাঁহার রাজ্য-মধ্যে কয়েকটি অগম্য ও অনুন্নত অঞ্চল সুগম ও উন্নত করিয়া তোলেন, তন্মধ্যে এমন দুই-একটি স্থান ছিল—যেখান হইতে তিনি অনুরাগে কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবস্থাপিত অঞ্চলগুলি তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন নামে রায়নগর, দেবানন্দপুর, দক্ষিণগ্রাম বা দক্ষিণপাড়া বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। এই নামোক্ত বর্তমান স্থানসকল দেবনারায়ণ-প্রতিষ্ঠিত কি-না, তাহা সুনির্ণীত নহে।

রাজা দেবনারায়ণের ধর্মানুরাগ, ন্যায়পরায়ণতা, মায়া-মমতা ও

পরোপকার-ব্রত সকল স্তরের লোকের হৃদয় হরণ করিয়াছিল। তিনি প্রজাবর্গের নিকট দ্বিতীয় প্রাণের তুল্য প্রিয় ছিলেন। তিনি কোনদিন রাজ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই সত্য, কিন্তু যে জনপদ তাঁহার অধিকারে ছিল—তাহাকে শান্তিপূর্ণ, সহজজীবন-যাত্রায় গতিশীল ও অভাব-মুক্ত করিবার দিকেই তাঁহার সবিশেষ লক্ষ্য ছিল।

তাঁহার রাজ্যকালের শেষদিকে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন হাবশী-নায়কের লোভীহস্ত রক্ত-কলুষিত করিয়া তোলে, এবং গৌড়-রাজধানী রক্তস্নানে আপ্লুত হইয়া উঠে। অত্যাচার-অবিচারের বিষবাষ্প তাঁহার রাজ্যকেও গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু দৈব-সহায়তায় নিষ্কৃতির পথও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত পর-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।—

মহেন্দ্রনারায়ণ

মালিক আন্দিল বা সৈফ্-উদ্দীন ফিরোজ শাহ্ গৌড়ের সিংহাসনে (খ্রীঃ অঃ ১৪৮৭) অধিরূঢ় হইয়া তাঁহার প্রভু ফতে শাহের আদর্শ ও রাজ্যচালন-নীতি যথাসম্ভব অনুসরণ করিতে লাগিলেন। হাবশীগণের আধিপত্য-কালে বাঙ্গালায় যে-দুর্যোগ ঘনীভূত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল ফিরোজ শাহের রাজত্বই মশকিল-আসান রূপে সারাদেশে স্বস্তি আনিয়া দিল—যেন ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন দিনে প্রীতিপ্রদ আলোকরেখা। ইহা দেশের সকলেই অনুভব করিল। সুলতান-শাসিত গৌড়রাষ্ট্রের সহিত যে-সকল রাজন্য মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, সেই মৈত্রী-সূত্র যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—সে-বিষয়ে ফিরোজ শাহ্ মনোযোগী হইলেন। এতৎপূর্বে ফতে শাহ্ ও ভুরসুটরাজের মধ্যে অত্যন্ত সদ্‌ভাব ও নির্ভরতা স্থাপিত হইয়াছিল, উপরন্তু ভুরসুটরাজ সবিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাঁহার সৈন্যবল ও নৌবল সুলতানের অর্থ বা সাহায্য ব্যতিরেকেই সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিবেচনায় ফিরোজ শাহ্ ভুরসুটরাজের সহিত মিত্রতা অব্যাহত রাখিতে যত্নবান্ হন, এবং তাহার নিদর্শন-স্বরূপ রাজা শ্রীমন্তের সুযোগ্য বীরপুত্র মহেন্দ্রকে দক্ষিণপশ্চিম রাঢ় ও মন্দারণের অবিসংবাদী সেনাধিনায়ক-রূপে সম্মানিত করেন। তিনি ছিলেন উদারনৈতিক ও পরধর্মসহিষ্ণু, তদুপরি তাঁহার হিতৈষণা ও অনুকম্পা তাঁহাকে সর্বচিত্তজয়ী করিয়া তুলিল;

অধিকাংশ সময়ে দুঃস্থগণের দুঃখ-মোচন অভিপ্রায়ে তাঁহার অতিরিক্ত অর্থদান কোষাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীসকলকে হতবুদ্ধি করিয়া দিল। এক হাবশী সুলতানের মনোবৃত্তি ও আচরণ তাঁহার জাতি-সুলভ দুষ্টপ্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত জানিতে পারিয়া ভুরসুটপতি দেবনারায়ণ যেরূপ বিস্মিত হইলেন, তদপেক্ষা প্রশংসাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি খুল্লতাত-পুত্র মহেন্দ্রকে বহুতর উপঢৌকন-সহ সুলতান ফিরোজ শাহের নিকট তাঁহার আন্তরিক অনুকূল ভাব জ্ঞাপনার্থ গৌড়ে প্রেরণ করিলেন। মহেন্দ্র সুলতান কর্তৃক সমাদৃত হইলেন।

মহেন্দ্র বীর্যবান্ পিতার সর্বকর্মে ছায়া-স্বরূপ ছিলেন। অল্প-বয়স হইতেই তাঁহার অস্ত্র-বিদ্যার আরম্ভ, যৌবনেই তিনি যুদ্ধপটু হইয়া উঠেন। ইতোমধ্যে তাঁহার পৌরুষের খ্যাতি প্রচার-লাভ করিয়াছিল। ফিরোজ শাহ্ ছিলেন নিজে বীর, তিনি মহেন্দ্রকে বীরের যোগ্য মর্যাদা দিতে কৃপণতা করিলেন না। সুলতানের ইচ্ছায় তিনি রাজধানীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে সৈন্য-পরিদর্শনের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইল। মহেন্দ্র স্বীয় চরিত্রগুণে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়-ভুক্ত সৈন্যগণেরই অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, সকলের সসম্মান প্রীতি-লাভেও বঞ্চিত হইলেন না। এইরূপে কর্মের উৎসাহে ও আনন্দে কিছুকাল নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। কিন্তু মহেন্দ্রের পদমর্যাদা, জনপ্রিয়তা ও প্রাধান্য কয়েকজন ক্ষমতা-লোভী আমীরের মনে বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিল। বিশেষতঃ, ফিরোজ শাহের আদেশে কর্মরত, ফতে শাহের বালক পুত্রের তালিমদার ও অলি-অছি, হাবশী হবশ্ খাঁর

অন্তরে ঈর্ষ্যার আগুন ধূমায়িত হইতে লাগিল। কিন্তু প্রকাশ্যে মহেন্দ্রের প্রতি শত্রুতাচরণে কেহই কোন ছল খুঁজিয়া পাইল না। বেওয়া সুলতান-বেগম, তাঁহার পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিত বলিয়া, হব্‌শ্‌ খাঁকে অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। এই সুযোগ ধরিয়া হব্‌শ্‌ খাঁ বেগমের কাছে সময়ে-অসময়ে মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে রকম রকম মনগড়া নালিশ জানাইতে লাগিল, এমন কথাও ইঙ্গিত করিল যে,—কাফেরের সঙ্গে সিপাহীদের এই বেমক্কা সরাসরি যোগ থাকিলে—সর্বনাশের পথ পরিষ্কার-করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। সিপাহী-পাইকদের বশে আনিয়া এই তখ্‌ত দখল করার মতলব যে ঐ কাফেরের নাই, তাহার নিশ্চয়তা কি? কাফেরকে এতদূর বিশ্বাস করা ভালো বলিয়া মনে করা যায় না। এরূপ ব্যাপার পূর্বে ঘটিয়াছে, ইহার ইসাদী অনেক আছে। সুতরাং শাহ্‌জাদার তখ্‌তে বসা একটা সমস্যা হইয়া উঠিতে পারে।... এই কুমন্ত্রণা এক পরমুখাপেক্ষী স্বভাবদুর্বলচিত্ত নারীকে বিচলিত করিয়া তোলাই স্বাভাবিক। বেগম এই ভবিষ্যৎ-সংশয়ের কথা ফিরোজ শাহের নিকট প্রকাশ করিলেন। সুলতান প্রভু-পত্নীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন: "আপনি মনের মধ্যে এ ভেদ-বুদ্ধি আনিবেন না। কোন স্বার্থান্বেষী লোকের বাক্যে আপনার যদি এই ধারণা জন্মিয়া থাকে, তবে জানিবেন—ইহার মূল হীন অসূয়ার উদ্‌গার মাত্র; আমি লক্ষ্য করিয়াছি—এই হিন্দুবীরের পৌরুষ, প্রতিপত্তি ও ঋজুপ্রকৃতি কয়েকজন কাপুরুষ আমীর-ওমরাহের এবং আরও দুই-একজন আত্মসার ব্যক্তির মনোভঙ্গের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, কেননা ইহাদের সংকল্প হয়তো বিকল্পে

পরিণত হইয়াছে। আমি ন্যায়ের অপমান করিতে শিখি নাই, সেজন্য বিনা প্রমাণে কাহারও নামে অন্যায় অভিযোগ শুনিতে অভ্যস্ত নহি। সেনানায়ক মহেন্দ্র আমাদের অকৃত্রিম মিত্র, তাঁহার পক্ষ হইতে কোন আঘাত আসিবার আশঙ্কা নাই। বরং রাজ্যের ঐ সংকীর্ণচেতার দলকেই আমি সন্দেহ করি। আমার প্রতি আপনার বিশ্বাস শিথিল করিবেন না—এই আমার নিবেদন। আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিবার শক্তি যেন না লোপ পায়।"

কিন্তু স্ত্রীচরিত্র বঞ্চনা ও সন্দেহের উপরেই ভিত্তি-স্থাপন করে। প্রভুভক্ত ফিরোজ শাহের আশ্বাস পাইয়াও, বেগম্ এই প্রকৃতিগত দুর্বলতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। রমণীর মনে সন্দেহের বীজ একবার উপ্ত হইলে, তাহা যতই অমূলক হউক্—অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ পল্লবিত হইতে থাকে। বেগমেরও অন্তরে এইরূপ ক্রিয়া চলিতে লাগিল, তিনি পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অকারণ উদ্‌বিগ্ন হইলেন। কুপরামর্শ ও মিথ্যার শক্তি এমনই প্রবল যে, ন্যায়দর্শী ফিরোজ শাহের মহেন্দ্র-প্রীতির জন্য—এই অতিবড় হিতৈষী ও বিশ্বস্ত বন্ধু সম্পর্কেও তাঁহার মনোমধ্যে অনুযোগ জমা হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, মহেন্দ্রও তাঁহার ভীষণ বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন।

এদিকে হব্‌শ্‌ খাঁ মনে মনে একটি গোপন অভিসন্ধি পোষণ করিতেছিল। এই হাবশী ক্রীতদাস বেগমকে সম্পূর্ণ বশে আনিতে না পারিলেও, তাঁহার চিত্তের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও সে তলে তলে ফিরোজ শাহ্‌ ও মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে নানারূপ ভিত্তিহীন কুযুক্তি দ্বারা

প্রাসাদ-রক্ষী পাইকদের মনে দারুণ অসন্তোষ জাগাইতে চেষ্টা করিল। সকলেই যে সায় দিল—তাহা নহে, কিন্তু অব্যবস্থিত-চিত্ত কতিপয় পাইক হব্‌শ্‌ খাঁর সহিত গোপন যোগাযোগ রাখিতে কুণ্ঠা-বোধ করিল না। এই চক্রান্তের সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইল; হব্‌শ্‌ খাঁ ফিরোজ শাহের নাম সঙ্গোপন করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলেন যে—ইহার ফলভোগী হইবে কাফের মহেন্দ্র। কারণ, সে জানিত—সুলতানের কোন অনিষ্ট-কল্পনাও বেগমের অনুমোদন লাভ করিবে না। প্রকৃতপক্ষে, বেগমের একমাত্র অভিপ্রায়—মহেন্দ্রের অধঃপতন, কিন্তু ফিরোজ শাহ্‌ ছিলেন তাঁহার প্রধান নির্ভরস্থল, এই নিরাপদ আশ্রয় ভাঙ্গিয়া পড়ুক্—ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ছিল।

হব্‌শ্‌ খাঁ বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না, কর্মনিপুণ মহেন্দ্রের সজাগদৃষ্টির কাছে সেই চক্রান্ত সূচনাতেই ধরা পড়িয়া গেল। তিনি ইহার মূল অনুসন্ধান করিয়া, তাহার উচ্ছেদ-মানসে কৃতনিশ্চয় হইলেন। হব্‌শ্‌ খাঁ, তাহার দুষ্ট অভিসন্ধি প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, প্রথমেই পাইকদের উৎকোচ দানে মুখ বন্ধ করিয়া দিল, আর নিজে সকল ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভাব দেখাইয়া অতিসাবধানে কার্য-কারণ লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান অন্তরায় মহেন্দ্রের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও আক্রোশ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কর্তব্য-বোধে যথাজ্ঞাত পাইকদেরকে প্ররোচনা-দানে কোন স্বার্থান্ধ ব্যক্তির ষড়্‌যন্ত্রের উদ্যোগ-পর্বের কথা সুলতান ফিরোজ শাহের সকাশে নিভৃতে জ্ঞাপন করিলেন। নির্ভীক

যোদ্ধা ফিরোজ শাহ্ এ-বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ না দিয়া, মহেন্দ্রকে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বলিলেন। মহেন্দ্র পাইকদের উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য কয়েকজন বিশ্বাসী রক্ষীসেনা নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাদের গতিবিধি কঠিন নিয়মে বাঁধিয়া দিলেন। কিন্তু নিয়তিকে কেহই বাধ্য করিতে পারে না। সেই বৃত্তান্ত এখানে উল্লিখিত হইতেছে।

মহেন্দ্রের প্রিয়দর্শন অথচ পৌরুষব্যঞ্জক মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, কেবল রমণীগণেরই নেত্রের উৎসব ছিল না— পুরুষদেরও পিছন ফিরিয়া তাকাইতে হইত। প্রতিদিন তিনি দেহরক্ষী সৈন্যগণের সহিত এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহণে নগরের প্রধান পথ দিয়া আপন কর্মে গমন করিতেন। একদা উজীর-কন্যা মহলের ঝরকার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজপথের জনতা দেখিতে-ছিল, এমন সময়ে সুবেশ-সুন্দর মহেন্দ্র নয়নানন্দ-রূপে তাহার চিত্তে নিমেষ-মধ্যে একটা নূতন অনুভূতি জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। কোন্ অদৃশ্য কর তাহার আঁখিপল্লবে অনুরাগ-রসের অঞ্জন আঁকিয়া দিল, তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির 'পরে ভাসিতে লাগিল— অদৃষ্টপূর্ব পরমসুন্দরের আয়তলোচনদ্বয়ে অপরূপ জ্যোতির লীলা, সুঠাম-মনোহর অবয়ব শূরোচিত মর্যাদার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাহার হৃদয়াকাশে যেন প্রথম সুধাংশুর উদয়। তাহার সদ্যোজাত কামনা মর্মরাগিণী-বিস্তৃত অভিসার-পথে সেই অজানিত প্রাণ-বল্লভকে অনুগমন করিল। সেইদিন হইতে উজীর-কন্যা ঝরকার মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট সময়ে মহেন্দ্রের দর্শন পাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া নিত্য অপেক্ষা করিত। তাহার দৃষ্টির বিভ্রম-বিলাসে যেন দিন

দিন ঔৎসুক্য বর্ধিত হইতে লাগিল, যৌবন যে মহার্ঘ্য—তাহা মর্মে মর্মে সে উপলব্ধি করিল। উজীর-কন্যার এই অনুরাগের বিষয় প্রধানা সহচরীর অগোচরে রহিল না। কিন্তু সহচরী-মুখে মহেন্দ্রের পরিচয় পাইয়া উজীর-কন্যার মন দূর-দুরাশায় বেদনাহত হইল। বিধিনিষেধের পাষাণ প্রাচীর তাহার মিলন-পথে দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, কেমন করিয়া সে এই দুর্বহ জীবন-ভার বহিবে, ইহা উত্তীর্ণ হইবার কি কোন উপায় নাই? এই চিন্তা তাহাকে অহরহ আঘাত করিতে লাগিল। সহচরীরা তাহার মনোরঞ্জনের জন্য নানা প্রমোদের আয়োজন করিল, তাহাকে অনেক বুঝাইল, কিন্তু যাহার চিত্ত স্ববশে নাই—তাহার কাছে সমস্ত উপদেশ, বাহিরের সকল সমারোহই নিষ্ফল। কিছুদিন এরূপ মনস্তাপে কাটিবার পর, উজীর-কন্যার ইচ্ছাক্রমে এক নিদাঘ-সন্ধ্যায় গোলাপবাগে প্রমোদ-মঞ্জিলের সুগন্ধ তৈলাধার রত্নপ্রদীপোজ্জ্বল সুরম্য কক্ষে নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা হইল। সঙ্গিনীগণ সানন্দে উজীর-কন্যার প্রিয়নর্তকীকে আনিয়া হাজির করিল। সেতারে উঠিল মন্দ-মধুর ঝঙ্কার—নর্তকীর ঘুঙ্গুরে বাজিল রিণি-ঝিনি সুর। বাদামফুলের চুমকি-তোলা মসলিন-ওড়না উড়িতেছে, আতরের মদির গন্ধ বাতাসের সহিত মিশিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা স্বপ্নাবেশ রচনা করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেতার দ্রুততালে বাজিতে লাগিল, নর্তকীর নৃত্যবিলাসও চপল হইয়া উঠিল। হঠাৎ প্রদীপের শিখা লাগিয়া তাহার ওড়নায় আগুন ধরিয়া গেল। সেদিকে কাহারও মনোযোগ ছিল না, হঠাৎ লক্ষ্য পড়িল উজীর-কন্যার। ওড়না

জ্বলিয়া বসন স্পর্শ করিল। উজীর-কন্যা দেখিবামাত্র নর্তকীর বসনের আগুন নিবাইতে গিয়া নিজেই আগুনের কবলে পড়িল। অঙ্গ-বাসে আগুন বিস্তার করিতে—গৃহ-মধ্যে স্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। সঙ্গিনীর দল ভয়-ব্যাকুল হইয়া নিস্তারের সদুপায় স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা উজীর-কন্যাকে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিল, এবং অগ্নি-নির্বাপণে বিফল হইয়া আর্ত-ক্রন্দনে সে-স্থান মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই মুহূর্তে দৈবক্রমে মহেন্দ্র নগরপথে ফিরিতেছিলেন, সহসা স্ত্রীগণের আর্তধ্বনি শুনিয়া গতি স্তব্ধ করিলেন। পুনর্বার বিপন্নাগণের আর্তনাদ ভাসিয়া আসিল, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া উদ্যান-প্রাচীর উল্লম্ফনে সেই স্থানে ত্বরিতগমনে উপস্থিত হইলেন। প্রথমে তিনি রমণীদের মধ্যে অগ্রসর হইতে দ্বিধা-বোধ করিলেন, কিন্তু আসন্ন বিপদ্ দর্শনে, সরম-সম্ভ্রম অপেক্ষা প্রাণের মূল্য অপরিমেয় বিবেচনায় সহচরীগণকে সরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন, তৎপরে বহুযত্নে তিনি উজীর-কন্যার বসনাগ্নির অবসান করিতে সমর্থ হইলেন। উজীর-কন্যা তখন মূর্চ্ছিতপ্রায়, অবসন্ন, তাহার দেহের স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল। কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকে শিবিকায় গৃহে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়া—মহেন্দ্র যে-পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই নিস্ক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি সন্ধানী-চক্ষু এড়াইতে পারিলেন না।

উজীর-কন্যা আরোগ্য-লাভ করিতে কিছু সময় লইল। সুস্থ হইয়া উজীর-কন্যা মহেন্দ্রের মহোপকার স্মরণ করিয়া সম্প্রীতি ও

কৃতজ্ঞতা জানাইতে ভুলিল না। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল যে, সেই ঘটনার মূলে দৈব যোগাযোগ নিহিত রহিয়াছে, এই সূত্রে তাহার বাঞ্ছিত প্রিয়জনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের শুভ অবসর মিলিবে। এই ভাবিয়া উজীর-কন্যা একটি গোপন লিপি ও বহুমূল্য রত্নোপহার-সহ তাহার বিশ্বস্তা পরিচারিকাকে মহেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিল। মহেন্দ্র মুক্তচিত্তে উপহারগুলি গ্রহণ করিলেন, এবং লিপির মর্ম এই বুঝিলেন যে, উজীর-কন্যা তাহার প্রাণদাতা পুরুষপ্রবরের দর্শন ও প্রীতি পাইবার জন্য উৎসুক··· তিনি যেন সেই যাচিকার মিনতি পায়ে না ঠেলিয়া ফেলেন। কিন্তু মহেন্দ্র এই আমন্ত্রণ-প্রস্তাব সহজমনে স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না, তাঁহার মনের মধ্যে কয়েকটি প্রশ্ন উঠিল। নিজে নিজে তর্ক ও চিন্তা দ্বারা স্থির করিলেন যে—এই সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ নির্দোষ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না।—অতঃপর, তিনি সম্মতি দিলেন।

এক অবরোধবাসিনী সম্ভ্রান্তবংশীয়া সুন্দরী তরুণীর অচিন্তিত আমন্ত্রণে মহেন্দ্রের মনে যেরূপ কৌতূহল জাগিল, তেমনি দুর্লক্ষ্য ফলাফলের সংশয়-প্রশ্নে তাঁহার মন দুলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার বাক্যদান-অনুসারে নিশামুখে নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সম্মুখে যখন এক খোজা আসিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার ক্ষীণ আপত্তিটুকুও ভাসিয়া গেল। বক্ষ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত কবচাবরণের উপর তিনি বেশ-বিন্যাস করিলেন এবং যাত্রার পূর্বে বস্ত্র-মধ্যে একটি অস্ত্র লুকাইয়া লইতে ভুলিলেন না। খোজা তাঁহাকে মহলবাগে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিল। তাহার পর শির-

বাঁদী গুলজার বিবি মহেন্দ্রকে পথ দেখাইয়া একটি কক্ষের ভিতর লইয়া গেল। সুরভিত কক্ষ-তলে একটি সুকোমল পারস্য-গালিচা বিস্তৃত, মধ্যস্থলে পালঙ্কোপরি শয্যায় সুবর্ণ ঝালরের রেশমী আস্তরণ এবং সুবিন্যস্ত কিংখাবের উপাধান। নানা জাতির পুষ্পমাল্যে সজ্জিত গৃহটি যেন গন্ধ-রঙের দান-সত্র খুলিয়া দিয়াছে। কাচের আধারে রক্ষিত গন্ধ তৈলের রজত-দীপমালার আলোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত। পালঙ্কের পার্শ্বে একটি সুদৃশ্য সুখাসন পাতা, গুলজার বিবি সেই আসনটি দেখাইয়া দিয়া মহেন্দ্রকে বসিতে বলিল। অব্যবহিত পরে প্রকোষ্ঠের মুকুর-মণ্ডিত অন্তর্দ্বার উন্মুক্ত হইল, উজীর-তনয়া প্রধানা সহচরীর সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া দেখিল—যেন তাঁহার নয়ন-সমক্ষে সমস্ত আলোক ম্লান করিয়া দিয়া শুভ্রকান্তি চন্দ্রাবলী অজস্ররূপে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। উজীর-কন্যা মহেন্দ্রের দিকে একবার লজ্জানম্র সানুরাগ দৃষ্টি ফেলিয়া পালঙ্কের উপর গিয়া বসিল।

উজীর-কন্যা দয়িতসুন্দরের মনোহারিণী সংবর্ধনার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুন্দরী সহচরীরা সেও-নাশপাতি-অঙ্গুর-মেওয়া প্রভৃতি ফল ও মিষ্টদ্রব্যের সম্ভার এবং পুষ্পসার-মিশ্রিত খোশ-বায় শরবত আনিয়া দিল। প্রধানা সহচরী মহেন্দ্রকে পান-আহার করিবার জন্য উজীর-কন্যার বিনীত অনুরোধ জ্ঞাপন করিল। মহেন্দ্র নারীর অনুনয় এড়াইয়া যাইতে পারিলেন না। ইহার পর মৃদুমন্দ সুরে সঙ্গীত-পরিবেশন আরম্ভ হইল। উজীর-কন্যা গজদন্তাবয়বী কারুকার্য-খচিত একটি নাতিক্ষুদ্র বীনের

তারে তারে কুসুম-সুকুমার অঙ্গুলি সঞ্চার করিতে লাগিল। রাগিণীর করুণ-কোমল আলাপে যেন তাহার অনুরাগী প্রাণের আকুতি সেই গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহেন্দ্র অপলকনেত্রে বীণাবাদিনীর দিকে চাহিয়া ছিলেন, তিনি দেখিতে ছিলেন—এক স্নিগ্ধ পদ্মরাগবর্ণা কুঞ্চিতকৃষ্ণকুন্তলা অনিন্দ্য রূপবতীর নীলাভ নয়ন-যুগে নিকষ-কালো তারা দুইটি যেন মধুলোভী ভৃঙ্গের ন্যায় সতত নৃত্য করিতেছে। বীন কড়িমধ্যমে ঝঙ্কার তুলিল যেন তাহার মর্মবাণীর ব্যঞ্জনা। সহসা মহেন্দ্রের সহিত উজীর-কন্যার চোখোচোখি হইবামাত্র মধ্যপথে স্বর-ভঙ্গ হইল, তাহার অঙ্কবিহারিণী বীণা যেন সরমে লুটাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। সহচরীদের মনে হইল—উভয়ের নয়ন-সংকোচে উভয়েরই ঔৎসুক্য যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই নিস্তব্ধতার মুহূর্তে প্রধানা সহচরীর সংকেতে অন্যান্য সহচরী সকলেই কক্ষ হইতে সরিয়া গেল। তখন প্রধানা সহচরী মহেন্দ্রকে বলিল: "বাবুসাহেব, আমাদের বিবিজানের দিল এখন আর দখলে নাই, তাই সুর ছুটিয়া গিয়াছে, কোন কসুর ধরিবেন না। আপনি ইহার প্রাণ রাখিয়াছেন, আপনার হাতেই ইনি সেই প্রাণ জিম্মা করিয়া দিয়াছেন। আপনি এই অমূল্য জওহরের কদর বুঝিয়া জিন্দিগি-ভোর ইহার আসল দখলিদার হইয়া থাকিবেন, ইহাই প্রিয়সখীর অন্তরের কামনা।"

মহেন্দ্র এই অসম্ভব প্রস্তাব প্রত্যাশা করেন নাই, তিনি আসিয়াছিলেন নিঃসন্দেহে নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে। তিনি প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, কিন্তু সে-ভাব কাটিতে অধিকক্ষণ লাগিল

না, সংযতস্বরে তিনি বলিলেন : "উজীর-কন্যার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন স্বয়ং বিধাতা, আমি নিমিত্তমাত্র। বিপদে অন্যের সাহায্যে আসা মানুষের ধর্ম, আমি কেবল তাহাই পালন করিয়াছি, জীবন রাখিয়াছি বলিয়া জীবন সঁপিয়া দিবার কোন কারণ জাগিতে পারে না। উজীর-কন্যার কৃতজ্ঞতার যে দান আমি পাইয়াছি, তাহাই যথেষ্ট। ইঁহার বহুত মেহেরবানী, তাহা আমি মাথায় পাতিয়া লইতেছি। কিন্তু এই ললনার ইচ্ছায় আমি সায় দিতে অক্ষম। আমি হিন্দু, ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম, স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ভিন্নজাতির কন্যাকে আমি গ্রহণ করিতে পারি না। এই কার্যে দেশ ও সমাজের অনিষ্ট হইবে। ইহাতে যদি আমার হৃদয়হীনতার পরিচয় আপনাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে, আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

এই কথা শুনিয়া উজীর-কন্যার মুক্তা-দন্তপাঁতি-শোভিত ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, নবচন্দ্ররেখা-সম সুন্দর ভালদেশে বিন্দু বিন্দু স্বেদজল ফুটিয়া উঠিল, ক্ষণপরেই মূর্চ্ছাপন্না মোহিনী কুমারীর আঁখিদ্বয় নিমীলিত হইল। মহেন্দ্র আর অপেক্ষা করা সমীচীন নহে—এই বিবেচনায় এক প্রকার জোর করিয়াই সেই মহল হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তখন এক প্রহর রাত্রি অতীতপ্রায়। মহেন্দ্র প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া তরু-বীথি দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি পথ চলিতেছিলেন—যেন নির্বিকার নিস্পন্দ, একটা অস্বস্তি-ভাব তাঁহাকে নিয়ত পীড়ন করিতেছিল। বাসস্থানের নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই হঠাৎ একটি তীর আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত

করিল, তাঁহার চমক ভাঙিয়া গেল, কিন্তু বর্মে লাগিয়া নিক্ষিপ্ত তীর তাঁহার দেহ-ভেদ করিতে পারিল না, শত্রুর উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইল। তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি চলিল না। আর মুহূর্ত্তকালও নষ্ট না করিয়া তিনি অতি সাবধানে দ্রুতপদে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গে রক্ষিত কৃপাণটি হাতে লইলেন। কিছুদূর যাইবার পর আর-একটি তীর তাঁহার বাম-মণিবন্ধের ত্বক্ কাটিয়া কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গিয়া পড়িল। মহেন্দ্র বুঝিলেন—তীরন্দাজ সুদক্ষ, আর বুঝিলেন—তাঁহার গতিবিধির সন্ধান রাখিয়া শত্রুপক্ষ অন্ধকারের অন্তরালে তাঁহাকে গুপ্তহত্যা কারবার জাল পাতিয়াছে। কিন্তু তিনি জীবন-সংশয় জানিয়াও ভীতি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন না; উষ্ণীষ-প্রান্ত ছিন্ন করিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিলেন, তৎপরে দুঃসাহসিকের ন্যায় একটি বৃক্ষকাণ্ডের পার্শ্বে অবস্থান করিয়া নিশাচর শত্রুচরদের গতি নিরূপণের চেষ্টা করিলেন। কিছুক্ষণ সমস্তই নিস্তব্ধ, জনপ্রাণীর অস্তিত্ব পর্যন্ত অনুভূত হইল না। দৈবগতিকে একটি পেচকের ঘুৎকার-শব্দে আকৃষ্ট হইয়া উপরে তাকাইবামাত্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল—নিকটস্থ স্থূলশাখায় স্থিত এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া একটি সুতীক্ষ্ণ বর্শা-প্রহারে উদ্যত হইয়াছে, তিনি বিদ্যুৎ-চকিতে পশ্চাৎপদ হইলেন, বর্শা সবেগে নামিয়া আসিয়া তলদেশে গিঁথিয়া গেল। সেই বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তি প্রমাদ গণিয়া মাটিতে লাফাইয়া পড়িয়াই উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। মহেন্দ্র সেই বর্শাটি তুলিয়া লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইলেন এবং লক্ষ-স্থির করিয়া

সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ সন্ধান—পলাতকের জানুদেশ বিদ্ধ হইল, তথাপি একবারমাত্র আর্তরব তুলিয়া সে প্রাণপণে ছুটিয়া অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। মহেন্দ্র আর অপেক্ষা করিলেন না, সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চলিতে স্বীয় আবাসে উপনীত হইলেন।

উজীর-তনয়ার সহিত সম্বন্ধ-সূত্র টানিয়া মহেন্দ্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত ঘনীভূত হইল। এমন-কি ফতে শাহের বেগম এই ঘটনার সংবাদ অবগত হইয়া প্রকাশ করিলেন যে, উজীর খাঁ জহান্ অবিসংবাদিত ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার আশায় আপন সুন্দরী কন্যার প্রণয়-মূল্যে সেনাপতি কাফের মহেন্দ্রকে আয়ত্তে আনিতে সংকল্প করিয়াছেন। মহেন্দ্রকে জামাতা করিয়া গৌড়-বঙ্গে একাধিপত্য বিস্তার করা উজীরের চরম উদ্দেশ্য বলিয়াই বিশ্বাস হয়। এই সংঘটনে প্রমাণিত, ভাবী-সুলতান কুমারকে এবং বর্তমান সুলতানকেও হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছে।

বলা বাহুল্য, স্বার্থান্বেষী ঈর্ষ্যান্বিত হব্‌শ্‌ খাঁ বেগমের হিংসা-বহ্নিতে ক্রমাগত ইন্ধন যোগাইতেছিল। বেগম এই সন্দেহ ফিরোজ শাহের মনে অতি সুকৌশলে বদ্ধমূল করিয়া দিতে ত্রুটী করিলেন না। ফিরোজ শাহ্ ন্যায়বিচারক হইলেও, তাঁহার মনে সন্দেহের রেখাপাত হইল। উজীর এই মিথ্যা অভিযোগ শুনিয়া যেন সংবিৎ-হারা হইয়া গেলেন, কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ তুলিয়া শপথ উচ্চারণে গোচরে আনিলেন যে, তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গ জ্ঞাত নন্। অবরোধবাসিনী উজীর-কন্যাকে তাহার স্বেচ্ছাচারের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। পিতার আদেশে

নিরপরাধা দুহিতা অবরোধে কঠিন প্রহরায় বন্দিনী হইয়া রহিল।

এদিকে মহেন্দ্রের সহিত সুলতানের কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ চলিতেছিল। তিনি বহু চেষ্টাতেও সুলতানকে প্রকৃত অবস্থা সম্যক্ উপলব্ধি করাইতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহার প্রত্যয় জন্মিল, প্রতিকূল দৈবের ক্রিয়ায় চক্রান্ত-সেবিত মিথ্যার শক্তি এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, বিরলভূষণ সত্য আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্রের সংশয় জাগিল—চক্রীদের নিপুণ চাতুরী-জাল ভেদ করিতে না পারিয়া মোহান্ধ সুলতান খুব সম্ভব তাঁহাকে অচিরকালেই কারারুদ্ধ করিবেন। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে রজনী-যোগে গৌড়-রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নিজ-রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদায়ের সময় তাঁহার দুইজন বিশ্বস্ত চর সেখানে তিনি রাখিয়া আসিলেন। মহেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী তাহারা অবস্থার গতি নিরীক্ষণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সংবাদ-সংগ্রহে নিযুক্ত রহিল।

মহেন্দ্র গড়ভবানীপুরপতি দেবনারায়ণের সমীপে সকল ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া রাজ্যকে অধিকতর সুরক্ষিত করিবার পরামর্শ দিলেন, তাহার অর্থ—সৈন্য-সংখ্যা ও অস্ত্র-শস্ত্রের বৃদ্ধি-করণ এবং আত্মরক্ষার জন্য রাজ্য-সীমা গড়ে পরিবেষ্টিত করা। যুবরাজ দর্পনারায়ণের কাছেও মহেন্দ্রের এই মন্ত্রণা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইল। কিন্তু দেবনারায়ণ চিন্তা করিয়া বলিলেন: "সাময়িক উত্তেজনার বশে সর্বদিক্ বিচার না করিয়া, দেশকে রণসজ্জার বিপুল ভারে পীড়িত করা উচিত মনে করি

না। দেশ অজেয় কখন্ হয়—কখন্ দেশের মঙ্গল হয়, যখন রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির মিলন সার্থক করিয়া তোলা যায়। নিজ দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে—ইহাকে প্রজাসাধারণের সম্পদ্ করিয়া তুলিতে হইবে, এবং সর্বসাধারণের শক্তিকে সম্মিলিত করাই ইহার মুখ্য উপায়। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য—সর্বতোভাবে সেই উপায় কার্যকরী করা। প্রজাবর্গের মনোবল যাহা দ্বারা দৃঢ় হয়, তাহাদের তদনুরূপ দীক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে আমাদের দেশকে প্রতিপক্ষের আক্রমণ করিবার উৎসাহ নির্বাপিত হইবে। কৌশলে যুদ্ধ এড়াইবার চেষ্টা করা বুদ্ধির কাজ, নতুবা যুদ্ধবিগ্রহের পরিণামে দেশ দুর্বল হইতে বাধ্য। তোমরা যে প্রতাপ বৃদ্ধি করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছ—তাহার প্রধান বাহক অর্থ। প্রজার বিচিত্র কল্যাণের জন্য যে অর্থ বহুপরিমাণে নিযুক্ত হওয়া বিধেয়, তাহার অযথা অপব্যয়ের পক্ষপাতী আমি হইতে পারি না। হিংস্রবৃত্তি দ্বারা হিংসাকে রোধ করা যায় কি-না—তাহা সবিশেষ চিন্তার বিষয়। এই প্রণালীতে জয় হইলেও দুঃখ-কষ্টের গ্লানি হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়াও পিতা ও পিতৃব্য এই রাজ্য অরক্ষিত রাখিয়া যান নাই, আর ফিরোজ শাহ্ দেশের অবস্থা বুঝিয়া এই সময়ে অবিবেচকের ন্যায় ভুরসুট রাজ্যের সহিত শত্রুতা করিবেন, এরূপ বোধ হয় না।"

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন: "আপনি যে নীতি অনুসরণ করিতে নির্দেশ দিতেছেন, তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে কতদূর কার্যোপযোগী হইবে—বলা কঠিন। গৌড়-সিংহাসন ঘিরিয়া পুনরায় দুর্দান্ত

হাবশী-চক্রান্ত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার ধারণা, বিপর্যয় ঘটিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এ-স্থলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে শান্তিমন্ত্র জপ করিলেই যে আসন্ন বিপদ্ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইবে—এরূপ আত্মনির্ভরতা আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর, ইহা ক্লৈব্যের লক্ষণ। হিংস্র শার্দূল কখনও ন্যায় বা শিষ্ট আচরণে তাহার প্রকৃতিগত হিংসার প্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। সেইজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্ত যাহা অবশ্য করণীয়—তাহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটিবে। এ-বিপদ্ সমস্ত গৌড় রাঢ়-বঙ্গের। এই ভুরসুট-রাজ্যের অবস্থান ও শস্য-সম্পদ্ আশ্রয় করিয়া যুদ্ধকালে যে কোন প্রবল শক্তিকে বহুদিন প্রতিহত করা যাইতে পারে। অতএব, আমরা রাজ্যের অরক্ষিত প্রত্যন্ত-ভাগে শত্রুর বাধা-স্বরূপ গড় প্রস্তুত করিতে যদি আলস্য করি, তাহা হইলে অত্যাচারীর আঘাত নিবারণ করিতে পারিব না।”

রাজা দেবনারায়ণ মহেন্দ্রের সারগর্ভ পরামর্শ একেবারেই তুচ্ছ করিতে পারিলেন না, তিনি অনেক বিবেচনার পর বলিলেন: “মহেন্দ্র, তুমি আহিতলক্ষণ ক্ষেত্রজ্ঞ, দেশ ও প্রজার যাহাতে মঙ্গল হয়—তাহাই কর। দর্পনারায়ণও রাজ্য-চালনায় উপযুক্ত হইয়াছে। উহার উপর প্রধান রাজ্য-কেন্দ্রের ভার দিয়া অবসর গ্রহণ করিতে আমার তিলমাত্র দ্বিমত নাই। কুমার মুকুটরামও বিশেষ কৃতীপুরুষ ও বিচক্ষণ, পিতা কৃষ্ণনারায়ণের ইচ্ছাক্রমে মুকুটরাম রাজ্যের অটবী-প্রদেশ দিকশালপুরকে উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ঐ স্থানে গড় নির্মাণ করিলে শত্রুর একটি প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ হইবে। আর আমার ইচ্ছা—কুমার বসন্ত

সাহসী ও রণদীক্ষিত, তাহাকে একটি আভ্যন্তর অঞ্চলের ভার ন্যস্ত করা হউক্। অন্য দুই কুমার বিদ্যা-বুদ্ধিতে নিপুণ ও ধর্মপ্রাণ, তাহারা উভয়ে প্রজার শিক্ষা স্বাস্থ্য ধর্ম ও অন্যান্য উৎকর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করুক্। তোমরা সকলে সম্মিলিত চেষ্টায় পিতৃরাজ্যকে সমুন্নত করিয়া তোল, এই আমার একান্ত কামনা। আমি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি শান্তিতে ও ধর্মকর্মে তীর্থবাসে অতিবাহিত করিতে সংকল্প করিয়াছি।"

দেবনারায়ণ কাহারও অনুরোধ শুনিলেন না, তাঁহার সংকল্প-মত তিনি কার্য করিলেন। দর্পনারায়ণ গড় ভবানীপুরের রাজা-সনে অধিষ্ঠিত হইলেন। মুকুটরাম বহুতর বৃক্ষকাণ্ডকে স্তম্ভ-স্বরূপ কাজে লাগাইয়া সুবৃহৎ সুদৃঢ় দ্বিভুজ মৃত্তিকা-দুর্গ উত্তোলন করিলেন, ইহাই 'দোগাছিয়া গড়' নামে খ্যাত হয়। যে-অঞ্চলটি কুমার বসন্তের পরিচালনাধীন ছিল, তাহা 'বসন্তপুর' নামে আজিও অভিহিত।

এদিকে মহেন্দ্র ও দর্পনারায়ণ ত্বরিতগতিতে রাজ্যসীমা যতদূর সম্ভবপর গড় ও পরিখায় বেষ্টিত করিয়া শত্রুর পক্ষে দুর্গম করিয়া তুলিলেন।—অল্পকালের মধ্যেই সংবাদ আসিল—সৈফ্-উদ্দীন ফিরোজ শাহ্ চক্রান্তের বলি হইয়াছেন, পাইকদের হস্তে তিনি নিহত, এবং ফতে শাহের বালক পুত্র দ্বিতীয় নাসির-উদ্দীন মহ্মুদ শাহ্ আখ্যায় গৌড়ের তখ্‌তে স্থাপিত হইলেও, নাবালক বলিয়া রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব প্রতিভূ-শাসক হাবশী হব্‌শ্ খাঁ গ্রহণ করিয়াছে।...মহেন্দ্রের অনুমান সত্য হইল, সেজন্য এই অপ্রিয় বার্তা শ্রবণে তিনি একেবারেই বিস্মিত হইলেন না।

এই ঘটনার পরে আবার কি ঘটে, তাহাই মহেন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হব্‌শ্‌ খাঁ রাজ্য-লোভে তলে তলে বালক-রাজার জীবন-নাশের অভিসন্ধি করিতেছিল, কিন্তু তাহার আশা অপূর্ণ রহিয়া গেল; সিদি বদ্‌র্‌ দিওয়ানা নামক আর-এক হাবশী ক্রীতদাসের ঈর্ষ্যা-শানিত অস্ত্র-মুখে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইল। তখন ক্রূরস্বভাব দিওয়ানা প্রতিনিধি-শাসক হইয়া সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার জন্য গুপ্ত কৌশল-জাল বিস্তার করিতে লাগিল। কিছুদিন পরেই তরলমতি প্রাসাদ-রক্ষীদের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এক রাত্রিযোগে বালক-রাজাকে নিধন পূর্ব্বক পরদিন প্রভাতে দিওয়ানা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল।

গৌড়-রাঢ়ে আবার বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। সিংহাসনারূঢ় সিদি বদ্‌র্‌ দিওয়ানা শমস্‌-উদ্দীন মজঃফর শাহ্‌ উপাধি পরিগ্রহ করিয়া নিজ হিংস্রমূর্ত্তি প্রকাশ করিল, বন্যজন্তুর ন্যায় নখদন্ত বিস্তার করিয়া তাহার শয়তানী শাসন-প্রণালীতে দেশবাসীকে ক্ষতবিক্ষত করিতে উদ্যত হইল। মহেন্দ্র যাহাই ভাবুন—এরূপ নির্ম্মম অত্যাচার-কাণ্ড প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি দেখিলেন—ধনীর ধন, গৃহস্থের নিরাপত্তা, নারীর সতীত্ব সমস্তই বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিবিধান না করিতে পারিলে গৌড়-রাঢ় ভীষণ অত্যাচারের লীলাস্থল হইয়া উঠিবে—এই দুশ্চিন্তায় তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন হিন্দু-রাজন্যগণকে একতা বদ্ধ হইতে প্রার্থনা জানাইলেন। সেই সম্মিলিত শক্তিতে হাবশী-রাজের নিপাত আনিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিলেন। তাঁহার

অতিরিক্ত পরিশ্রমে সংকল্পিত কার্য অবিচলিত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কিন্তু অল্প কয়েক দিন পরে মজঃফর-প্রেরিত দূতের সঙ্গে এক আফগান সৈনিক যোদ্ধৃবেশে আসিয়া মহেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল। দূত জানাইল যে, বর্তমান সুলতানের বিবেচনায় মহেন্দ্র রাজদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত। তিনি অবিলম্বে যদি সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে পূর্বের ব্যবস্থা অর্থাৎ তাঁহার সৈনাপত্য তিনি বাহাল রাখিতে প্রস্তুত, অবশ্য সেজন্য তাঁহাকে একটি সর্ত মানিয়া লইতে হইবে। মহেন্দ্র বুঝিলেন—ইহা ছলনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তথাপি সর্তটি তিনি জানিতে চাহিলেন। তখন দূতের ইঙ্গিতে আফগান-সৈনিক মহেন্দ্রের সম্মুখে একটি মুসলিম-বেশ ও তৎপার্শ্বে একটি শানিত কুঠারে আবদ্ধ পরোয়ানা রাখিল।...মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: "ইহার অর্থ কি?"

দূত কহিল: "গৌড়ের সুলতানের সংকল্প—ইসলাম-ধর্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অন্যজাতীয় কেহই রাজকার্যের সংস্রবে থাকিবার অধিকার পাইবে না, বিশেষতঃ সেনাপতির ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ পদের তো কথাই নাই। এ-স্থলে তাঁহার প্রস্তাব—আপনাকে ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় উপায়ান্তর—ঐ কুঠার ও পদচ্যুতির হুকুমনামা। এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে আপনার ইচ্ছামত একটি নির্বাচন করুন।"

নরহন্তা দুরাত্মা হাবশী মজঃফর শাহের হীনতম প্রস্তাবে মহেন্দ্র রুষ্ট হইলেন, কিন্তু নিজকে সংযত করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর

দিলেন : "আমি এই কুঠার আর এই পদচ্যুতি-পত্র গ্রহণ-যোগ্য মনে করি, এবং তোমাদের রাজ্যাপহারী শাহের নীচ প্রস্তাব আমি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেছি। তোমরা বিদায় হও। হাবশী সুলতানকে বলিয়ো—ভূরসুটরাজ তৎপ্রচলিত কোন অন্যায় সহ্য করিবেন না। এই কুঠার আমি বাছিয়া লইয়াছি, প্রয়োজন হইলে—এই অস্ত্রই তাঁহার বিরুদ্ধে উদ্যত হইবে।"

দূত ও আফগান-সৈন্য প্রস্থান করিল, অচিরেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্রকে গুপ্তহত্যা করিবার চেষ্টা চলিল, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। মহেন্দ্র বঙ্গবাসিগণের প্রতি অন্যায় অত্যাচারে হাবশী সুলতানের উপর পূর্ব হইতেই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাহার পীড়ন ও অন্যায্য আক্রমণ সমাতিরিক্ত হয় নাই বলিয়া, লোকহত্যা নিবারণের সদিচ্ছায়, কেবল আত্মরক্ষার জন্য উদ্যোগপর্বেই মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ রাজনীতি-বিগর্হিত বোধে এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। এক্ষণে তিনি স্বধর্ম-নাশ ও জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার বীর্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল, তাহাতে মজঃফরের গো, ব্রাহ্মণ ও হিন্দুনরনারিগণের উপর উৎপীড়ন ইন্ধন-স্বরূপ হইল। তিনি নরপিশাচ মজঃফরের বিনাশ-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

দর্পনারায়ণ

দর্পনারায়ণ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পিতৃদত্ত রাজ্যভার সবলহস্তে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার কর্মনীতি ছিল পিতার গৃহীত বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাজ্যের কোন আসন্ন বিপৎপাতে ধৈর্যধারণ-পূর্বক স্থিরবুদ্ধিতে সর্বদিক্ বিচার করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া যেমন দেবনারায়ণের চরিত্র ছিল, তেমনি দর্পনারায়ণ কোন বিষয়ে কালহরণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন অতি উগ্রপ্রকৃতির রাজন্য। তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের তুলনায় গরীয়ান্ কোন প্রতিপক্ষেরও অত্যাচার-অবিচার সহ্য করা তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। সেইজন্য তিনি যখন অবগত হইলেন যে—হাবশী মজঃফর শাহের প্রচণ্ড অন্যায় কুটিল বিষধরের ন্যায় ফণা তুলিয়া গৌড়জনগণকে দংশনে দংশনে সর্বনাশের মুখে আগাইয়া দিতেছে, তখন ইহার আশু প্রতিকার-মানসে তিনি অত্যন্ত অস্থির ও চিন্তাগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। গৌড়-ও রাঢ়-বাসিগণ আপনাদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া পড়িয়া পড়িয়া অসহায়ের মত মার খাইবে, তাহাদের প্রতিবাদের ক্ষীণ-কণ্ঠও আজ রুদ্ধ, তাহাদের ভীতি-বিহ্বল দৃষ্টির সমক্ষে নিষ্কৃতির সমস্ত পথ হারাইয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর কি দুর্বিপাক ঘটিতে পারে! এই অত্যাচারের বন্যা প্রতিরোধ করিতে না পারিলে, তাহার সর্বগ্রাসী ধ্বংস-লীলা হইতে গৌড়-রাঢ়ের কোন জনপদই রক্ষা পাইবে না। দর্পনারায়ণ আর চিন্তায় কালক্ষেপ

করিলেন না, মহেন্দ্র ও মুকুটরাম ব্যতীত আরও দুই-চারিজন অতিবিশ্বাসী মন্ত্রণাসচিবকে লইয়া একটি গোপন পরামর্শ-সভা আহ্বান করিলেন।

অবশেষে স্থির হইল এই যে, এখন প্রত্যক্ষসংগ্রামের উপযুক্ত সময় নহে, কারণ—বর্তমানে হাবশী সুলতানের শক্তিদর্প সৈন্য-বলের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জনশত্রু স্বৈরাচারীর যে আশ্রয় গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা যে-উপায়ে তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে, সেই উপায়ই এক্ষণে অবলম্বন করিতে হইবে। চাণক্যনীতি অনুসরণে তাহার সুকৌশল প্রয়োগ দ্বারা প্রজা-পীড়কের বিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারিলে কার্য-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে। প্রথমেই লোকের মনে লুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনা প্রয়োজন। এই কার্যের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে এক দল সুশিক্ষিত গুপ্তচর ও তৎসঙ্গে এক দুঃসাহসী যুদ্ধনিপুণ সেনাদল। তাহারা সকলে মক্ষীর ন্যায় সমগ্র গৌড়ে নানা ছদ্মবেশ ধরিয়া ছড়াইয়া পড়িবে। রাজধানীতে যাহারা থাকিবে—তাহাদের ফকিরের ছদ্মবেশ ধারণ করাই শ্রেয়ঃপন্থা। জন-জাগরণ ব্যতীত সেই বিবেকহীন উচ্ছৃঙ্খল নির্যাতকের উচ্ছেদ সহজসাধ্য হইবে না।

এই সিদ্ধান্ত যাহাতে কার্যে পরিণত হয়, রাজা দর্পনারায়ণ তাহার যোগ্য ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার নির্দেশ-মত তৎপ্রেরিত চর-ও সেনা-দল পৃথক পৃথক সংঘে বদ্ধ হইয়া নানা দিক্ হইতে বিভিন্ন সময়ে গৌড়-মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদের নিপুণ অভিনয় সন্দেহের কোন সূত্র রাখিল না। তাহারা স্থান-কাল পাত্র-বিবেচনায় উপযুক্ত বয়েত আওড়াইয়া মজঃফর শাহের

পক্ষীয়গণের মনস্তুষ্টি-সাধন করিতে সমর্থ হইল এবং প্রকাশ্যে সুলতানের গুণগানে রাজধানীর পথ মুখরিত করিয়া তুলিল, কিন্তু নিভৃতে সঙ্গোপনে গৌড়ের নির্যাতিত প্রজাবৃন্দের মনে সাহস সঞ্চার করিতে লাগিল, তাহারা একতাবদ্ধ হইয়া দুষ্ট হাবশী শাসকের সমূহ অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারের যথার্থ উত্তর দিতে বদ্ধ-পরিকর হউক্—এইরূপ প্ররোচনা-দানে ধনী-দরিদ্র সকল আর্ত প্রজাকেই চেতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিল। এইভাবে মন্থরগতিতে গণ-আন্দোলন-কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

পাপিষ্ঠ মজঃফর শাহের লোহ-কঠোর পাঞ্জা গৌড়ের উপর এমনি সবলে চাপিয়া বসিল যে, সকলে 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়া হাহারবে চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া তুলিল। এই দুর্বৃত্তের কদর্য রাজ্য-শাসন বাঙ্গালায় জঘন্য হাবশী-আধিপত্য-কালের চরম সীমায় উপনীত হইল। তাহার পাশব-প্রণালী রাজ্য-মধ্যে বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। মজঃফর তৎকৃত দুর্নীতির অভিযোগ বা হত্যাপরাধের সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে বর্তমান রাজকর্মচারিগণকে বনলতার ন্যায় নির্মূল করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার বাদশাহির বিরুদ্ধবাদিতার সংশয়ে গৌড়-রাজধানীর হিন্দু অভিজাতসম্প্রদায়, ধর্মপ্রাণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও বিদ্বজ্জনদিগকে নির্বিচারে ধ্বংস করিল, উপরন্তু অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হিন্দু রাজন্য ও নায়কগণও তাহার মারণাস্ত্র হইতে নিস্তার পাইলেন না। কিন্তু মজঃফরের প্রবল বিপক্ষ ভুরসুটরাজ দর্পনারায়ণ ও রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ বহু চেষ্টাতেও তাহার শাসন বহির্ভূত রহিয়া গেলেন।

এই সকল ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে, আসন্ন বিপর্যয়ের আভাস পাইয়া, গৌড়-রাজধানীর অধিকাংশ পলাতক হিন্দুসৈন্য মন্দারণে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা প্রচার করিয়া দিল—বিপৎকাল নিকটবর্তী। তখন মন্দারণবাসিগণ ভুরস্থটরাজের শরণাপন্ন হইল। হাবশী রাজ্যাপহারীর সহিত সংঘর্ষ বাধিবার সবিশেষ সম্ভাবনা থাকিলেও, দর্পনারায়ণ সেই অনুকূল যোগাযোগ প্রত্যক্ষ করিয়া মন্দারণ-দুর্গ অধিকারে আনিতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। মহেন্দ্রও মজঃফরের দুষ্কার্যের প্রতিহিংসা লইবার জন্য উন্মুখ হইয়া ছিলেন। দর্পনারায়ণ কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিলে পর, তিনি পরমোৎসাহে সম্মতি দান করিলেন। অতঃপর মহেন্দ্র সসৈন্যে মন্দারণে প্রবেশ করিবামাত্র সমবেত পুরবাসী-কর্তৃক অভ্যর্থিত হইলেন, হিন্দু-সৈন্যরাও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিল। কতিপয় মুসলমান-সৈন্য গণ্ডগোল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলে, মহেন্দ্র ক্ষিপ্রহস্তে তাহাদিগকে নিবারণ পূর্বক বন্দী করিলেন। তৎপরে মন্দারণ-দুর্গ মহেন্দ্র অল্পায়াসেই অধিকার করিয়া বসিলেন। গৌড়-রাজধানীতে এই সংবাদ পৌঁছিবার সমস্ত সম্ভাব্য পথ বন্ধ করা হইল।

তখন গৌড়-রাজধানীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। অতিরিক্ত অর্থ-লালসার বশে মজঃফর প্রজাসাধারণকে শোষণে পেষণে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যখন হিন্দু নরনারী হাবশী-রাজের ভীষণ অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ব্যাধ-বিতাড়িত মৃগযূথের ন্যায় প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল, তাহারা সেই বিধর্মী নরপিশাচ হাবশী ক্রীতদাসের উৎপীড়নে নিজেদের জাতি ধর্ম ধন মান

সম্ভ্রম কিছুই রক্ষা করিতে না পারিয়া অনাথ শিশুর ন্যায় নিতান্ত অশরণ হইয়া পড়িল, সেই সময়ে রাজা দর্পনারায়ণ স্বধর্মাবলম্বী হিন্দুদিগের করুণ আর্তনাদে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া, কি উপায়ে তিনি তাহাদিগকে সেই ভয়ঙ্কর অত্যাচারীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন—দিবারাত্র সেই চিন্তায় মগ্ন রহিলেন, এবং অগতির গতি, দুর্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, সর্বশক্তিমান্ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে অন্যায়-ধ্বংসী শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরম কারুণিক, দীনবৎসল, বিপত্তিনাশন মধুসূদনের অমোঘ মহিমা দেখা দিল। দর্পনারায়ণ ঐশীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্ত্বয়সমুত্থানে অত্যাচারী হাবশী ক্রীতদাসের নিধন আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এদিকে অতিলাভ-লোভী মজঃফর সৈন্যগণের বেতন হ্রাস করিবার ফলে—তাহাদের বিরুদ্ধবাদী করিয়া তুলিল। তাহার প্রজাপীড়ন এমনি দুর্বিষহ হইয়া উঠিল যে, জনগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সেই নিদারুণ অন্যায়ের প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল। ভুরসুটরাজের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য এতক্ষণে পূর্ণ হইতে চলিল। সকলে সম্মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। মহেন্দ্র ইত্যবসরে বিদ্রোহিগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। দর্পনারায়ণ দক্ষিণ-রাঢ়ের সমস্ত ভূভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। মজঃফর এতদিন তাহার বিচক্ষণ উজীর সৈয়দ হোসেনের কর্মকুশলতায় রাজ-তখ্‌তে টিকিয়া ছিল, কিন্তু তিনি হাবশী ক্রীতদাসের পতন অনিবার্য দেখিয়া—রাজদ্রোহিগণের সহিত গোপনে সংযোগ-স্থাপন করিলেন। নগরপ্রধানগণ রাজধানী হইতে প্রস্থান করিয়া

বিদ্রোহী সমর-শক্তির সঙ্গে মিলিত হইলেন। সুযোগ বুঝিয়া সৈয়দ হোসেন বিদ্রোহী-সেনাদের রাজধানীর মধ্যে পথপ্রদর্শক-রূপে পরিচালনার দায়িত্ব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিলেন। ইতোমধ্যে দুরাচারী হাবশী মজঃফর কয়েক সহস্র অর্থলোলুপ ভৃতক-সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বদ্ধ নগরদুর্গে আশ্রয় লইয়াছিল। বিদ্রোহী-সৈন্য আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। চারিমাস কাল পরে এই অবরোধের সমাপ্তি ঘটিল দুরাত্মা মজঃফরের শোচনীয় পতনে। চারমাস ধৈর্যের পরীক্ষা মহেন্দ্র-চালিত সৈন্যদলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। মহেন্দ্র অগ্রবর্তী হইয়া তাহাদিগকে দুর্গে প্রবেশ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। দুর্গ-মধ্যস্থ কয়েকজন অবহেলিত পাইক হাবশীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া এই সময়ে সহায় হইল, তাহারা গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করিল। রণদুর্মদ মহেন্দ্র সদলবলে দুর্গে প্রবেশ করিয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে রক্ষিগণকে আক্রমণ করিলেন, দুই দলে হানাহানি চলিতে লাগিল; ইত্যবসরে মহেন্দ্র ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহার প্রতিহিংসার লক্ষ্য হাবশীর উপর হঠাৎ গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাহাকে পদাঘাতে জর্জরিত করিয়া টানিয়া বাহির করিয়া আনিবার পূর্বেই সৈয়দ হোসেন সে-স্থলে উপস্থিত হইয়া তীক্ষ্ণ অসি-প্রহারে দুরাচারী মজঃফরের বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। মজঃফরের বিনাশে বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে অধিষ্ঠিত হাবশী-দুর্গ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটিল।—সকলের অনুমোদন লাভ করিয়া সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ অভিধায় গৌড়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। গৌড়-রাঢ়-বঙ্গে আবার

সুদিন ফিরিয়া আসিল। বাঙ্গালার সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প ও বিদ্যাবুদ্ধির পুনরায় স্ফুরণ ও সমধিক উন্নতি সাধিত হইল।

আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ্ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে মনোযোগী হইলেন। তিনি ভুরস্তুট-রাজ দর্পনারায়ণকে মন্দারণ প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন এবং তাঁহার রাজ্যভুক্ত দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের কিয়দংশও দাবি করিলেন। দর্পনারায়ণ মন্দারণের অধিকার ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু হোসেন শাহের অন্য দাবি মানিয়া লইতে স্বীকার করিলেন না। তখন হোসেন শাহ্ বলপ্রয়োগে তাঁহার প্রার্থিত জনপদ অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। সুতরাং তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া উপায়ান্তর নাই বুঝিয়া, রাজা দর্পনারায়ণ বহুসহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন; মুকুটরাম ও রাজা মহেন্দ্রের বীরপুত্র কুমার যোগেন্দ্রের উপর সৈন্য-পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল। ইঁহারা সমরকুশল দুঃসাহসিক সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডুয়া অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডুয়া অবরোধ করিলেন।

রাজা দর্পনারায়ণের রাজ্যসীমা অতিক্রম করিলেই পাণ্ডুয়া নগর। সেইজন্য হোসেন শাহের সেনানায়ক শত্রু-সৈন্যের আগমন পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই, এবং শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুতও হইতে পারেন নাই। মুকুটরামের নির্দেশে কুমার যোগেন্দ্রের সৈন্যগণ পাণ্ডুয়া বেষ্টন পূর্বক শিবির সন্নিবেশ করিল।

বাগদী, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নজাতির হিন্দুগণ পদাতিক সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত ছিল। ইহাদের সমর-কৌশল অতীব আশ্চর্য-জনক। ঢাল, তলোয়ার, টাঙ্গি, সড়কি, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ইহারা অতি দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত। ইহাদের তাণ্ডব সমর-নৃত্যে মেদিনী কম্পিত হইত, ইহাদের ভৈরব হুঙ্কারে গর্ভিণীর গর্ভপাত হইত। বঙ্গদেশীয় লাঠিয়াল-গণের লাঠি খেলিবার সময় তালে তালে ভয়ঙ্কর নৃত্য ও লোকভয়ঙ্কর 'কু'-ধ্বনি হৃৎকম্প উপস্থিত করিত। মাত্র একজন লাঠিয়াল এই 'কু'-ধ্বনি করিলে, মনে হইত, যেন শত শত লোক এক সময়ে ভয়ঙ্কর নাদ তুলিতেছে। এরূপ বিভীষণ সমর-হুঙ্কার পৃথিবীর অন্য যে-কোন জাতীয় বীরপুরুষের পক্ষে চমকপ্রদ ও কষ্টসাধ্য। বঙ্গবীরগণের ন্যায় তরবারি-চালনের অদ্ভুত কৌশল তৎকালে অন্য জাতির যোদ্ধাগণের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। তাহারা ঢালের দ্বারা নিজ দেহ সমাবৃত করিয়া মৃত্তিকার উপর পড়িয়া থাকিত, বোধ হইত—যেন একটি ঢাল মাত্র মাটিতে পড়িয়া আছে, কিন্তু শত্রু নিকটবর্তী হইলেই সলম্ফে তরবারি-হস্তে উত্থিত হইয়া শত্রুকে হঠাৎ আক্রমণে বধ করিত। তাহাদের প্রায় চারি-পাঁচ হস্ত পরিমিত গুলি-বাঁশের লাঠি লোহার পাতে বাধান থাকিত। এরূপ সুকৌশলে তাহারা লাঠি চালনা করিতে পারিত যে, তীর কিংবা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে উহা লাঠিতে লাগিয়া ভূপতিত হইত, কদাপি গাত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। বঙ্গবীরগণ দুই হাতে দুই লাঠি সবেগে ঘুরাইতে ঘুরাইতে শত্রুব্যূহ অবলীলাক্রমে ভেদ করিতে পারিত। তরবারি, তীর,

বর্শায় তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিত না। তাহারা লাঠিতে ভর দিয়া ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় ক্রোশ পথ অনায়াসে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইত।

অন্যান্য রণদক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও এইরূপ যোদ্ধা ও মল্ল সেই সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিল।...হোসেন শাহের সৈন্যদল আসিয়া আক্রমণ করিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এই যুদ্ধে দেশমধ্যে ভীষণ অশান্তির ছায়া পতিত হইল।

বঙ্গের তৎকালীন বহুবিদিত সাধক-পণ্ডিত ভট্টশিরোমণি দেশের এরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। ব্রাহ্মণরাজবংশের সেই আচার্যগুরু তাহার প্রতিকার-কল্পে রাজসেনাপতি মুকুটরাম ও সেনানায়ক যোগেন্দ্রের শিবিরে উপনীত হইলে, উভয়েই তাঁহাকে যথাবিধি সংবর্ধনা করিলেন। অতঃপর সেনানায়ক অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মহাত্মন্! যুদ্ধস্থলে ভবাদৃশ জনের আগমনের কারণ বলিয়া আমাদের উদ্বেগ দূর করুন। আপনি কি কোন মূঢ়ের দ্বারা অপমানিত হইয়াছেন কিংবা আপনার কোন অত্যহিত সংঘটিত হইয়াছে? শীঘ্র বলুন, আমি আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না।"

পণ্ডিত মতিভট্ট উত্তর করিলেন: "বৎস তোমরা গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া কেন বৃথা লোকক্ষয় করিতেছ? ইহাতে যে দেশের বিশেষ কিছু উপকার হইবে, তাহা নহে। বরং মুসলমানগণ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া থাকিবে এবং সুবিধা

পাইলেই ব্রাহ্মণ-রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে। আমার ইচ্ছা, তোমরা এই ভীষণ সমর হইতে নিবৃত্ত হও।"

ব্রাহ্মণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবীর যোগেন্দ্র বলিলেনঃ "আপনি মহাপণ্ডিত, জনহিতৈষী গুরু, বলুন দেখি, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুর স্বাধিকার রক্ষা করিতে হইলে এরূপ পরস্বাপহারীর সহিত যুদ্ধ অনিবার্য কি-না? অন্যায় সহ্য করা অধর্ম; এরূপ অন্যায় প্রাণ থাকিতে কিরূপে সহ্য করা যাইতে পারে?"

যোগেন্দ্রের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, "দেখ বৎস, আমাদের দেশ কপটাচারী লোকে পূর্ণ হইয়াছে; হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থে দেশ ভরিয়া গিয়াছে, অর্থই এখন এ-দেশের লোকের একমাত্র আরাধ্য বস্তু হইয়াছে, ধর্ম ও কর্তব্য-বুদ্ধি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তুমি মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশের কোন উপকারই করিতে সমর্থ হইবে না। ভাবিয়া দেখ না কেন, তোমার দেশে মুসলমান কিরূপে আসিল! হিন্দু-কুল-কলঙ্ক, মহাপাতকী, স্বদেশদ্রোহী, কাপুরুষ জয়চন্দ্র না সাহায্য করিলে কি মহম্মদ ঘোরী কোন কালে ভারত-জয়ে সমর্থ হইত? বিহারের রাজপুত্রকে কৌশলে স্থানান্তরিত না করিলে এবং বঙ্গাধিপ বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষ স্বার্থান্ধ মন্ত্রীকে বশীভূত করিতে না পারিলে কি বখ্‌তিয়ার খিলজি বঙ্গ-বিহার বিনা-যুদ্ধে অধিকার করিতে সমর্থ হইত? কখনই নহে। তবেই বুঝিতেছ না যে, আত্মদ্রোহী ভারত-বাসীর সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্যই হয়তো দৈবের এই কঠিন বিধান, তাই মুসলমান-রাজ্য

এখন ভারতে সুদৃঢ় হইতে চলিয়াছে। মুসলমানের অত্যাচারে বৃথা হিন্দুনামধারী ধর্মদ্বেষী, হিন্দু-আচার-বিদ্বেষী, জাতির কলঙ্ক যে-সমস্ত দেশবাসী আত্মকৃত অপরাধের জন্য যখন জর্জরিত হইয়া পড়িবে, যখন মুসলমান-রাজগণের সন্তোষ-বিধানের জন্য নিজেদের ধন, মান, প্রাণ—এমন-কি, পুত্র-পরিবার পর্যন্ত ডালি দিয়া আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইবে, তখন কুলাঙ্গারগণ বুঝিবে ইহার বিষময় ফল, তখন তাহাদের চৈতন্যোদয় হইবে। সত্যধর্মের শাসনে থাকিলে, মানুষ এত নীচ স্বার্থপর হইতে পারে না! অধুনা অধিকাংশ ভারতবাসী সত্যভ্রষ্ট, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ধর্মের শাসন মানে না। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি পশ্বাচারই এখন তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে! হিন্দুনামটি মাত্র রাখিয়া মুসলমানের আচার-ব্যবহার অনুকরণে এই শ্রেণীর লোক সর্বদা ব্যস্ত। মুসলমানগণের পার্থিব ঐশ্বর্য ও ভোগবিলাস দেখিয়া ভারতের অধিকাংশ নর-নারী অভিভূত! তাহারা বুঝিতে পারে না যে, দেহ ক্ষণবিধ্বংসী, ইন্দ্রিয়-সুখই তাহাদের জীবনের প্রধান সুখ হইয়া পড়িয়াছে। সংক্ষেপতঃ, তাহারা পাশবপ্রণালী অনুসরণে প্রমত্ত।

যে কার্যে জগতের মঙ্গল ও আনন্দ উৎপন্ন হয়, সেই কার্য সম্পাদনে যতই বিপদ্ ও দুঃখ থাকুক্ না কেন, তাহাতে অবিনশ্বর অতুল আনন্দ নিহিত আছে, তাহা সত্যদ্রষ্টা উন্নতচেতা ধার্মিক মহাত্মা ভিন্ন অন্য কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। হিন্দুগণ যখন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিল, তখন তাহাদের শৌর্যে-বীর্যে গৌরবে মেদিনী পূর্ণ হইয়াছিল। এখন তাহারা অধঃপতিত;

শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, পীড়া, অত্যাচার প্রভৃতি দ্বারা প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত না হইলে তাহাদের সংবিৎ ফিরিয়া আসিবে না। তাহারা এক্ষণে বিকারগ্রস্ত, কিছুতেই নিজ হিত বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা যুদ্ধ করিয়া দেশের শান্তির পরিবর্তে অশান্তি ও দুর্গতির বৃদ্ধি ভিন্ন আর কি করিতে পারো? রাজা গণেশ যখন বঙ্গ-সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হিন্দু-শক্তির পুনরভ্যুদয়-বিষয়ে তাঁহার কতই-না আশা হইয়াছিল, কিন্তু কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে? তাঁহার স্বীয় পুত্র মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুর মহাশত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তোমাকে তো পূর্বেই বলিয়াছি যে, অধিকাংশ ভারতবাসীই আত্মবিস্মৃত, এই মোহময় ভাব তাহাদের হৃদয় হইতে যতদিন না দূরীভূত হইবে, যতদিন না তাহারা নিজেদের প্রকৃত সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে, যতদিন না নিজের দেশকে আবার ভালবাসিতে শিখিবে, ততদিন এই জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। অতএব, বৎস! যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া দেশের লোক যাহাতে প্রকৃত ধর্মপথবর্তী ও সত্যাশ্রয়ী হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন কর।

গুরু মতিভট্টের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মুকুটরাম বলিলেন: "যুদ্ধে আমাদের প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু এতদূর অগ্রসর হইয়া এখন কি প্রকারে নিবৃত্ত হইব, অধিকন্তু গৌড়পতি আমাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার পদানত করিতে প্রস্তুত।"

আচার্য ভট্টশিরোমণি উত্তর করিলেন: "বৎস, চিন্তিত হইয়ো না। প্রকৃতপক্ষে, এই যুদ্ধ হোসেন শাহেরও ঈপ্সিত

নহে। আমি তাঁহার দবিরখাস মিত্র সনাতনের সহায়তায় তাঁহার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলে, তিনি ন্যায্য বিষয় বিবেচনা অবশ্যই করিবেন, এবং শান্তি-স্থাপনে নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবেন।"

মুকুটরাম ও যোগেন্দ্র ভট্টশিরোমণির পরামর্শ শিরোধার্য করিলেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় সত্বর সন্ধি স্থাপিত হইল। ভুরসুট-রাজ্যের কিছুই ক্ষতি হইল না।

এই সন্ধির পর হোসেন শাহ্ তাঁহার রাজ্য-শাসনের কেন্দ্র একডালায় (পাণ্ডুয়ার ২৩-মাইল দূরে উত্তর-পূর্বে দিনাজপুরে অবস্থিত) স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত ছিল মন্দারণ ও ২৪-পরগণা। সুতরাং ইহাই বিবেচিত হয় যে, ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজের সহিত আর একটিবার ভিন্ন হোসেন শাহের কোন বিরোধ বাধে নাই। বস্তুতঃ, রাজা দর্পনারায়ণ পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ হইতে তমলুক পর্যন্ত তাবৎভূভাগের স্বাধীন ভূপতি ছিলেন।

১৩

উদয়নারায়ণ

রাজা দর্পনারায়ণ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাজধর্ম-পালনে নীতি-চ্যুত বা নিস্তেজ হইয়া পড়েন নাই। আপনার উপর তাঁহার ছিল অটল বিশ্বাস, তাঁহার কার্যধারা ছিল নিয়মবদ্ধ। কোন কারণে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে তাঁহার মিত্র-পরিজন এমন-কি পুত্র বা কোন প্রিয়জনও ক্ষমা পাইত না। ইহা সত্য যে, তিনি ছিলেন দৃপ্ত, কিন্তু একদর্শী অবিবেচনার বশবর্তী হইয়া আপন প্রভুত্ব-ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করিতেন না।

একদা যুবরাজ উদয়নারায়ণ সেনানায়ক-পদাধিকার লাভে মুসলমান-সেনার বিপক্ষে সম্মুখসমরে যাইতে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু ভুরস্থুট-সেনাধিনায়ক তাঁহার সে অভিপ্রায় অনুমোদন না করিয়া রাজ্যের প্রত্যন্তভাগের একটি বিশেষ অংশের রক্ষার ভার তাঁহাকে ন্যস্ত করেন। ইহাতে তিনি দুর্জয় অভিমান-বশে পিতা দর্পনারায়ণের নিকট সেনাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপন পূর্বক অস্ত্র-ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। উদয়নারায়ণ ছিলেন কর্মে-গুণে পিতার সবিশেষ প্রিয়পাত্র, তদুপরি দর্পনারায়ণ জানিতেন—যুবরাজ রণ-নিপুণ ও সাহসী। তথাপি তিনি বিবেচনা করিয়' দেখিলেন—সেনাপতি উদয়নারায়ণের উপর যে-কার্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন—তাহা যুবরাজের ইচ্ছানুযায়ী না হইলেও দায়িত্বপূর্ণ। তখন দর্পনারায়ণ পুত্রকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন: "তুমি রাজ্যের মঙ্গল অপেক্ষা আপনার অহঙ্কারকেই

বড় করিয়া দেখিতেছ বলিয়া তোমার শুভবুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে। সুবিজ্ঞ সেনাপতির নির্দেশ এ-স্থলে যুক্তিযুক্তই হইয়াছে, ইহা দ্বারা তোমার যোগ্যতা বা অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠে না। যুদ্ধকালে সৈন্য-সংস্থান ও সৈন্য-চালনার কৌশল এবং দেশরক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক, ইহা কি তোমার বোধের অতীত? কোন সৈনিকের পক্ষে কর্তব্যে অনাস্থা মস্ত অপরাধ। তুমি অন্যায় করিয়াছ। তোমার এই ধৃষ্ট আচরণে আমি অসন্তুষ্ট। তুমি আত্মকলহের সৃষ্টি করিয়া নিজেদেরই সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছ, এমনি তোমার নির্বুদ্ধিতা! তুমি যদি স্বচ্ছচিত্তে স্বকার্যে ব্রতী না হও, তবে এ-রাজ্যের তুমি কেহ নও। আত্মোৎসর্গ যেখানে কাম্য, সে-ক্ষেত্রে এই আত্মঘাতী মনোবৃত্তি লইয়া তুমি দেশের কোন কল্যাণ আনিতে পারিবে না।"

উদয়নারায়ণ সত্যই অবিবেকী ছিলেন না, পৌরুষ-প্রদর্শন-চিকীর্ষা তাঁহাকে সাময়িক হতজ্ঞান করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার ভুলের জন্য বিপ্রলাপের সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি সাশ্রুনেত্রে নিজ অবুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া পিতৃ-সকাশে মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। দর্পনারায়ণও পুত্রের ন্যায়বুদ্ধির উদয়ে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সমাগত কর্তব্যের আহ্বানে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ রাজা দর্পনারায়ণ স্নেহ-মমতায় মোহগ্রস্ত হইয়া অন্যায়কে কোনদিন প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার সুশৃঙ্খল শাসনে ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্য সমুন্নত ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তিনি নিজকে

বিপন্ন করিয়াও জাতি-ধর্মের অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। মুসলমান রাজা হোসেন শাহ্ রাজ্য-বিস্তারকল্পে উড়িষ্যা ও কামরূপে অভিযান করেন, এই সময়ে তাঁহার সেনানী ও সৈন্যবৃন্দ হিন্দুগণকে নির্বিচার অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া তোলে। উক্ত অভিযানে হিন্দুজাতির প্রতি অমানুষিক নিপীড়ন লক্ষ্য করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ দর্পনারায়ণ মুসলমান রাজার উপর অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ও রুষ্ট হইয়া উঠেন। এই কারণে তিনি পূর্বকৃত সন্ধি-সূত্র ছিন্ন করিয়া হোসেন শাহের সমীপে দূত-হস্তে সদম্ভ উক্তি-পূর্ণ এক স্পর্ধা-ব্যঞ্জক প্রতিবাদ-পত্র প্রেরণ করেন। হোসেন শাহ্ ভুরসুটপতির অপমানকর ব্যবহারে ক্রোধান্বিত হইয়া কঠিন প্রত্যুত্তর স্বরূপ তাঁহার রাজ্যের বিপর্যয়-সাধনে কৃতসংকল্প হন। দর্পনারায়ণ গুপ্তচর-মুখে এই সংবাদ পাইবার পূর্ব হইতেই জলে-স্থলে রণ-নিপুণ সেনাবাহিনী, বিবিধ সমরাস্ত্র ও বহু রণপোত সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণকে এই সকল কর্ম-ভার ন্যস্ত করিয়া তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন। উদয়নারায়ণ অতি-দক্ষতার সহিত ত্বরিতগতিতে সমস্ত সমরায়োজন সম্পূর্ণ করিয়া শত্রুপক্ষ হইতে আক্রমণের অপেক্ষায় রহিলেন। শত্রুসেনা যথাকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ-জনপদ অবরোধ করিবার নিশ্চিত ধারণায় অভিযান করিল, কিন্তু পথিমধ্যে বহুতর বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগের কল্পিত হিসাব ছুটিয়া গেল।

শক্তিশালীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহার অন্যায়ের কঠোর প্রতিবাদ করিলে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তাহার আশু

সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া রাজা দর্পনারায়ণ সমীক্ষ্যকারীর ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সনির্বন্ধ আহ্বানে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের হিন্দু ভূস্বামিগণ আপনাদের অর্থ-সামর্থ্য দিয়া একটি একতাবদ্ধ দুর্দম্য দলবল-গঠনে সবিশেষ সহায় হইয়াছিলেন, নহিলে শক্তি-প্রমত্ত মুসলমান-রাজের দুর্নিবার সংঘাত অতিক্রম করিয়া নিজেদের সমুচ্ছেদ রোধ-করা সম্ভবপর হইয়া উঠিত না। উদয়নারায়ণের কর্মকুশলতা, দুর্জয় সাহস ও নিপুণা উপস্থিতবুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল বলিয়া দর্পনারায়ণ বিনা-দ্বিধায় তাঁহার হস্তে এই গুরুভার অর্পণ করিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণও পিতৃবিশ্বাসের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি শত্রু-আগমনের বিভিন্ন পথ দুর্গম করিয়া তুলিলেন—বহুদূর পর্যন্ত স্তূপীকৃত খরকণ্টকে, সুবৃহৎ বৃক্ষকাণ্ডে, বন্ধুর প্রস্তররাশিতে আকীর্ণ করিয়া। কোথাও তিনি খাল-বিলের জল কাটিয়া কর্দম-পিচ্ছিল বিস্তৃত-দুস্তর জলা তৈয়ারী করিয়া রাখিলেন। এইরূপ বহুতর পথের বাধা সৃষ্ট হইল। তদুপরি অন্ধিসন্ধি বুঝিয়া আকস্মিক ও অনিয়মিত আক্রমণের জন্য স্থানে স্থানে দুঃসাহসিক বন্য জাতিতে গঠিত কয়েকটি এক শত বা তদধিক সংখ্যাবদ্ধ সেনা-গুল্ম প্রচ্ছন্ন অবস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিল। এতদ্ব্যতীত দামোদর, রূপনারায়ণ ও রোণ-নদীতে সাধ্যমত নৌবলের সংস্থান ঘটিল, এবং রাজ্যের প্রান্ত-সীমায় যথারীতি সৈন্য-বিন্যাস করা হইল। সময় অল্প হইলেও উদয়নারায়ণ অতি ক্ষিপ্রগতিতে সম্মিলিত সাহায্যে প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন।

হোসেন শাহের সৈন্যবাহিনী নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ভুরস্থট-রাজ্যের কাছাকাছি আসিয়া লক্ষ্য করিল—তাহাদের অগ্রগমনের পথ বিঘ্নসংকুল হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি তাহারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু কিয়দ্দূর যাইবামাত্রই হঠাৎ আশ-পাশ হইতে শিলাবৃষ্টির মত ঝাঁকে ঝাঁকে পাবড়া, বর্শা, বল্লম, বড় বড় পাথর তাহাদের উপর বর্ষিত হইল। এই অসতর্ক প্রহারে কিছু মুসলমান-সৈন্য হতাহত হইল, কিন্তু আঘাতকারীদের মধ্যে পলায়ন-কালে মুসলমানদের অস্ত্রাঘাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রাণান্ত ঘটিলেও—অধিকাংশই দুর্গম জঙ্গলে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই প্রকার বহু বিপত্তি লঙ্ঘন করিতে করিতে কতিপয় সৈন্য হারাইয়া, এমন-কি কয়েক গাড়ী রসদ খোয়াইয়া, মুসলমান-সেনা নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। আর এক যোজন পথ কোনক্রমে অতিক্রম করিয়াই দামোদরের তীরবর্তী এক বনভূমির নিকট তাহারা তাঁবু ফেলিল। উদয়নারায়ণ শত্রুদলের অবস্থিতি-বার্তা অবগত হইলেন, কিন্তু নীরবে সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুসলমান-সৈন্যগণ রন্ধন-আহারাদি শেষ করিয়া শ্রান্তি-অপনোদনের জন্য অনুকূল ব্যবস্থা-করণে নিযুক্ত হয়। তখন গোধূলি-বেলা, ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তাঁবুতে তাঁবুতে মশাল জ্বলিল, বহির্দেশে সংগৃহীত শুষ্ক বৃক্ষশাখায় অগ্নি প্রজ্বালিত হইল, উপযুক্ত প্রহরী সজাগ রহিল, সেনানী ও সৈন্যগণ নিদ্রাভিভূত হইল। কেবল একজন সশস্ত্র দুঃসাহসী যোদ্ধা পরামর্শ-ক্রমে বিপক্ষ-দলের অবস্থান ও গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করিল। সেই মুসলমান-

যোধ ছদ্মবেশ ধরিয়া প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রে শত্রু-শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। কিন্তু অপর-পক্ষের দুইজন মহাবলী নায়ক মুসলমান-শিবিরের অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে অতি-সন্তর্পণে আসিতেছিলেন। তাঁহারা দূরব্যাপী দৃষ্টিতে শত্রুর এলাকা ছাড়িয়া এক ব্যক্তিকে তাঁহাদের দিকে অগ্রবর্তী হইতে দেখিয়া আত্মগোপন করিলেন। মুসলমান-চর দ্রুতপদে নায়কদ্বয়কে পার হইয়া চলিতে লাগিল। আর-কিছুদূর যাইবা-মাত্রই তাঁহারা শত্রুর গুপ্তচরকে ত্বরিত গতিতে গিয়া ধরিলেন। গুপ্তচর প্রথমে বলপ্রয়োগে তাঁহাদের কবল-মুক্ত হইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উভয়ের বজ্রমুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইল না। তখন সে প্রাণভয়ে বলিয়া উঠিল: "আমাকে হত্যা করিয়ো না, আমাকে তোমরা বন্দী করিয়া রাখো।—আমি গৌড়ের এক ধনী ওমরাহের পুত্র, আমার মুক্তি-মূল্যে তোমরা বহু অর্থ-লাভ করিতে পারিবে। সুলতানের চাপে পড়িয়া আমাকে এই যুদ্ধে যোগদান করিতে হইয়াছে, এবং সেনাপতি তোমাদের ব্যবস্থা লক্ষ্য করিতে আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছেন।— তোমরা যদি আমাকে রক্ষা করো, তাহা হইলে তোমাদের এমন এক সহজ পথ বলিয়া দিব —যাহা অনুসরণ করিলে তোমাদের উপকার হইবে।"

ভুরসুট-পক্ষের একজন ছিলেন কুমার গোবিন্দনারায়ণ ও অন্যজন অন্ত্যজ-বন্য-সেনাদলের সর্দার দুর্ধর্ষ যোদ্ধা চণ্ডগিরি। গোবিন্দনারায়ণ মুসলমান-গুপ্তচরের কথায় বলিলেন: "তোমাকে হত্যা করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে? যুদ্ধান্তে তোমাকে মুক্তি দিতে কোন বাধা থাকিবে না। কিন্তু এখন আমাদের

শীঘ্র জানাও—তোমাদের সেনাপতি কোথায় অবস্থান করিতেছেন, এবং সৈন্যগণ কি-ভাবে রাত্রি-যাপন করিতেছে. আর কি উপায়ে কোন্ দিকে আমাদের আক্রমণ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে ? আমরা এই কূটচক্র ভেদ করিতে চাই। সত্য বলো, মিথ্যা হইলে তোমার সমূহ বিপদ্।"

মুসলমান-গুপ্তচর কহিল : "কল্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই তোমাদের উপর তিন দিক্ দিয়া চাপিয়া পড়িবার পরামর্শ হইয়াছে—জানি। আর এই সময়ে সকলে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছে। সেনাপতির তাবু পড়িয়াছে পূর্বদিকে নদীর কিনারা হইতে অল্পদূরে। এবার তোমাদের কথা রাখো, আমাকে ছাড়িয়া দাও কিংবা যুদ্ধবন্দী করো।"...তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই কঠোরচিত্ত সর্দার চণ্ডগিরি শানিত খড়্গাঘাতে তাহাকে নিহত করিল। গোবিন্দনারায়ণ ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তাহার মনোভাব বুঝিয়া চণ্ডগিরি বলিল : "একে বিশ্বাসঘাতক, তায় শত্রু, এই পরিণাম হওয়াই উচিত। চলুন—আমরা যুবরাজকে এই সংবাদ দিই গে।"

উদয়নারায়ণ সেই সংবাদ পাইয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রবিহিত সমস্ত আয়োজন শেষ হইল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরে মুসলমান-শিবির হঠাৎ আক্রান্ত হইল। নিদ্রোত্থিত মুসলমান-সৈন্যগণ যথাসম্ভব সত্বর অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বিপক্ষদলকে প্রতিঘাত করিতে সচেষ্ট হইল। কিন্তু একদিকে নদী হইতে নৌসেনা, অন্যদিকে স্থলবাহিনী, দুই চাপে পড়িয়া মুসলমান-সেনা মারিতে লাগিল। রক্ষার আর উপায় নাই দেখিয়া

তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ পূর্বক সে-স্থান হইতে পলায়ন করিল। হোসেন শাহ্ এই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হইলেন। তিনি পুনর্বার পূর্বাপেক্ষা বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু এবারেও নৈসর্গিক সহায়তায় ভুরস্থট-রাজের বিশেষ ক্ষতি হইল না। সুলতানসেনা বহু প্রাণ বলি দিয়া পুনর্বার প্রস্থান করিল।—হোসেন শাহ্ আর বৃথা লোকক্ষয় করিতে প্রয়াসী হইলেন না, তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে অবস্থা বিচার করিয়া দেখিলেন যে, হিন্দুগণের সহিত মিথ্যা কলহে লিপ্ত হইলে দেশ-মধ্যে অশান্তির আগুন কোনদিন নির্বাপিত হইবে না, বরং বিশৃঙ্খলা জাগিয়া বাঙ্গালার রাজ্য-ভিত্তি টলিয়া উঠিবে, অতএব উহাদের সহিত মৈত্রী-সম্বন্ধ সুফল আনিবে। অতঃপর তিনি তদনুরূপ কার্য করিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠ-পতি ও হিন্দু ভূস্বামিগণের সহিত তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী সন্ধি স্থাপিত হইল এই শর্তে যে, তিনি হিন্দুদিগের প্রতি পরুষ ব্যবহার বা অবিচার করিবেন না—কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঘটিলে হিন্দুরাজন্যবর্গ মিত্রপক্ষ-রূপে তাঁহার সহায় হইয়া দাঁড়াইবেন। উভয়তঃ কোন প্রকার চিত্ত-বিক্ষোভ বা বিরোধের কারণ রহিল না। ইহার পর হইতে হোসেন শাহ্ আপনার ভ্রান্ত নীতি পরিবর্তন করিলেন, এবং তাঁহার সদাচার স্থিরবুদ্ধি অমায়িক স্বভাব ও দয়াদাক্ষিণ্য সর্বজনের হৃদয় হরণ করিল।

রাজা দর্পনারায়ণের আধনায়কতায় ও নির্দেশে এবং উদয়-নারায়ণের কার্য-কুশলতায় রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির সবিশেষ

সাম্য ও আন্তরিকতা স্থাপিত হওয়ার ফলে পূর্বোক্ত যে মঙ্গলজনক ঘটনার উদ্ভব হইল, তাহা ইতিহাস-বিশ্রুত হয় নাই বটে, কিন্তু এই লুপ্তস্মৃতি ঘটনাটির মূল্য সেদিনকার বঙ্গবাসী বহুল পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। হোসেন শাহ্ উত্তরকালে তাঁহার উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী, ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য হিন্দুপ্রজাগণ কর্তৃক 'নৃপতি-তিলক', 'জগৎভূষণ' উপাধিতে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

দর্পনারায়ণ সেই অদৃষ্টপূর্ব শুভ-অভ্যুদয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া এক মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। আদ্যাশক্তির সিংহবাহিনী (দুর্গা)-মূর্তি প্রতিষ্ঠা-সমারম্ভে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি জীবদ্দশায় মহাতৃপ্তিভরে দেখিয়া গেলেন—অধোগামী গ্লানিপূর্ণ হিন্দুধর্ম প্রেমঘন-মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গের অমৃতরস-স্পর্শে নবপ্রাণে উজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, শিক্ষার প্রসার ও কৃষি-শিল্পের গতি উৎকর্ষের পথে, এবং দেশময় শান্তির মন্ত্র প্রচারিত।...দর্পনারায়ণের পরে তাঁহার যোগ্যতম পুত্র উদয়নারায়ণ শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে নির্বিবাদে রাজত্ব করিতে থাকেন। উদয়নারায়ণের সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য-চালনার গুণে এই জনপদ সুখ-সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্যকে বাহিরের কোন সংঘর্ষ-জনিত উপদ্রব-অশান্তিতে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় নাই।

রাজা উদয়নারায়ণ পিতৃ-রাজ্য কেবল সুরক্ষিত ও সুশৃঙ্খল রাখিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি দেশকে নানাবিষয়ে সমুন্নত করিতে যত্নশীল হন। প্রজাশক্তিকে তিনি শক্তিশালী

করিয়া তুলিবার জন্য প্রভূত উদ্যম নিয়োজিত করেন। প্রজাগণ কর্মোৎসাহে কৃষিকার্যে, শিল্পোন্নয়নে, বিদ্যাচর্চায় যথাযোগ্য উৎকর্ষ-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

উদয়নারায়ণের পত্নী রাণী বিন্দুরতি ছিলেন একাধারে সখী ও সচিব-রূপে তাঁহার সর্ববিষয়ে সঙ্গিনী। তিনি ছিলেন সাগর-ডিহির বন্দ্যবংশখ্যাত বর্ষিষ্ঠ জমিদারের পরমরূপবতী কন্যা। রাণী বিন্দুরতি যেমন তেজস্বিনী ছিলেন, তেমনি পতিগতপ্রাণা ও ধর্মেকর্মে নিষ্ঠাবতী। তৎকালে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ যে অপূর্ব প্রেমধর্মের মন্দাকিনী-ধারা বহাইতেছিলেন, তাহার বন্যায় সারা বাঙ্গালাদেশ ভাসিয়া গেল। তাঁহার বরাভয়-কর হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করিল। এই শুভ পরিপূর্ণতায় রাজা উদয়নারায়ণ ও রাণী বিন্দুরতি ষোড়শ শতাব্দীতে বিপন্ন হিন্দুধর্মের পরিত্রাতা-প্রেমাবতার-সাক্ষাৎভগবান্-জ্ঞানে তাঁহার উদার ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেন। রাণী বিন্দুরতি গোপীনাথ ও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকার প্রতিমা স্থাপন করিলেন, এবং রাজা উদয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করিলেন চক্রধারী দামোদর-মূর্তি। ইহার পর উদয়নারায়ণ নব-পরিকল্পনায় একটি লোকালয় স্থাপন করেন। তাঁহারই নামানুসারে সেই গণ্ডগ্রাম ভুরসুট-পরগনায় উদয়নারায়ণপুর আখ্যা-লাভ করে। এখনও এই গ্রাম পূর্বনামে পরিচিত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

উদয়নারায়ণের রাজ্যকালে মুঘলশক্তি পূর্বভারতে প্রাধান্য-স্থাপনে তৎপর হয়। কিন্তু হোসেন শাহের পুত্র তদানীন্তন গৌড়ের সুলতান নাসির্-উদ্দীন্ নসরৎ শাহের রণনীতি ও

সর্বোপরি অসাধারণ কূটনৈতিক কর্ম-নৈপুণ্য গৌড়-বঙ্গে মুঘল বা বৃদ্ধিশীল আফগান-শক্তির হস্ত-প্রসারণ-চেষ্টা খর্ব করিয়া দিয়াছিল। স্থলতানের সহিত উদয়নারায়ণ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। স্থলতানের নির্দেশে সমগ্র মহাভারত শ্রীকর নন্দী কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল, এবং তৎপুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজের নির্বন্ধাতিশয়ে কবি শ্রীধর বিদ্যাস্থন্দরের ছন্দোবদ্ধ প্রেম-গাথা রচনা করেন। উদয়নারায়ণ হোসেন শাহ্ ও তদীয় বংশধরগণের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হন, এবং সংস্কৃত-পুথি গ্রহণে তন্ত্র- ও ধর্ম-বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থ বঙ্গভাষায় রচনা করিবার জন্য স্থানীয় পণ্ডিতগণকে উৎসাহন করেন। এই কার্যে তাঁহার বিদুষী ও বহুগুণশালিনী সাধ্বী পত্নী বিন্দুরতি অমূল্য সাহায্য দানে যত্নশীলা ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, উদয়নারায়ণের রাজত্ব বহুবিষয়ে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ও শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।—

১৪

জন-কল্যাণী বিন্দুরতি
ও
সত্যনারায়ণ

গৌড়-সিংহাসন লইয়া আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বংশধরগণের মধ্যে যখন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে, রাজ-তখ্ত্ যখন গিয়াস্-উদ্দীন মহ্মুদ (আবদুল বদর) কর্তৃক নিহত নসরতের অল্পবয়সী পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজের রক্তে আবার রাঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে, সেই অনিশ্চিত মুহূর্তে রাজা উদয়নারায়ণ হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই আকস্মিক বিপৎপাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহতা মহিষী বিন্দুরতি নেতৃবিহীন ভূরিশ্রেষ্ঠে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কারণ, তাঁহার ধারণা ছিল—পুত্র সত্যনারায়ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও রাজ্য-চালনায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠেন নাই। তিনি রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতি-ও বিদ্যা-চর্চায় অধিকাংশ সময় নিয়োগ করিতেন, এবং বিসংবাদের অপ্রশস্ত উপায় বা সংগ্রামের হিংস্রপন্থা সর্বান্তঃকরণে পরিবর্জন করাই তাঁহার প্রকৃতি ছিল। কিন্তু রাণী বিন্দুরতি বুঝিলেন—নিরুৎসাহ হইয়া অদৃষ্টবাদীর ন্যায় দিন-গণনা করিতে থাকিলে সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি পতি-শোকে মোহ্যমান না হইয়া অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য নিরূপণে ব্যাপৃত রহিলেন। বিন্দুরতি ছিলেন যেমন অতিরিক্ত বুদ্ধিশালিনী,

তেমনি কর্মকুশলা। শাসনিক ব্যাপারে তিনি তাঁহার স্বামীর সহযোগিনী ছিলেন, ছোট-বড় সঙ্কটে বা জটিল বিষয়ে তাঁহার সুবেবেচিত পরামর্শ রাজা উদয়নারায়ণের সাফল্যের হেতু-স্বরূপ ছিল। সেই বিচক্ষণ তেজীয়সী রমণী, রাজার মৃত্যু-সংবাদ রাজ্যের বাহিরে যাহাতে প্রচারিত না হয়, তাহার সবিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন।

রাণী বিন্দুরতি পুত্র সত্যনারায়ণকে পার্শ্বে রাখিয়া সুদৃঢ় হস্তে রাজ্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পৌরাণিক যুগের মহীয়সী রাজমহিষী মদালসা পুত্র অলর্ককে যেমন রাজনীতি-বিষয়ে শিক্ষা-দানে পৌরুষ-উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, রাণী বিন্দুরতি সেই নীতি-অনুসরণে পুত্র সত্যনারায়ণকে রাজনীতি সম্বন্ধে বহু উপদেশ প্রদান পূর্বক রাজকার্যের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হন। তিনিই পতির সানন্দ সম্মতি-ক্রমে বন্দ্যবংশীয়া এক লক্ষ্মীস্বরূপা কন্যাকে পুত্র সত্যনারায়ণের জীবনসঙ্গিনী-রূপে গৃহে বরণ করিয়া লইয়া আসেন।

উদয়নারায়ণের মৃত্যুর সংবাদ ক্রমশঃ রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন আশ-পাশের দুর্দান্ত সর্দারগণ মহিষীর নিকট নিজ নিজ প্রতিনিধি দ্বারা কপটদুঃখ প্রকাশ করিয়া পাঠাইল। রাণী বিন্দুরতি অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া এক আহূত সভায় তাহাদিগের সমক্ষে অসি-হস্তে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন রাজ-বেশে পুত্র সত্যনারায়ণ। তিনি সমবেত সর্বজনের সহিত গম্ভীর আচরণ করিলেন এবং সর্দারগণের উদ্দেশে নির্ভীকভাবে তাঁহার বক্তব্য শুনাইলেন: "তোমরা প্রভুশক্তির কাছে আসিয়া

আপনাদের উচিত-কার্যই করিয়াছ। রাজা সত্যনারায়ণ ভুরস্নুটের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিলে, তোমরা সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিবে। রাজা তোমাদের প্রত্যেককে পুরস্কার-স্বরূপ মর্যাদা অনুযায়ী অর্থ-দান করিতেছেন, তোমরা গ্রহণ করো। বিদ্রোহী হইয়ো না, দস্যু-বৃত্তিতে এই রাজ্য লুণ্ঠন করিয়ো না, পূর্ব্ববৎ বাধ্য থাকিবে। অন্যথায়—তোমাদের যুদ্ধে আহ্বান করিতে তিলমাত্র দ্বিধাবোধ করি না। এই অসি তাহার সাক্ষী।"

রাণী বিন্দুরতির ভয়শূন্য সত্য ব্যবহারে সর্দারগণ সসম্ভ্রমে তাঁহার সমস্ত কথা মানিয়া লইল, এবং কোন অন্যায় কার্যে লিপ্ত হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিল। সর্দারগণকে বশে আনিতে পারিয়া রাণী সন্তুষ্ট হইলেন। তদনন্তর তিনি জনগণের কল্যাণে কয়েকটি ধর্মালয় ও বিদ্যাপীঠ প্রবর্তন করেন।

কিয়ৎকাল পরে গৌড়ের সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন মহ্‌মুদ শাহ্‌ উদয়নারায়ণের মৃত্যুর সংবাদ অবগত হইলেন। সুলতান বঙ্গের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য আত্মসাৎ করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ সম্পূর্ণ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিতে চেষ্টান্বিত হন। সেই সময়ে গৌড়-বঙ্গ-সমন্বিত পূর্বভারতে প্রভুত্ব-স্থাপনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় মুঘল ও আফগানে ঘোরতর সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে। একদিকে দিল্লীর মুঘল-সম্রাট্ হুমায়ুন, অন্যদিকে আফগান-দলপতি শের খাঁ। সত্যনারায়ণ উপলব্ধি করিলেন যে—বহু বল্লভা বাঙ্গালার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগ ঘনায়মান, বর্তমান গৌড়-

সুলতান দুই প্রবল-শক্তির তুলনায় কাহারও সমকক্ষ নন, সে-ক্ষেত্রে দেশ-মধ্যে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া বলক্ষয় করা তাঁহার পক্ষে কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে।

অশক্ত সুলতান মহ্‌মুদ মুঘলের পক্ষ-সমর্থক হইলেও, প্রবল পরাক্রান্ত শের খাঁ যদি গৌড় অধিকার করিতে সমর্থ হন—এই সংশয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থান বিবেচনা করিয়া সে-স্থলে একটি আশ্রয়-কেন্দ্র স্থাপনে মনস্থ করিলেন। পূর্বভারতে প্রাধান্য লইয়া দুই পক্ষের যখন হারজিতের খেলা চলিতেছে, তখন দেশের অবস্থা-বোধে রাজা সত্যনারায়ণ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শান্তির পথ বাছিয়া লইয়া নিরপেক্ষ-ভাবে অবস্থান করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ার নিকটস্থ ভূভাগ পরিত্যাগ করিয়া সুলতান মহ্‌মুদের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইতে অভিলাষী—এই মর্মে বার্তা পাঠাইলেন। মহ্‌মুদ অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রুর সংঘাতে-আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেই আপৎকালে প্রকৃতি-রক্ষিত শস্যসম্পদে সমৃদ্ধ ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের মৈত্রী-সম্পর্ক তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

সত্যনারায়ণের সেই সময়োচিত কার্য-দ্বারা দেশের সম্পদ্ যেমন রক্ষিত হইল, ভূরিশ্রেষ্ঠ-জনপদ যুদ্ধে বিধ্বস্ত অশান্তির ক্ষেত্র হইয়া উঠিল না, উপরন্তু তাহা শ্যামল-রূপেই বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি যথাযোগ্য উপঢৌকন প্রেরণ পূর্বক মহ্‌মুদকে সন্তুষ্ট করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

সত্যনারায়ণ এই সন্ধির স্মৃতি-স্বরূপ পাণ্ডুয়ার নিকট রাজ্যের

সীমান্তবর্তী স্থানে একটি শ্বেত-পতাকা-শোভিত দুর্গপুরী উত্তোলন করিলেন, তাহা সত্যগড়পুর বা সাতগড়া নামে পরিচিত হইল। অনুমিত হয়, পরবর্তী কালে ইহা ক্ষুদ্র একটি পল্লী-পরিণতি হইতে একেবারে লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিংবা ইহার অন্য কোন নামান্তর ঘটিয়াছে।

সত্যনারায়ণ শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ রাজন্য ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের নবধর্মে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি জীবনে পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হন। শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন এবং অধিকাংশ সময় পূজা-অর্চনায় ও শ্রীভগবানের পুণ্য নাম-কীর্তনে অতিবাহিত করিতেন। তিনি বিঘ্নরাজ গণপতি-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১৫

শিবনারায়ণ
ও
রুদ্রনারায়ণের পূর্বকথা

সত্যনারায়ণের রাজ্য-শেষে তৎপুত্র শিবনারায়ণ যখন গড়ভবানীপুরের সিংহাসনে উন্নীত হন, তখন শের খাঁ সূর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন, এবং গৌড়-বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য অস্ত-দিগন্তে। সুলতান মহ্‌মুদের অযোগ্যতাই বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-নাশের প্রধান কারণ। রাজ্য-শাসনে ও পররাষ্ট্রনীতিতে মহ্‌মুদের ছিল সহজবিচারবুদ্ধিরও সম্পূর্ণ অভাব। তিনি এরূপ অদূরদর্শী ছিলেন যে, আফগান-সর্দারগণের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী—তাঁহারই সহিত বিরোধ সৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত হঠকারিতার পরিচয় দিয়াছেন, উপরন্তু আত্মম্ভরিতার বশে শের খাঁর ধ্বংস সাধনের জন্য মুঘল-পক্ষকে উপেক্ষা করিয়া আপন নির্বুদ্ধিতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বিপক্ষ প্রবলের সংঘাত হইতে গৌড়-বঙ্গ যদিও-বা মুক্ত থাকিত, তথাপি হীনবল ক্ষুদ্রচেতা অবিবেকী মহ্‌মুদের ভ্রান্ত ও দুর্বল নীতি বাঙ্গালার ভাগ্য-বিপর্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অপদার্থ সুলতানের কর্মদোষে গৌড়-বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য ও শান্তি নষ্ট হইল। প্রথম আফগান-বিজয়ের (১৫৩৮ খ্রীঃ অঃ) পরমুহূর্তেই শের খাঁ গৌড়-বঙ্গে মুদ্রাঙ্কন করিয়া নিজ-আধিপত্য সাব্যস্ত করিলেন।

ভুরসুটরাজ গৌড়ের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হইলেন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে গঙ্গা ও মহানন্দার সঙ্গম-স্থলে

অবস্থিত মহানগরী গৌড় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। দুর্গপ্রাকারাদি-সন্নিবেশে, সুরম্য অট্টালিকায় মসজিদে বুরুজ ও মিনারে এবং বহু জলাশয় ও সুদৃশ্য দীর্ঘিকায় এই রাজধানী অপূর্বশ্রীতে বিমণ্ডিত হইয়া দেশ-বিদেশের সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ষোড়শ শতাব্দীতে জলপথে ও স্থলপথে দলে দলে সমাগত আফগান, পর্তুগীজ, চীনা, আরবী ও হাবশী প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের সংমিশ্রণে গৌড় জনাকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে (১৫৩৭-৩৮ খ্রীঃ অঃ) এই রাজনগরী প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদলের যুদ্ধস্থলে পরিণত হইয়াছিল; কাতারে কাতারে আফগান-পর্তুগীজ-প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্ণ ও শ্বেতকায় যোদ্ধৃগণ নগরের পথে-প্রাচীরে নিয়ত খুনাখুনি করিয়া দারুণ হিংসার বীভৎসতা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতার চাপে পড়িয়া গৌড়বাসিগণের দুর্দশার অন্ত রহিল না। কিন্তু মুঘলসম্রাট্ হুমায়ুনের আগমন-সংবাদে শের খাঁ গৌড় ত্যাগ করিবার পূর্বে ইহাকে দগ্ধ রিক্ত শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়া গেলেন। হুমায়ুন গৌড়ে প্রবেশ করিয়া নির্জীব নগরে পুনরায় জীবন-সঞ্চার করিলেন। উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া হুমায়ুন সুখসেবিত গৌড়নগরে ভোগবিলাস-তৃপ্ত আরামে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই আরাম-নিশ্চেষ্ট সময়ের মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল। সেই অনভিজ্ঞ অপরিণত হুমায়ুনের শত্রুর শক্তি-সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার ফলে কূটচক্রী কঠোর কর্মকুশল শের খাঁ পুনর্বার তাঁহাকে অধিকার-চ্যুত করিতে সমর্থ হইলেন। বাঙ্গালা (১৫৩৯ খ্রীঃ অঃ) শের খাঁর

হস্তগত হইল, এবং কিছুকাল পরে হুমায়ুনের নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের সুযোগে তাঁহাকে পর্যুদস্ত করিয়া শের খাঁ দিল্লীর সম্রাট্ হইয়া বসিলেন। ইহার পর হইতে দিল্লীর সূর্-সুলতানগণের নির্দেশানুসারে গৌড়-বঙ্গ সূর-প্রতিনিধি কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। কিন্তু বাঙ্গালার সহিত এই রাজনৈতিক সম্পর্ক অটুট রহিল শের শাহ্ ও তৎপুত্র ইসলাম শাহ্ সূরের রাজ্যকাল পর্যন্ত (১৫৫৩ খ্রীঃ অঃ)। তদনন্তর সূর-প্রতিভূগণ নিজদিগকে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। তৎপরে তিন বৎসরের মধ্যেই ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটিল, পাদিশাহ্ হুমায়ুন আফগানসুলতান সিকন্দর সূরের অধিকার হইতে পঞ্জাব ও দিল্লী মুক্ত করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর (১৫৫৬ খ্রীঃ অঃ) তিন সপ্তাহ পরে তদীয় পুত্র আকবর দিল্লীর সম্রাট্ হইলেন। এই ঘটনার ফলে শেষ পর্যন্ত বাঙ্গালার ভাগ্য-চক্র আবর্তিত হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে কররাণি-খ্যাত এক দুর্দান্ত (আফগান) পাঠান-শাখা মালগুজারি ও রাজভাগ আত্মসাৎ করিয়া লুণ্ঠন-বৃত্তি দ্বারা ও সুলতানের একশত হস্তী অপহরণ করিয়া প্রবল হইয়া উঠিল, এবং শোণিত-সিক্ত বাঙ্গালার শাসন-দণ্ড ইহাদের হস্তান্তরিত হইল (১৫৬৪ খ্রীঃ অঃ)। তাজ খাঁ কররাণি গৌড়ের দক্ষিণ দিগ্‌বর্তী তান্দায় রাজধানী স্থাপন করিয়া গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন মাত্র এক বৎসর কাল ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তৎপরেই তাঁহার ভ্রাতা ও উপনায়ক সুলেমান কররাণি শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন।...

ভুরস্থট-রাজ শিবনারায়ণ ইতঃপূর্বে, শের শাহের অধিকার-কালে, পাঠান-পক্ষ অবলম্বন পূর্বক দিল্লী-স্থলতানের প্রীতি-উৎপাদন করেন। প্রায়শঃ বস্তু-উপহার-দানে তিনি সূর-স্থলতান ও প্রতিভূ-শাসককে সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, তৎপ্রদত্ত উপহার করস্বরূপই গৃহীত হইত বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ সম্পর্ক-স্থাপন দ্বারা ভুরস্থট-রাজ্যের আভ্যন্তর শাসনে তাঁহার স্বাধীনতা পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভুরস্থটের শাসন-কার্যে ও রাজনীতিক ব্যাপারে রাজা শিবনারায়ণের বীর্যবান্ তীক্ষ্ণধী পুত্র রুদ্রনারায়ণ তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন। সর্ববিষয়ে তিনি পুত্রের উপর নির্ভর করিতেন, এবং তাঁহার বিষয়-বিভব-বিরাগী মন তীর্থবাস-জনিত স্থখ-ভোগে সর্বদাই উন্মুখ থাকিত। তিনি অধিকাংশ সময়ই তীর্থ-ভ্রমণে কাল কাটাইতেন।

রাজা শিবনারায়ণ কয়েকটি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি সমৃদ্ধ গ্রাম সংস্থাপন করিয়া শিবপুর আখ্যা দেন। আজিও এই গ্রাম ভুরস্থট পরগনায় তাঁহার স্মারক-রূপে বর্তমান রহিয়াছে।—তাঁহার রাজত্বকালে তৎসম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, এবং তাঁহার বা তাঁহার পিতৃদেবের সম্বন্ধে লোকপরম্পরাগত কোনও গ্রহণযোগ্য কাহিনী শ্রুতিগোচর হয় নাই।···

শিবনারায়ণের স্বল্পকাল রাজ্য-ভোগের অন্তে রুদ্রনারায়ণ ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন।

রুদ্রনারায়ণ যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, অসি-যুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ বীর সে-সময়ে বিরল ছিল। তিনি নবীন বয়সেই রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া রাজনীতিতে সমধিক অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। গৌড়-বঙ্গে তথা পূর্বভারতে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান-পতনের দৃশ্য তাঁহার নয়ন-সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি লক্ষ্য করিলেন—বাঙ্গালায় পাঠানশক্তি প্রবল, তৎপরে কররাণি-রাজত্বের সূত্রপাত এবং ক্রম-বৃদ্ধি। রাজ্য-লাভ করিবার পর, তিনি হিন্দুশক্তি দৃঢ়ীকরণ-মানসে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য-স্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন। বিশেষতঃ, উড়িষ্যাধিপতি হরিচন্দন মুকুন্দদেব (তেলিঙ্গা মুকুন্দদেব) ও রুদ্রনারায়ণের সংকল্প-ব্রতের সম্পূর্ণ মিলন ঘটিল। উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গ যোগ সাধিত হইল। সেই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন মুঘলসম্রাট্ আকবর।

এদিকে বাঙ্গালায় সুলেমান কররাণি সুবিস্তৃত ভূভাগে রাজ্য-বিস্তার করিবার আশায় প্রভূত ক্ষমতা-সঞ্চয়ে যত্নবান্ ছিলেন। (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) মুকুন্দদেব আকবর-প্রেরিত রাষ্ট্রদূতকে সংবর্ধিত করিয়া সম্রাটের ঈপ্সিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, উপরন্তু মুঘলবাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, সুলেমান কররাণি দিল্লী-রাজকের বিরুদ্ধবাদী হইলে তিনি গৌড়-বঙ্গে অভিযান পরিচালনা করিবেন। বস্তুতঃ, তিনি কিছুকাল পরেই গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ভাগীরথীতীর-স্থিত

(হুগলীর সন্নিকট) সপ্তগ্রাম নিজ-অধিকারে আনিতে সমর্থ হন। এই কার্যে রুদ্রনারায়ণ তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র-ব্যাপারে সুলেমান অবুদ্ধির পরিচয় দেন নাই। তিনি সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া আকবরের সমীপে বহুমূল্য উপঢৌকন-প্রেরণে তাঁহার বন্ধুত্ব-প্রীতি-লাভের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। তিনি আকবরের প্রধান্য মান্য করিয়া বাদশাহের নামে খোৎবা পাঠ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনাকে রাজ-গর্বে 'অলা হজরত্' বলিয়া অভিহিত করিতেও ছাড়িতেন না।

রুদ্রনারায়ণও ধীরে ধীরে রাজনীতিক কৌশলে ভূরিশ্রেষ্ঠ-জনপদের আয়তন-বর্ধনে কৃতসংকল্প হইলেন। অতি-সাবধানে তিনি গৃহীত কর্মে অত্ম-নিয়োগ করিলেন. বহু বনদেশ ও পরিত্যক্ত অব্যবহার্য ভূমি পরিষ্কার করাইয়া লোকবসতির যোগ্য করিয়া তুলিলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সবিশেষ চেষ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সমগ্র ভূভাগে তিনি অধিকার সাব্যস্ত করিলেন। বর্দ্ধমানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ, বর্তমান হুগলী-হাওড়ার সমগ্রভাগ এবং উড়িষ্যার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ-পূর্বাংশ লইয়া নবরূপে অখণ্ড ভূরিশ্রেষ্ঠপুর গঠিত হইল। পেঁড়ো ও দোগাছিয়া গড় দুইটির পৃথক্ অস্তিত্ব রহিল না। এতৎপরে উড়িষ্যার সহিত অবাধ সংযোগ-রক্ষার নিমিত্ত রুদ্রনারায়ণ মুকুন্দদেবের সহায়তায় গড়মন্দারণ হিন্দু-রাজের আয়ত্তে আনিতে কৃতকার্য হইলেন। মুকুন্দদেব-নির্দিষ্ট এক মহানায়ক সামন্তের উপর গড়মন্দারণের শাসন-ভার অর্পিত হইল। হিন্দু-শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল, মুসলমান-

শক্তির নিকট তাহা আর সভয়ে মস্তক অবনত করিয়া রহিল না, বরং স্বাতন্ত্র্য-গৌরবে উন্নতশিরে বিরাজ করিতে লাগিল।

রুদ্রনারায়ণের শাসন-কালের পূর্ণ বিবরণ পরবর্তী মুখ্য প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। মূলতঃ, রাজা রুদ্রনারায়ণ-সংস্পৃষ্ট ইতিবৃত্তকথা এবং তাঁহার ভার্যা নারীকুলশিরোমণি রায়বাঘিনী খ্যাতা মহীয়সী রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্ব-কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধান অঙ্গ। তাহাই পরপর্বাধ্যায়ে বর্ণিত।

রায়বাঘিনী

পরাপর্ব

বঙ্গবীরাঙ্গনা

ইতিবৃত্ত

রাজা রুদ্রনারায়ণ
ও
কালাপাহাড়

রাজীবলোচন-বৃত্তান্ত

সমর-কাণ্ড

রাজা রুদ্রনারায়ণের শাসনকালে উড়িষ্যায় মহাপরাক্রান্ত নরপতি মুকুন্দদেব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন। মুকুন্দদেব বঙ্গে মুসলমান-রাজা উচ্ছেদ-মানসে আয়োজন করিতেছিলেন; ইহা জানিতে পারিয়া রুদ্রনারায়ণও তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। মুকুন্দদেবও অত্যন্ত বলদৃপ্ত হইয়া বঙ্গে মুসলমানাধিকার আক্রমণ করিলেন। পেঁড়ুয়াগড়ের রাজা অমরেন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচন এই সম্মিলিত সেনার সেনাপতিত্ব-পদে অভিষিক্ত হইলেন।

রাজীবলোচন* বাল্যকাল হইতেই অমিতসাহসী ও অদ্বিতীয় বলবান্ ছিলেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তিনি অশ্বারোহণে, অসি-চালনায় ও ব্যায়ামে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার তালপ্রাংশু

* কিংবদন্তী আছে, এই রাজীবলোচন রায় পরে কালাপাহাড় নামে হিন্দুসমাজে মহা আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন।

দেহ, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত সুবলিত ভুজযুগ, জ্যোতিষ্মান্ চক্ষুর্দ্বয়, বলিষ্ঠ সুদীর্ঘ পদযুগল এবং ক্ষীণ কটিতট নয়নগোচর করিলে শত্রুগণের হৃদয় সভয়ে কম্পান্বিত হইত। একদা একটি হস্তী শৃঙ্খল-মুক্ত হইয়া দুর্দমনীয় হইয়া উঠিলে, মহাবলশালী ভীমাবতার রাজীবলোচন হস্তিশুণ্ড দুই হস্তে ধারণ করিয়া এরূপ শক্তির সহিত আকর্ষণ করেন যে, মহাকায় বারণ সেই আকর্ষণ-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।

এই মহাশক্তিধর রাজীবলোচনের বাহুবলে ও সমর-কৌশলে মুকুন্দদেব (হুগলীর নিকটবর্তী) ত্রিবেণী নামক স্থানে মুসলমান-গণকে পরাস্ত করিয়া তথায় হিন্দুবিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুকুন্দদেব ত্রিবেণীতে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং গঙ্গাতীরে গজগিরি-সংলগ্ন একটি ঘাট নির্মাণ করেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুরাজ্যের পুনরভ্যুত্থান দেখিয়া বঙ্গবাসিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু এ সুখ হতভাগ্য বঙ্গবাসীর দগ্ধাদৃষ্টে অধিক কাল স্থায়ী হইল না। ভগবান্ কি অপরাধে ভারতকে এরূপে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেছেন, তাহা তিনিই বুঝিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, কেমন করিয়া বিশ্বরাজরাজেশ্বরের বিশ্বরাজ্য-নীতি হৃদয়ঙ্গম করিব?

(১৫৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) সুলেমান কররাণি নামক একজন মুসলমান দলপতি গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। উত্তরবঙ্গের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে, হিন্দুগণের উত্তরোত্তর যেরূপ বলবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে। কিন্তু বঙ্গাধিপ সুলেমান কেবল

নিজ সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়া মহা-পরাক্রান্ত রুদ্রনারায়ণ ও মুকুন্দদেবের সম্মিলিত, অসংখ্য বীর্যবান্, সাহসী ও রণকুশল সৈন্যগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা সমীচীন বিবেচনা করিলেন না। সুতরাং তিনি বাদ্‌শাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বাদ্‌শাহ হিন্দু-রাজগণের শক্তি খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে সুলেমানের সাহায্যার্থে কয়েক সহস্র যুদ্ধ-বন্দী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অতঃপর সুলেমান ভীমপরাক্রমে সম্মিলিত হিন্দুসৈন্যকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়লক্ষ্মী কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, তাহা স্থির করা এক-প্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িল।

অবশেষে মুসলমান-সৈন্যগণের ভীমবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া হিন্দুসৈন্যগণ পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলে, কুমারসদৃশ বীর্যশালী মহাবীর রাজীবলোচন বেগবান্ তুরঙ্গমোপরি আরোহণ করিয়া নিষ্কোষিত অসি-হস্তে শত্রুব্যূহ-ভেদ করতঃ অগণিত মুসলমান-সৈন্য ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভীষণ হুঙ্কারে ও রণোন্মত্ততায় মুসলমান-সৈন্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িল। সেনাপতি অদম্য উৎসাহে ও নির্ভীকতার সহিত শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করিতেছে দেখিয়া হিন্দুসৈন্যগণের নির্বাপিত-প্রায় বীর্যবহ্নি পুনর্বার দ্বিগুণ তেজে জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা মহা-বিক্রমে মুসলমান-সৈন্য পুনরাক্রমণ করিল। এইবার মুসলমান-গণ প্রমাদ গণিল। বহুসংখ্যক হতাহত হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যে রণস্থল পূর্ণ হইল। রাজীবলোচনের অদ্ভুত যুদ্ধকৌশলে

মুসলমানসৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিল। বিজয়লক্ষ্মী রাজীবলোচনের অঙ্কশায়িনী হইলেন। হিন্দু-সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া, পলায়নপর মুসলমান-সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে বহু বিপক্ষ বীর বধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র অরাতি-রুধিরে প্লাবিত করিল।

মুকুন্দদেবের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া সুলেমান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং কিরূপে বঙ্গদেশে পাঠান রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তদ্বিষয়ে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। সুলেমান স্থির বুঝিয়াছিলেন যে, রাজীবলোচন সম্মিলিত হিন্দু-সৈন্যের সেনাপতি থাকিতে, তাঁহার বিজয়লাভের আশা একপ্রকার দুরাশা মাত্র। কিন্তু কি উপায়ে সুলেমান তাঁহাকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। কারণ, রাজীবলোচন উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের বেতনভুক্ সেনাপতি নহেন। তিনি রাজা রুদ্রনারায়ণ রায়ের বংশোদ্ভব এবং যুদ্ধকার্যে তাঁহার প্রধান সহায়। রাজা রুদ্রনারায়ণও মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস করিবার উদ্দেশে মুকুন্দদেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ।

অতএব রাজনীতিকুশল সুলেমান সাময়িক পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। সন্ধির পর সুলেমান রুদ্রনারায়ণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া বহুমূল্য রত্নাদি উপহার প্রেরণ করিলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণও বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ একশত হস্তী ও মূল্যবান্ উপহার-সহ রাজীবলোচনকে গৌড়-রাজধানীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বঙ্গাধিপ সুলেমান সাদর-সম্ভাষণ করিয়া মহাবীর রাজীবলোচনকে গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় প্রাসাদের নিকটবর্তী এক সুরম্য হর্ম্যে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। সুলেমান রাজীবলোচনের সেবা-শুশ্রূষার জন্য বহু দাস-দাসী এবং মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দরী নর্তকীবৃন্দ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। চতুর সুলতান এই প্রকারে রাজীবলোচনের অত্যন্ত সমাদর ও সম্মান করিতে লাগিলেন এবং কমলনেত্রা, নৃত্যগীত-পরায়ণা, নবযৌবনসম্পন্না, সুন্দরী রমণীগণকে তাঁহার সহচরী করিয়া দিলেন। যুবক রাজীবলোচন এই সমস্ত আদর-আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া পরম সুখে গৌড়ে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসামান্য বল-বিক্রমের কথা গৌড়নগরে অচিরাৎ প্রচার হইয়া পড়িল। তিনি যখন অশ্বারোহণ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার সেই বীরত্বব্যঞ্জক সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুন্দর কলেবর দর্শন করিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ রাজপথে দণ্ডায়মান হইত এবং কুলমহিলাগণ গবাক্ষ-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার সেই নারী-জন-মন-মোহকর অপূর্ব রূপ নিরীক্ষণ করিত।

একদিন রাজীবলোচন যোদ্ধৃবেশে রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, এক ভয়ানক নর-শোণিত-লোলুপ শার্দূল পিঞ্জর ভঙ্গ করিয়া সুলতানের পশুশালা হইতে বহির্গত হইয়া, রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে···ব্যাঘ্র-ভয়ে নগর-বাসিগণ চীৎকার করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে··· ব্যাঘ্রকে পুনঃ পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জন্য শহর-কোতোয়াল সশস্ত্র

অনুচরগণসহ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে…কিন্তু ব্যাঘ্র এই সমস্ত কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া পথিমধ্যে বসিয়া লাঙ্গুল আছড়াইতেছে এবং ভয়ঙ্কর গর্জন করিতেছে…কেহই ব্যাঘ্রের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইতেছে না।

এইরূপে কিছু সময় অতীত হইলে, ব্যাঘ্র পুরোবর্তী কোতোয়ালকে লক্ষ্য করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। উপস্থিত জনমণ্ডলী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিল। প্রাসাদোপরি রমণীগণ 'ভগবান্ রক্ষা কর' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিল, লোকসকল প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

রাজীবলোচন দেখিলেন—এই সময়ে ব্যাঘ্রকে নিরস্ত করিতে না পারিলে, নিশ্চয়ই সে কোতোয়ালের প্রাণ-বিনাশ করিবে। অতএব বীরকেশরী রাজীবলোচন আর সময়ক্ষেপ না করিয়া, এক লম্ফে ব্যাঘ্রের নিকটবর্তী হইলেন এবং বজ্রহস্তে ব্যাঘ্রের দুই হস্ত পশ্চাৎদিক্ হইতে ধারণ করিয়া সবলে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিলেন. ব্যাঘ্র বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার হস্ত ছাড়াইতে পারিল না। ব্যাঘ্র রক্ষিগণ তৎক্ষণাৎ পিঞ্জর আনিয়া উপস্থিত করিল। রাজীবলোচন ব্যাঘ্রকে কুক্কুর-শাবকের ন্যায় অনায়াসে উত্তোলন করিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই অলৌকিক বীরত্ব দর্শনে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইল এবং জয়-ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিল। প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে পুরাঙ্গনাগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই রাজীব-লোচনের এই অসামান্য বল-বীর্য ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সুলতান-পুত্রীও স্কন্দ-প্রতিম বীর্যবান্ ও মনোমুগ্ধকর-বপু রাজীবলোচনের লোকাতীত সাহস ও বিক্রম গবাক্ষ-দ্বার দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পরমশোভাস্পদ পূর্ণচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদিত হইলে চকোর যেমন সুধাকরের সুধাপান-বাসনায় অনন্যমনা হইয়া উর্ধ্বদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, তদ্রূপ সুলতান-কুমারী রাজীবলোচনের পূর্ণেন্দুনিভ বদনের দিকে নির্নিমেষ-লোচনে চাহিয়াছিলেন।

ব্যাঘ্র পিঞ্জরাবদ্ধ হইবার পর, রাজীবলোচন সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন, সমস্ত লোকজনও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, কিন্তু সুলতান-পুত্রী অচল অটল ভাবে সেই গবাক্ষ-দ্বারে রাজপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সুলতান-কন্যা নিস্পন্দ, নিশ্চল, চক্ষের পলকটি পর্যন্তও যেন পড়িতেছে না, নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যোগীর ন্যায় পরমাত্মধ্যানে মগ্ন হইয়া কুমারী যেন বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মনঃপ্রাণ এক হইয়া যেন কোন্ স্বর্গীয় সৌন্দর্যের অনুসরণ করিয়াছে।

সুলতান-তনয়া এই অবস্থায় বহুক্ষণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মানা। তাঁহার এক সহচরী আশ্চর্যান্বিত হইয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিলে, সুলতান-দুহিতার চমক ভাঙ্গিল। অন্যমনা তরুণী থতমত খাইয়া বলিয়া উঠিলেন—"বাঘ ধরা পড়িয়াছে ?"

সহচরী হাসিতে হাসিতে বলিল : "আপনি কি ভাবিতেছেন ? অনেকক্ষণ বাঘ ধরা পড়িয়াছে।"

সুলতানপুত্রী ঈষৎ লজ্জা-ভরে কহিলেন : "নিশ্চয় সেই

সুন্দর পুরুষের সাহায্যেই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে! সে সময়ে আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। চল, এখান হইতে এখন চলিয়া যাই।"

এই বলিয়া সুলতান-কন্যা স্বীয় কক্ষে গমন করিয়া শয়ন করিলেন। কোন্ অজানিত শক্তিবলে তাঁহার মনঃপ্রাণ অপহৃত হইয়াছে—সুলতানপুত্রী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে এইটুকুমাত্র বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রাণ-মন রাজীবলোচনের অপার প্রেম-সাগরের অতলতলে তলাইয়া গিয়াছে, আর পুনঃ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। সুলতানপুত্রী শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রফুল্ল আনন বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মাতা, কন্যার এই প্রেমের বিষয় অবগত হইয়া, সুলতানকে সমস্ত কথা বলিলেন।

মধুর-নব সমস্যা

সুলতান সুলেমান পূর্ব হইতেই ভাবিতেছিলেন—কি উপায়ে বীর রাজীবলোচনকে স্বীয় পক্ষভুক্ত করিবেন। মহিষীর নিকট কন্যার প্রেমের কথা জ্ঞাত হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন: "যুবকগণকে সুন্দরী রমণীর রূপ-ফাঁদে ফেলিয়া বশীভূত করা অপেক্ষা অন্য সহজ পন্থা আর নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পরমরূপলাবণ্যবতী কন্যার অসামান্য রূপমাধুরী-দর্শনে রাজীবলোচন নিশ্চয়ই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। তখন আর তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে না। কিন্তু আমি মুসলমান, রাজীবলোচন হিন্দু-ব্রাহ্মণ। এ বিবাহে তিনি সম্মত হইবেন কেন?"

তথাপি সুলতান এই কার্য-সাধনের জন্য একজন দূতী নিযুক্ত করিলেন। দূতী একদিন রাজীবলোচনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"সুলতানের ভবন হইতে কিছু গোপনীয় সংবাদ লইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি, অনুমতি করিলে—প্রকাশ করিতে সাহসী হই।"

দূতীর কথায় রাজীবলোচন বলিলেন: "কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছ, নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে পার।"

দূতী উত্তর করিল: "আপনি যে-দিন কোতোয়ালকে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন, এবং অবলীলাক্রমে

ব্যাঘ্রটিকে পিঞ্জরাবদ্ধ করেন, সেইদিন সুলতানকন্যা আপনাকে দর্শন করিয়াছিলেন। দর্শনাবধি আপনার রূপমোহে তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। দিবারাত্র আপনার চিন্তায় তিনি মগ্ন হইয়া আছেন; দিন দিন মলিন ও কৃশ হইয়া পড়িতেছেন। যে মুখ সর্বদা হাস্যে উৎফুল্ল থাকিত, তাহা এক্ষণে বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে রমণী বিলাসের সুখময় ক্রোড়ে চিরকাল লালিত-পালিত, তিনি আজ একেবারেই বিলাস-বিভ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, এইরূপ ভাবে কিছুদিন থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণান্ত ঘটিবে। সেই জন্য সুলতান আমাকে আপনার নিকট এই বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আপনি অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রকৃত উদারতার পরিচয় দিন।"

দূতীর মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন: "আমি ব্রাহ্মণকুমার হইয়া কিরূপে সুলতানকন্যার পাণিগ্রহণ করিব? যাহা হউক, তুমি সুলতানকে আমার সেলাম জানাইয়া বলিয়ো, আমি তাঁহার সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিব।"

দূতী চলিয়া গেলে, রাজীবলোচন ভাবিতে লাগিলেন: "কি মহাবিপদেই না পড়িলাম, ব্রাহ্মণ হইয়া কিরূপে মুসলমানকন্যা বিবাহ করি? আর সত্যসত্যই কি সুলতান-কন্যা আমার জন্য মলিন ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে? আমি তাহাকে বিবাহ না করিলে সত্যসত্যই কি তাহার প্রাণান্ত ঘটিবে?"

কি করিবেন, কিছুই তিনি স্থির করিতে না পারিয়া, একদিন

সুলতান-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। সুলতান সাদর-সম্ভাষণ করিয়া রাজীবলোচনকে নিকটে বসাইলেন, এবং নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন: "যদি আপনি আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জীবনধারণ করিতে পারিবে না।"

সুলতানের এই কথা শুনিয়া রাজীবলোচন উত্তর করিলেন: "আমি ব্রাহ্মণ-পুত্র হইয়া কিরূপে আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারি?"

সুলতান কহিলেন: "আমি আপনাকে জেদ করিতেছি না। আপনি বীর, বুঝিয়া দেখুন—আপনার জন্য যদি একটি প্রাণিহত্যা হয়, তাহার জন্য দায়ী কে?"

এই কথা শুনিয়া রাজীবলোচন কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং সুলতানকে বলিলেন: "আপনার কন্যার অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করি; যদি তাহার প্রাণ নষ্ট হইবার চিহ্ন দর্শন করি, তাহা হইলে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলাম।"

সুলতান রাজীবলোচনের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, কন্যাকে ডাকিয়া দিতে বলিয়া, সে-গৃহ ত্যাগ করিলেন। তৎপরে সুলতান-পুত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যেমন তাঁহার প্রাণের আরাধ্য-দেবতা রাজীবলোচনের মনোমুগ্ধকর রূপরাশি দর্শন করিলেন, অমনি হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া রাজীবলোচনের পদতলে পতিত হইলেন।

সুলতান-পুত্রীর এই ভাব দর্শন করিয়া রাজীবলোচনের প্রাণ একেবারে দ্রবীভূত হইল। রাজীবলোচন সেই অপ্সরা-সদৃশী

অনিন্দ্যসুন্দরীর কমনীয় ভুজবল্লী ধারণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মোহন মূর্তি স্থাপিত করিলেন, এবং নিজ উত্তরীয়-বসনের দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন।

প্রেম-মুগ্ধা নিরুপমলাবণ্যবতী যুবতীর নবনীতকোমল অঙ্গস্পর্শে রাজীবলোচনের দেহ-মধ্যে এক বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রীড়া হইতে লাগিল। বক্ষঃস্থল দুরদুর্ কম্পিত হইতে লাগিল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তাঁহারও যেন চৈতন্যলোপ হইবার উপক্রম হইল। রাজীবলোচনের প্রাণ তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-সারে সুলতান-দুহিতার প্রাণে যাইয়া মিলিল। সুলতান-কন্যার শূন্য প্রাণ যেন পূর্ণ হইয়া উঠিল। মোহিনী ধীরি ধীরি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ারাধ্য জীবিতসর্বস্বের মোহন অঙ্কে শায়িত আছেন, তখন কি যেন এক অনির্বচনীয় কল্পনাতীত মধুর আনন্দ-ভরে তাঁহার নয়ন-পল্লব আপনাআপনি মুদ্রিত হইল। তাঁহার বদনে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ ঝলসিতে লাগিল।

রাজীবলোচন আত্মহারা হইয়া সুন্দরীর মুখপদ্মে স্বীয় বদন সন্নিবিষ্ট করিয়া অপূর্ব আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপ কিয়ৎকাল গত হইলে রাজীবলোচন সুলতান-দুহিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "সত্য সত্যই কি তুমি আমার বিহনে বাঁচিতে পার না? যদি তাই হয়, তবে কি তুমি আমার সহিত যেখানে সেখানে যাইতে সম্মত আছ?"

সুলতান দুহিতা ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন: "আমার জীবনের জীবন আপনি। আপনার বিহনে কিরূপে আমার

জীবন থাকিবে ? আপনার সঙ্গে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া শাকান্ন ভোজনেও আমি স্বর্গ-সুখে সুখী হইতে পারিব। যাহা আজ্ঞা করিবেন—অবনত-মস্তকে শিরোধার্য করিব। দয়া করিয়া অধীনাকে শ্রীচরণে স্থান দিন, ত্যাগ করিবেন না।”

সুলতান পুত্রীর কথা শুনিয়া রাজীবলোচন বলিলেন : “জাতি, কুল, মান, অহঙ্কার, অভিমান সমস্তই তোমার অতলস্পর্শ প্রেম-পারাবারে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রাণেশ্বরি ! তোমার অকপট প্রণয়ের জন্য সামান্য পৃথিবী কেন লোককাঙ্ক্ষিত স্বর্গরাজ্য পর্যন্তও তুচ্ছ করিতে পারি ; যদি তোমার সন্তোষবিধানার্থ প্রজ্বলিত অনল-মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাতেও কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহি। তুমি আর চিন্তা করিয়া নিজ শরীর নষ্ট করিও না।”

এই কথা বলিয়া রাজীবলোচন কক্ষ হইতে বহিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সুলেমানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সুলেমান অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া রাজীবলোচনকে ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজীব-লোচন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন : “আমি আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারি বটে, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করিতে পারি না।”

সুলেমান উত্তর করিলেন : “মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিয়া আপনি কি হিন্দু-সমাজে আশ্রয় পাইবেন ? আর আমিই-বা মুসলমান হইয়া কিরূপে ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী এক লোকের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিব ?”

রাজীবলোচন গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন : "আপনি যদি মুসলমান হইয়া স্বীয় কন্যা ভিন্ন-ধর্মাবলম্বীকে অর্পণ করিতে না পারেন, তবে এতদূর অগ্রসর হওয়া আপনার ভাল হয় নাই। আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিব কি না, প্রথমেই তাহা জানা উচিত ছিল। এক্ষণে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং শীঘ্রই গৌড় ত্যাগ করিয়া স্বদেশাভি-মুখে যাত্রা করিব।"

৩

মুকুন্দদেব-সকাশে

ভ্রষ্টসন্ধি

রাজীবলোচন সুলেমানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বাহুবলে সুলতান-দুহিতাকে লাভ করিবার জন্য গৌড় আক্রমণ করিতে মুকুন্দ-দেবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মুকুন্দদেব বলিলেনঃ "আমি গৌড় আক্রমণ করিতে পারি, এবং তোমার বাহুবলে ও অদ্ভুত রণ-কৌশলে মুসলমান-রাজ্যও, সম্ভবতঃ, ধ্বংস করিতে পারি বটে, কিন্তু তোমার এখন প্রধান উদ্দেশ্য সুলতানদুহিতা-লাভ। সুলতান-কন্যাকে বিবাহ করিলে তুমি হিন্দু-সমাজে স্থান পাইবে না। বিশেষতঃ, তুমি ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি হিন্দু থাকিয়া কিছুতেই মুসলমান-কন্যা বিবাহ করিতে পার না। ইহাতে হিন্দু-সমাজে মহা ব্যভিচার উপস্থিত হইবে।"

মুকুন্দদেবের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজীবলোচন অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া বলিলেনঃ "যে নারী আমার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে, যে প্রেমময়ী রমণী আমা-বিহনে জীবন-ধারণে অসমর্থ, তাহাকে পরিত্যাগ করা কি অধর্ম নহে? তাহাকে হিন্দু-ধর্মে দীক্ষিত করিয়া, তৎপরে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে দোষ কি?"

মুকুন্দদেব গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিলেন ঃ "তুমি ভাবপ্রবণ যুবক, তোমার হিতাহিতজ্ঞান এখনও পরিস্ফুট হয় নাই ; তাই তুমি এরূপ ভঙ্গীতে আমার সহিত কথা কহিতেছ। ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী লোক কিছুতেই হিন্দু হইতে পারে না।"

ইহা শুনিয়া রাজীবলোচন অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "জগন্নাথদেবের পুরী-মধ্যে জাতি-বিচার নাই কেন ?"

মুকুন্দদেব। জাতি-বিচার আছে বই কি ! কেবল ভগবানের প্রসাদ-গ্রহণে কোন বিচার নাই। কিন্তু পুরী-মধ্যে ম্লেচ্ছ কিংবা যবন প্রবেশ করিতে পারে না।

রাজীব। যদি উড়িষ্যা মুসলমান-করতলগত হয়, তখন পুরী-মধ্যে মুসলমানদের প্রবেশ করিতে কে নিষেধ করিবে ?

মুকুন্দদেব। সর্বৈশ্বর্যশালী জগন্নাথদেবই তাহার প্রতি-বিধান করিবেন।

রাজীব। জগন্নাথ কেন বলিতেছেন ? উড়িষ্যানাথ বলুন।

মুকুন্দদেব। যুবক, চপলতা পরিত্যাগ কর।

রাজীব। চপলতা কিসে হইল, মহাশয় ! আমি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলিতেছি। তিনিই জগন্নাথ, যিনি জগতের সমস্ত জীবের আশ্রয়। কিন্তু আপনার জগন্নাথ একটি অবলা নারীকে আশ্রয় দান করিতে পারেন না !

মুকুন্দদেব। উদ্ধত যুবক ! অহঙ্কারে একান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছ। পবিত্র ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান-বর্জিত হইলে, এইরূপই হইয়া থাকে। মদোন্মত্ত স্বেচ্ছাচারী, যাও, আমার সম্মুখে আর জগন্নাথদেবের নিন্দা করিয়ো না। যথা

ইচ্ছা আচরণ কর। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, তোমার ভয়ে আমি ধর্মবিগর্হিত কার্য অনুমোদন করিব?

রাজীব। যে ধর্ম এত সঙ্কীর্ণ, যে ধর্ম পতিতকে দূরে থাক্, অতি উন্নত-হৃদয়া প্রেমরূপিণী রমণীকেও স্বীয় অঙ্কে স্থান দান করিতে অসমর্থ, সে ধর্ম ধর্মই নহে।

মুকুন্দদেব। যে পাষণ্ড যবনীর প্রেমে পড়িয়া, কামমোহে অন্ধ হইয়া স্বীয় ধর্মকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, যে নরাধম আর্য-ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্নাথদেবের নিন্দা করিতে পারে, সেই ব্রাহ্মণ-কুলকলঙ্ক, স্বার্থপর, কামুকের মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।

মুকুন্দদেবের এই তিরস্কার-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন এক লম্ফে অশ্বারোহণ করিলেন এবং অসি নিষ্কোষিত করিয়া মুকুন্দদেবের প্রতি রোষকষায়িত লোচনে চাহিয়া সদম্ভে কহিলেন: "যে জগন্নাথদেবের নিন্দা আজ অসহ্য হইল, সেই জগন্নাথকে তোমার সম্মুখে এই তরবারির আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দগ্ধ করিব। দেখিব—কোন্ ধর্মবলে তুমি তাহা বারণ করিতে সমর্থ হও।"

এই বলিয়া রাজীবলোচন অশ্বে কশাঘাত করিলেন, অশ্ব তীরবেগে গৌড় অভিমুখে ধাবিত হইল। মহা অবিবেকী অহঙ্কারোন্মত্ত রাজীবলোচন ঘোর অভিমানভরে প্রিয় জন্মভূমিকে মুসলমান-পদানত করিতে যত্নবান্ হইলেন। যে বীরকেশরী রাজীবলোচন বঙ্গ হইতে মুসলমানদিগকে চিরকালের জন্য বিদায় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, সেই অপরিণত-বুদ্ধি যুবক

মুসলমানীর প্রেমাকর্ষণে এবং রাজনীতি-জ্ঞান-শূন্য অদূরদর্শী মুকুন্দদেবের নির্বোধ-জনোচিত পরুষব্যবহারে তীব্র অভিমান-অহঙ্কারে উন্মত্ত ও দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া, হিন্দু-ধর্ম পরিত্যাগ করতঃ বিধর্মী রমণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। হিন্দুর আশা-প্রদীপ সুচিরকালের জন্য নির্বাপিত হইল। যে ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ অভীষ্ট-পথে অগ্রসর হইতেছিল, বিধির মহারহস্য-পূর্ণ বিধানে বঙ্গের ভাগ্য-গগনে সহসা কালমেঘ উদিত হইয়া সেই ধ্রুবতারাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বঙ্গের আশা-ভরসা অনির্দিষ্ট কালের জন্য লুপ্ত হইল।

দৈবযোগ

এক্ষণে বঙ্গাধিপ সুলেমান্ মহানন্দে রাজীবলোচনকে প্রধান সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। গৌড়-রাজনগরে মহা-মহোৎসব চলিতে লাগিল। প্রতি সৌধচূড়ায় মনোজ্ঞ কেতনরাজি সদর্পে উড্ডীন হইল ; পত্র-পুষ্পে শোভিত হইয়া গৌড়-রাজধানী এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করিল। সুধাধবলিত হর্ম্ম্যনিকর রজনীতে দীপমালায় আলোকিত হইয়া অপূর্ব সৌন্দর্যে শোভাময় হইয়া উঠিল। বিজয়-দুন্দুভিনিনাদ গৌড়-রাজনগরের মহোল্লাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

এই শুভ সংঘটনে সুলেমান উড়িষ্যা আক্রমণ করিবার সুযোগ-প্রতীক্ষায় রহিলেন। কিছুকাল অতিবাহনের পর তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত অবসর আসিল। তখন শীতকাল, আকবর চিতোর-অবরোধে দূরান্তরে ব্যাপৃত। সুলেমান এই সুযোগই খুঁজিতে-ছিলেন। তিনি উড়িষ্যায় সামরিক অভিযানের জন্য সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইলেন। এতদিনে রাজীবলোচনের আশা পূর্ণ হইল। অমিত উদ্যমে সুলতান-সেনাপতি রাজীব-লোচন মুকুন্দদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার অভিপ্রায়ে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিকসৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত হইলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই রণসজ্জা শেষ করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন।*

* সেই সঙ্গে সুলেমানের নির্দেশে তৎপুত্র বায়াজিদ্ ও মুঘল-পক্ষত্যাগী রণকুশল সিকন্দর উজবকের অধীনতায় অন্য এক সৈন্যবাহিনী ছোটনাগপুর ও ময়ূরভঞ্জের অরণ্যসঙ্কুল পথে অগ্রসর হইল। স্থির রহিল—দুই বিভিন্ন দল উড়িষ্যায় মিলিত হইবে।

কালবৈশাখী মেঘের ন্যায় রাজীবলোচন কালাপাহাড়-মূর্তিতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন। অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইল। ভীষণ রণবাদ্য ও অস্ত্রশস্ত্রের ঝনৎকার শব্দ, বীরগণের হুঙ্কার-ধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া, জনপদবাসী জনগণের মনে বিভীষিকা উৎপন্ন করিল। রাজীবলোচন প্রভঞ্জনবেগে ত্রিবেণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ত্রিবেণীতে মুকুন্দদেবের একজন প্রতিনিধি রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, মহাবীর সমরকুশল রাজীবলোচন সুলেমানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছেন, তখন তিনি রাজীবলোচনকে কিছুমাত্র বাধা না দিয়া প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিলেন। রাজাবলোচন বিনাযুদ্ধে ত্রিবেণী অধিকার করিলেন, এবং মুকুন্দদেবের অধিকৃত বঙ্গদেশীয় সমস্ত স্থানে মুসলমান-বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া, তাঁহার বল-পরীক্ষা করিবার জন্য উড়িষ্যা-অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে তিনি তাঁহার জ্ঞাতি-ভ্রাতা রাজা রুদ্রনারায়ণের রাজ্য-মধ্যে আসিয়া পড়িলেন। কারণ, উড়িষ্যা যাইতে হইলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। রাজীবলোচন তারকেশ্বরের প্রায় আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি গ্রামে আসিয়া বিশ্রামার্থ সেনানিবাস স্থাপন করিলেন। তাঁহারই 'কালাপাহাড়' নামানুসারে ঐ গ্রাম পাহাড়পুর বলিয়া পরিচিত হইল।

কালাপাহাড়-নামধারী রাজীবলোচন যখন পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা রুদ্রনারায়ণ,

রাজীবলোচনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা গোপীরমণ, এবং তাহার জননী—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।

রাজীবলোচন সকলের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সাশ্রনয়নে স্বীকার করিলেন, "আমি কুলাঙ্গার, আমি যে-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই কুল উজ্জ্বল করিবার পরিবর্তে তাহাতে কালি দিতে বসিয়াছি। আপনারা আমাকে ভুলিয়া যান। আমি মুকুন্দদেবকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্যই মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমানের শরণাপন্ন হইয়াছি। মা! আপনি আর এ অকৃতজ্ঞ অধম পুত্রের জন্য দুঃখ করিবেন না। আমি এখন অস্পৃশ্য ধর্মত্যাগী, আপনার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতেও আজ অসমর্থ।"

রাজীবলোচনের এই কথা শুনিয়া কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। রাজা রুদ্রনারায়ণ দুঃখিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন: "ভাই রাজু, তোমার অভাব আমরা কিরূপে সহ্য করিব? তুমি আমাদের আঁধার ঘরের মাণিক, দরিদ্রের অমূল্য নিধি! তোমার বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, একদিন বঙ্গ হইতে মুসলমান চিরতরে বিতাড়িত হইবে। কিন্তু বিধির অলঙ্ঘ্য শাসনে আজ সেই আশালতা সমূলে উৎপাটিত হইল। মুসলমান-রাজ তোমার বাহুবলে হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিতে সমর্থ হইল। ভাই, তুমি আমায় কোন কথা না বলিয়া সুলেমানের শরণাপন্ন হইলে কেন? আমি গৌড় অধিকার করিয়া তোমায় সুলতান-কন্যা আনিয়া দিতাম। সামান্য

একটি স্ত্রীলোকের জন্য বঙ্গের ভবিষ্যৎ এরূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল! ভাই, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়ো না। সুলতানকন্যা তোমারই সহিত রহিয়াছেন: চল—গৃহে গমন করি। তাঁহার বাসের উপযুক্ত প্রাসাদ আমি দামোদর-তীরে নির্মাণ করিয়া দিব। তুমি মুসলমান-ধর্ম পরিত্যাগ কর। সুলতানকন্যাও হিন্দুমত গ্রহণ করুন।"

রাজা রুদ্রনারায়ণের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজীবলোচন বলিলেন: "দাদা, মায়ার বশীভূত হইয়া আপনি এই সমস্ত কথা বলিতেছেন; আমায় ত্যাগ করিতে আপনাদের প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। কিন্তু দাদা, বলুন দেখি, মা কি সুলতানকন্যার হস্তে জল-গ্রহণ করিবেন? আমি যদি আপনাদের আত্মীয় না হইয়া অপর কেহ হইতাম, তাহা হইলে কি দেশের উপকারের আশায় আমার এই অপরাধ মার্জনা করিতেন? দেশের মুখ চাহিয়া কি আমাকে সমাজে গ্রহণ করিতেন? তাহা হইলে, মুকুন্দদেব সুলতানকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন কেন? স্বদেশের প্রতি যদি তাঁহার বিন্দুমাত্র মায়া থাকিত, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রাণান্তেও ত্যাগ করিতে পারিতেন না।"

তাহার পর কিছুক্ষণ থামিয়া, কি যেন ভাবিয়া, তাঁহার মুখ কুটিল হইয়া উঠিল, তিনি দৃপ্তকণ্ঠে কহিলেন: "আমি বেশ বুঝিয়াছি, হিন্দুজাতির অধঃপতন ভগবানের বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে ভারতের কর্মী-পুত্রগণ সামান্য ব্যক্তিগত অপরাধে সমাজচ্যুত হয় কেন? সমাজ-ধর্মের এই কঠোর নিয়ম যত

দিন না, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়, একটু শ্লথ হইতেছে, তত দিন ভারতের উন্নতির কোন আশা নাই। সেই জন্যই, বোধ হয়, ভগবান্ কৌশলে আমায় মুসলমান-পক্ষ অবলম্বন করাইলেন। এতদ্ভিন্ন, সুলতান বিশ্বাস করিয়া তাঁহার মস্তক আমার করে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সেই মস্তক ছেদন করি। যে সুলেমান আমার গুণগ্রাম হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজকন্যা পর্যন্ত একজন ভিন্নজাতীয় লোকের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন এবং বিশ্বাস করিয়া সেনাপতি-পদে বরণ করিতে পারেন, আমি জীবন ধারণ করিয়া কিরূপে তাঁহার সেই বিশ্বাস হনন করিব? দাদা! আমায় মার্জনা করুন, চিরকালের জন্য আমায় ভুলিয়া যান, মনে করুন—আমি যেন আপনাদের বংশে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে-ধর্ম ও যে-সমাজ সর্বসাধারণকে আশ্রয় দিতে পারে না, সেই সঙ্কীর্ণ ধর্ম ও স্বার্থপর সমাজকে পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য উন্মূলিত করিব, দেবালয় ভূমিসাৎ করিব, দেব-দেবীর মূর্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া হিন্দুত্বের চিহ্ন পর্যন্ত ভারত হইতে দূরীভূত করিব। সঙ্কীর্ণহৃদয় ব্রাহ্মণবংশ ধ্বংস করিব। কিন্তু আপনি নির্বিবাদে ও নিশ্চিন্ত মনে রাজ্য-শাসন করুন। আপনার রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব হইবে না।"

রাজীবলোচনের মুখে এই সকল কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা রুদ্রনারায়ণ কিঞ্চিৎ বিরক্তির স্বরে বলিলেন: "রাজীব, তুমি বীর, কিন্তু তুমি সংস্কারের সামান্য তাড়না সহিবারও শক্তি রাখো না। তাই মোহগ্রস্ত হইয়া স্বজাতি ও স্বদেশের

সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তুমি নিজ সত্তাকে অপমান করিয়াছ। তোমার নামের সঙ্গে কলঙ্কেরই যোগ হইয়া থাকিবে। আজ তুমি গতিভ্রষ্ট, ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্ত নিজে পান করিয়া উৎকট প্রতিহিংসার উল্লাসে মাতিয়া গিয়াছ। তোমার আর প্রত্যাবর্তন নাই—বুঝিয়াছি। বিদায়—চিরবিদায়!"

হতাশ হইয়া অতি বিষণ্ণ-মনে তিনি সদলবলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং রাজীবলোচনও সসৈন্যে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তিনি অতি সাবধানতার সহিত ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করিতে লাগিলেন। রাজীবলোচনের কঠোর আদেশে তাঁহার সৈন্যগণ অতি শান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল। গো, ব্রাহ্মণ ও দেব-মন্দিরের উপর কোনও রূপ অত্যাচার হইল না।

কালাপাহাড় ভারতের যে যে অংশে গমন করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ এবং ব্রাহ্মণগণের উপর মহা অত্যাচার করিয়া হিন্দুধর্মের যথেষ্ট ক্ষতি-সাধনে তৎপর হন। কেবল ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যে তাঁহার ভীষণ অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। *

---

* প্রমাণ পাওয়া যায়, অতি প্রাচীন দেবমন্দিরসকল মস্তকদেশে ভুরসুটের ব্রাহ্মণরাজগণের নাম ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। এখনও গড় ভবানীপুরে মণিনাথের বিগ্রহ ও মন্দির ক্ষোদিত লিপি লইয়া বিদ্যমান আছে। অদ্যাপি তদানীন্তন বহু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ও ধরাগর্ভে লীন ভিত্তি-গাত্র প্রভৃতি এবং লুপ্ত. স্থানান্তরিত ও বর্তমান বিগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায়।

যে-সময়ে কালাপাহাড় উড়িষ্যা-জয়-মানসে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য অতিক্রম করিতেছিলেন, তাহার বহুপূর্বে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। কালাপাহাড় স্বীয়-বংশ-প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরগুলির উপর কোনপ্রকার অত্যাচার করিলেন না। তিনি জননী ও জন্মভূমির নিকট শান্তভাবে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া, উড়িষ্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৮

উড়িষ্যা-জয় ও দীপনির্বাণ

আকবরের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পর পাঠান-পক্ষকে বহুস্থলে নির্জিত করিয়া, হরিচন্দন মুকুন্দদেব স্বরাজ্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন। সামরিক নীতির প্রতি মনোযোগ না রাখিয়া, তিনি ধর্মনীতিতেই সমস্ত মন সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার দেবতা-নিষেবিত স্তব-মুখরিত শঙ্খঘণ্টা-ঝঙ্কৃত শান্তি-নিবাসে সংবাদ আসিল গৌড়-সুলতান সুলেমানের সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যা-অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে। আরও একটি অপ্রিয় বার্তা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। দুর্ধর্ষ রাজীবলোচন তাঁহার কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুলেমানের সঙ্গে হাত মিলাইয়া কালাপাহাড়-নাম-ধারণে প্রতিহিংসা-গ্রহণ-মানসে ধূমকেতুর ন্যায় আবির্ভূত হইতেছে। প্রথমে তাঁহার সন্দেহ জাগিল, তাঁহার সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্য গুপ্তচর ছুটিল।

কালাপাহাড় অসংখ্য আফগান অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি হইয়া উড়িষ্যা-জয় করিতে প্রকৃতই আসিতেছেন, ইহা শুনিয়া উড়িষ্যাধিপতি মুকুন্দদেব সত্বর সৈন্য-সংগ্রহ ও সমরসজ্জা করিতে লাগিলেন। শত্রু-হস্ত হইতে দেশ-রক্ষা করিবার জন্য উড়িষ্যাবাসী সমর্থ ব্যক্তিগণকে কার্যোপযোগী সমর-কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, এবং রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠাইলেন। কিন্তু

রুদ্রনারায়ণ উড়িষ্যারাজকে সাহায্য করিবার উত্তম অবসর পাইলেন না, তদুপরি মহা উগ্রপ্রকৃতি, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজীবলোচনকে অসন্তুষ্ট করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন। কাজেই মুকুন্দদেব যথাসময়ে প্রার্থিত সাহায্য না পাইলেও, একাকী উড়িষ্যার সীমান্তদেশে সৈন্যসজ্জা করিতে বিলম্ব করিলেন না। এই গুরুতর কার্যে তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন তাঁহার অধীন ছোট রায় ও রঘুভঞ্জ নামক দুই রাষ্ট্র-সম্পর্কিত কর্মকর্তার উপরে। তিনি এমনই অপ্রস্তুত ছিলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি নায়কদ্বয়ের উপর সৈন্য-চালনার ভার দিয়া ভীষণ কালা-পাহাড়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কালাপাহাড় সসৈন্যে উড়িষ্যার সীমায় পদার্পণ করিলে, ঘোর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সেই দুই বিশ্বাসহন্তা এক-দল রণকুশল সৈন্যকে প্রলোভনে ভুলাইয়া বিপথে পরিচালিত করিল। রাজদ্রোহী সৈন্যগণ শত্রুকে ছাড়িয়া নিজেদের প্রভুকেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। এদিকে অবশিষ্ট কয়েকজন অতিবিশ্বাসী সৈন্যের সহিত তিন-চার দিন ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল, অবশেষে মুকুন্দদেবের সেনাবাহিনী কালাপাহাড়ের লোকোত্তর প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া অনেকেই শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জন করিল। অবস্থার বিপরীতগতি দেখিয়া, মুকুন্দদেব কোটসামা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং অন্তঃশত্রুগণকে দমন করিবার জন্য বায়াজিদের নিকট একদল সৈন্যের সাহায্য ক্রয় করিতে

বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিদ্রোহিগণের সহিত সংগ্রামে মুকুন্দদেব ও ছোট রায়ের পতন হইল। অপ্রত্যাশিত উপায়ে প্রবল শত্রু উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের বিনাশে মুসলমানপক্ষের উড়িষ্যা-জয়ের আশা আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। ইতোমধ্যে সারঙ্গগড়ের সৈন্যাধ্যক্ষ রামচন্দ্রভঞ্জ বা দুর্গাভঞ্জ শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও মুসলমান-অধিনেতার চক্রান্তে প্রাণ দিতে হইল। তখন অল্প আয়াসেই উড়িষ্যা মুসলমান-অধিকারে আসিল।

এইবার কালাপাহাড় বহুসঞ্চিত ধন-রত্নের আকর প্রসিদ্ধ পুরীর মন্দিরে হানা দিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইলেন। তিনি আফগান-বাহিনীর একদল রণ-দুর্মদ অশ্বারোহী-সেনা সঙ্গে লইলেন। অতঃপর কালাপাহাড় বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। জগন্নাথদেবের পুরোহিতগণ যখন শুনিলেন যে, রাজা মুকুন্দদেব যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এবং কালাপাহাড় বিজয়মদোন্মত্ত ভীষণ আফগান-সৈন্য সমভিব্যাহারে পুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাঁহারা মহাভীত হইয়া জগন্নাথদেবের মূর্তি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, উহা লইয়া চিল্কা হ্রদের নিকট কোন গুপ্তস্থানে মৃত্তিকাভ্যন্তরে লুক্কায়িত রাখিলেন।

রাজ্যের কর্ণধার তখন কেহ নাই। উত্তর উড়িষ্যার রাজধানী জাজনগর হইতে পুরী পর্যন্ত পথে বা প্রান্তসীমায় বাধাদানের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। কালাপাহাড়-পরিচালিত সৈন্যদল পুরীবাসীর ভয়-বিস্ময় উৎপাদন করিয়া ত্বরিতগতিতে অগ্রসর

হইতে লাগিল।...বহু শতাব্দীব্যাপী বিদেশী শত্রুর নিগ্রহ-মুক্ত স্বাধীনতা-তৃপ্ত পুরীর অধিবাসিগণ এমনি নিরাপদ্‌-জীবন-ভোগে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল যে, আততায়ী মুসলমানদের আগমন-সংবাদ প্রথমে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে নাই। তাহাদের সুপবিত্র দেবস্থানে বিধর্মীর অভিযান হইতে পারে, ইহা কল্পনাতীত ছিল। তাহাদের প্রশ্ন হইল: "মুসলমানরা কি রকম অদ্ভুত জীব? সর্বশক্তিমান এই জাগ্রতদেবতার অণুমাত্র ক্ষতি করা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবপর?"

কিন্তু সমস্ত অন্ধবিশ্বাস চূর্ণ করিয়া মুসলমানগণ পুরীর মন্দির অবরোধ করিল। করালমূর্তি কালাপাহাড় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন কিন্তু মন্দির-মধ্যে জগন্নাথের মূর্তি দেখিতে না পাইয়া গুপ্তচর দ্বারা চতুর্দিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

অনেক ব্রাহ্মণরমণী তাহাদের সমস্ত অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়া নিশ্চিন্তবিশ্বাসে মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা বিনাযুদ্ধে আয়ত্তে আসিলে, নারীগণকে বলপূর্বক বাহিরে টানিয়া আনিয়া বন্দিনী করা হইল। এইরূপ অত্যাচারের অন্ত রহিল না; কালাপাহাড়ের নির্দেশে উড়িষ্যাবাসী নিরীহ ব্রাহ্মণগণ শমনশদনে প্রেরিত হইতে লাগিলেন। কালাপাহাড় স্বহস্তে জগন্নাথ-মন্দিরের একাংশ ধ্বংস করিলেন। অবশেষে দেবমূর্তি চিল্কা হ্রদের নিকটবর্তী কোন স্থানে লুক্কায়িত আছে শুনিয়া, তিনি সেই স্থান হইতে ঐ মূর্তি আনাইলেন এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া একটি শকটে বোঝাই দিয়া ত্রিবেণী পাঠাইয়া দিলেন।

অনন্তর মন্দির-লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। বহুবিচিত্র রত্নভূষণ,

স্বর্ণময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং হীরক-নির্মিত চক্ষুর্দ্বয় দেববিগ্রহ হইতে বিমুক্ত করিয়া, বিজয়ী অপহরণ করিল। নানা আকারের আরও সাতটি স্বর্ণবিগ্রহ অপহৃত হইল। প্রত্যেকটির ওজন ছিল পাঁচ (আকবরী) মন। কালাপাহাড় উড়িষ্যার বহুতর দেবমন্দির ও দেব-দেবী-মূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ ও লুণ্ঠন করিয়া, ত্রিবেণীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ত্রিবেণীর জাহ্নবীতটে সমবেত হিন্দুগণের সমক্ষে জগন্নাথদেবের খণ্ডিত মূর্তিতে অগ্নিসংযোগ করিতে অনুমতি দিলেন। কোন হিন্দু-ভক্ত এই বিসদৃশ দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া, কৌশলে ও গোপনীয় ভাবে অর্ধদগ্ধ দেবমূর্তি গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তৎপরে জগন্নাথদেবের পুরোহিতগণের হস্তে উহা অর্পণ করেন।

*　　*　　*　　*

কালাপাহাড় এইরূপে উড়িষ্যা-বিজয় করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ইহার পর তিনি কামাখ্যা ও হাজোর প্রাচীন মন্দিরসকল বিনষ্ট করিয়া আপনার হিংস্রপ্রবৃত্তি ও অত্যাচারের লীলা পরিপূর্ণ করিয়া তুলিলেন।...কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহে গত হইল। বহু মানুষের অভিশাপ তাঁহার জীবনের দিনগুলিকে অধিকার করিয়া বসিল। ঘোর স্বার্থপরতা, দম্ভ ও অভিমান বশতঃ, তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও দেশের যে মহা অনিষ্ট-সাধন করিলেন, ইহা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। পাপকার্যের অনুশোচনায় তাঁহার জীবনের সমস্ত সুখ একেবারে তিরোহিত হইল। দুঃখের ঘনান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। অপ্সরানিন্দিতা পতিপ্রাণা সুলতান-দুহিতা

প্রাণপণ স্বামীর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়াও তাঁহার মানসিক অশান্তি দূর করিতে পারিলেন না। কালাপাহাড়ের জীবন দুর্বহ হইয়া উঠিল। ঘৃণা-ও ভীতি-পূর্ণ 'কালাপাহাড়' নাম যখনই রাজীবলোচনের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিত, তখনই তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে নিজ প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইতেন। অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা-ভোগের শেষ আনিবার জন্য, জীবনে বীতশ্রদ্ধ কালাপাহাড় ঘোড়াঘাট ও রাজমহলের মুঘল-যুদ্ধে উন্মত্তের ন্যায় প্রবেশ করিয়া সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাতে বহুধিকৃত মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

৬

রুদ্রনারায়ণ

সুলেমানের মৃত্যুর পর দায়ুদ খাঁ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দায়ুদ খাঁ বলদৃপ্ত হইয়া সম্রাট্ আকবরের অধীনতা ত্যাগ করিলে সম্রাট্ দায়ুদকে শিক্ষা দিবার জন্য অসংখ্য সমর-কুশল সৈন্য-সমভিব্যাহারে সেনাপতি মুনায়েম খাঁকে গৌড় অভিমুখে প্রেরণ করেন। দায়ুদ খাঁ রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে দলভুক্ত করিতে আগ্রহান্বিত হন। কিন্তু ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ দায়ুদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দিল্লীশ্বর আকবরের বিপক্ষতাচরণ করিতে সাহসী হন নাই।

দায়ুদ খাঁ বাদশাহীসৈন্যের সহিত প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাস্ত হন এবং পলায়ন করিয়া উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ আবার আকবরের পদানত হয়।

দায়ুদের প্রার্থনা সত্ত্বেও রাজা রুদ্রনারায়ণ যে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন নাই, তজ্জন্য মহামতি আকবর, রুদ্রনারায়ণের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং বঙ্গদেশীয় সমস্ত নরপতির মধ্যে তাঁহাকে বিশিষ্ট স্থান অর্পণ করিলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণও পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য বাদশাহ্ আকবরের আবশ্যকমত সাহায্যে আসিয়াছিলেন।

মুঘলগৌরবরবি আকবর দ্বিতীয় পাণিপথ-সমরে পাঠান সেনাপতি হিমুকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাঠান-বীর্যবহ্নি

একপ্রকার নির্বাপিত করিয়াছেন। আকবরের উদার রাজনীতি-গুণে ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, পারসী প্রভৃতি জাতিগণ শ্রদ্ধাবনত হইয়া সমস্বরে তাঁহার মহত্ত্ব কীর্তন করিতেছে। মহা অশান্তি ভারতের প্রায় প্রত্যেক নর-নারীকে বহুকাল ধরিয়া অত্যন্ত অস্থির করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে দোর্দণ্ড-প্রতাপশালী প্রজাবৎসল সম্রাটের আশ্রয়ে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রকৃতিপুঞ্জ পরমসুখে কালাতিপাত করিতেছেন। উপযুক্ত হিন্দুপ্রজাগণ উচ্চ উচ্চ রাজকার্যে, এমন-কি প্রধান সেনাপতিত্বে পর্যন্ত নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের মঙ্গল-বিধানে রত হইয়াছেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তারস্বরে আকবরকে 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া পরম ভাগ্যবিধাতার সহিত সমান আসন প্রদান করিতেছে, এবং তাঁহাকে অতুল সম্মানে সম্মানিত করিয়া শ্রদ্ধাভরে তাঁহার নিকট অবনত-মস্তক হইয়া পড়িয়াছে। বিজয়লক্ষ্মী মহাবল আকবরের পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময়ে বঙ্গের গগন-ভালে অশান্তিরূপ কালমেঘ দেখা দিল। বঙ্গদেশে আবার সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। বঙ্গের রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সম্রাটের মহত্ত্ব-গুণে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া, বঙ্গাধিপ পাঠানবংশীয় দায়ুদ খাঁ ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। বিলুপ্ত পাঠানগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দায়ুদ খাঁ বিপুল বল-সঞ্চয় করিয়া সম্রাট্ আকবরের অধীনতা-পাশ বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং স্বাধীন নরপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। দায়ুদের এই গর্ব খর্ব করিবার জন্য সম্রাট্ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন।

ঘোরতর যুদ্ধে দায়ুদ অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও বিজয়-লাভে অসমর্থ হইলেন, এবং তিনি মহাসমরে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া বঙ্গদেশ পারত্যাগ করতঃ উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলেন। তথায় তিনি ভগ্নহৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশ পুনরধিকার করিবার জন্য তিনি দেশীয় রাজগণের নিকট বারংবার সাহায্য প্রার্থনা করিলেও, কোন রাজাই আকবরের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ভূরি-শ্রেষ্ঠপুরে ব্রাহ্মণবংশীয় রাজা রুদ্রনারায়ণ রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণের পূর্ববর্তী নরপতিগণ প্রায় সকলেই গৌড়ের পাঠান-রাজগণের মিত্র ছিলেন। সেইজন্য দায়ুদ খাঁ রুদ্রনারায়ণের সাহায্য পাইবার বিশেষ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রুদ্রনারায়ণের জ্ঞাতি রাজীবলোচন রায় দায়ুদের পিতা সুলেমান কররাণির চক্রান্তে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হিন্দু-দেবদেবী-মূর্তি চূর্ণ করিয়া হিন্দুধর্মের অনিষ্ট করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন; সেইজন্য রাজা রুদ্রনারায়ণ বঙ্গের পাঠান নৃপতিগণের উপর অতীব ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। দায়ুদ খাঁ রুদ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য-প্রাপ্তির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এইরূপে ভগ্নচিত্ত হইয়া দায়ুদ খাঁ লোকান্তর গমন করিলে, কতলু খাঁ পাঠানসর্দার-রূপে উড়িষ্যা শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। ইনিও গড় ভবানীপুরের রাজা রুদ্রনারায়ণকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা

করিতে লাগিলেন, অনেক লোভ দেখাইলেন, অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই যখন রাজা রুদ্রনারায়ণ তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন না, তখন কতলু খাঁ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু-রাজ্যগুলি ও দুর্গসকল বলপূর্বক হস্তগত করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বীর্যশালী রুদ্রনারায়ণের বহুসংখ্যক রণপোত দামোদর ও রোণ নদে সর্বদা ভাসমান থাকিয়া শত্রুহস্ত হইতে ভূরিশ্রেষ্ঠকে সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত রাজার বহুসহস্র সুশিক্ষিত ও রণনিপুণ যোদ্ধাও ছিল। যে স্থানে রাজার সৈন্যগণ বাস করিত, তাহা লশকর বা নস্করডাঙ্গা নামে অভিহিত হইত। এখনও রাজবলহাট নামক গ্রামের অনতিদূরে এই সুবিস্তৃত স্থান নস্করডাঙ্গা নামেই পরিচিত। এখন এ-স্থান একটি বৃহৎ গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তমলুক, আমতা, উলুবেড়িয়া, খানাকুল, ছাওনাপুর প্রভৃতি স্থানে রাজার ছাউনি ছিল।

এই সমস্ত কারণে কতলু খাঁ রুদ্রনারায়ণের রাজ্য প্রথমে আক্রমণ করা সমীচীন বলিয়া বোধ করিলেন না। তিনি রুদ্রনারায়ণের রাজ্যের পশ্চিম দিক্ দিয়া সসৈন্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজাও তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমপ্রান্ত সশস্ত্র সৈন্যগণের দ্বারা সুরক্ষিত করিয়া ফেলিলেন।

কতলু খাঁ সসৈন্যে বঙ্গদেশে অগ্রসর হইতেছে—সংবাদ পাইয়া বাদশাহ্ আকবর অম্বররাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসমভিব্যাহারে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন, এবং বিষ্ণুপুর-রাজ ও

ভূরসীট্ট-রাজ রুদ্রনারায়ণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, যদি তাঁহারা কতলু খাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটের সাহায্য করেন, তাহা হইলে সম্রাট্ চিরকাল তাঁহাদিগকে মিত্র বলিয়া গণ্য করিবেন।

কতলু খাঁ উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে গড় মান্দারণে উপস্থিত হইলেন। ভয়-প্রদর্শন করিয়া মান্দারণ-দুর্গাধিপতিকে স্বদলে আনয়ন করিবার জন্য কতলু খাঁ সবিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছুতেই যখন তাঁহার অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না, তখন তিনি সদলবলে গড় আক্রমণ করিলেন। ভাগ্যক্রমে জগৎসিংহ সেই সময়ে জাহানাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কতলু খাঁর সেনার পশ্চিমভাগ আক্রমণ করিলেন। জগৎসিংহকে সাহায্য করিবার জন্য উত্তরদিকে বিষ্ণুপুররাজ ও পূর্বদিকে রাজা রুদ্রনারায়ণের বহুসংখ্যক রণদক্ষ সৈন্য কতলু খাঁর সৈন্যদলকে আক্রমণ করিল। ভীষণ সমরানল জ্বালিয়া উঠিল। এই অনলে উভয়-পক্ষীয় বহু সৈন্যের সহিত কতলু খাঁ ও মান্দারণ-দুর্গাধিপতি ভস্মীভূত হইলেন। মুঘল-সেনাপতি জগৎসিংহ যুদ্ধে আহত হইলে পর, বিষ্ণুপুররাজ পাঠান সেনানায়ক ওসমানের হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া অতি সতর্কতার সহিত নিজ রাজ্যে লইয়া যান এবং সযত্নে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করেন। পাঠানসর্দার কতলু খাঁ নিহত হইলে, সেনাপতি ওসমান সদলবলে উড়িষ্যা অভিমুখে প্রস্থান করেন।

সাধন-প্রতিমা

মান্দারণের যুদ্ধে বহু হতাহত ও সাধারণ জনগণের অত্যন্ত দুঃখকষ্ট দেখিয়া রাজা রুদ্রনারায়ণের প্রাণে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তিনি এক্ষণে যৌবনাবস্থা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত তাঁহার পুত্রাদি জন্মগ্রহণ করে নাই। সুতরাং তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া ধর্মকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার দীক্ষাদাতা গুরু শিবপ্রতিম হরিদেব ভট্টাচার্যের উপদেশে শিবপদে আত্মনিবেদন করিবার মানসে তিনি কাটশাঁকড়া নামক গ্রামে এক শিবমন্দির স্থাপন করিলেন, এবং অনতিবিলম্বে রাজা শিবমন্দিরের নিকটেই এক প্রকাণ্ড সরোবর খনন করাইলেন *।

মন্দির-প্রতিষ্ঠা-দিবসে একটা বৃহৎ উৎসবের ব্যবস্থা হইল। সমস্ত প্রজা এই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদান করিল। এই আনন্দ-যজ্ঞে সকলেই আমন্ত্রণ-লাভে আনন্দিত হইল।

এই প্রতিষ্ঠা-দিবসে রাজা ব্রাহ্মণভোজন করাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণগণ সকলেই নানাবিধ উপাদেয় রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য

---

* আমতার নিকটবর্তী কাটশাঁকড়া গ্রামে এই রুদ্রনারায়ণের শিব-মন্দির অতীতের স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছে; এবং মন্দির-সন্নিহিত এই দীর্ঘিকা এখনও অগাধ জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া গ্রামবাসী জনগণের জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে।

ভক্ষণে নিযুক্ত···রাজা গলবস্ত্র হইয়া নগ্নপদে ভোজন-ব্যাপার স্বয়ং পরিদর্শন করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ-কর্ম্মচারিগণ চতুর্দিকে শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছিল, এমন সময়ে এক রুক্ষকেশী, জীর্ণা শীর্ণা ভিখারিণী একটি ক্ষুধাতুর শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কিছু খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিবার জন্য সেইস্থানে উপস্থিত হইল।

প্রহরিগণ হঠাৎ ভিখারিণীকে সেখানে আসিতে দেখিয়া তাহাকে 'দূর্ দূর্' করিয়া তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হইল। ক্রোড়স্থিত শিশুটি 'মা—আমায় খাবার দে না, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে'—বলিয়া ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিতে লাগিল।

ভিখারিণী প্রহারের ভয়ে গলদশ্রুলোচনে যতই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, বালক ততই কাতরকণ্ঠে—'মা আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমায় খাবার দে না' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন করিতে লাগিল। সেই কাতর চীৎকারে কাহারও হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্র উদয় হইল না। সকলেই, এমন-কি ভোজনরত বিপ্রগণ পর্যন্তও, ভিখারিণীকে 'দূর্ দূর্' করিতে লাগিলেন। ভিখারিণী বিতাড়িত হইয়া অদূরে এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইলে, সশস্ত্র প্রহরিগণ তথায় গমন করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। ভিখারিণী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ক্ষুধাতুর পুত্রের জন্য বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কিছু খাদ্য-সামগ্রী ভিক্ষা করিল।

প্রহরিগণ তখন রোষকষায়িত নেত্রে বলিয়া উঠিল: "কি পাজী মাগী, তোর এত বড় স্পর্ধা, এখনও ব্রাহ্মণভোজন শেষ হয় নাই, তুই এরই মধ্যে খাবার চাস্? এখনও বলিতেছি, তুই এস্থান হইতে দূর হ, নচেৎ এখনই তোর মস্তক ছেদন করিব।"

এই কথা শুনিয়া ভিখারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল ঃ "বাপ সকল। আমি ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বে কোন খাদ্যদ্রব্য চাই না। ব্রাহ্মণভোজনের পর যে সকল উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ফেলিয়া দেওয়া হইবে, শৃগাল-কুক্কুরের সহিত আমি তাহারই অংশ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইব। কিন্তু আমার শিশু-সন্তানটি তো জানে না যে, ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বে তাহাকে খাইতে নাই। অধিক-কি সকাল হইতেও কিছুই খাইতে পায় নাই। বাপ সকল, দয়া করিয়া আমার ছেলেটিকে কিছু খাবার দাও, নহিলে কিছুতেই আমি ইহাকে শান্ত করিতে পারিতেছি না।"

ভিখারিণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যমদূতাকৃতি জনৈক প্রহরী শিশুর হস্ত ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল ঃ "এই তোর ছেলেকে চিরকালের জন্য শান্ত করিয়া দিতেছি।"

এই আকস্মিক ব্যাপারে শিশুটি প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং অসহায় মাতার আর্তনাদে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল।

রাজার দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। 'কি হইয়াছে' বলিয়া রাজা গুরুগম্ভীর স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রহরী একটি বালকের হস্ত ধরিয়া আছাড় মারিতে যাইতেছে, তাহা দূর হইতে দেখিয়া রাজা অতি তীব্রকণ্ঠে আদেশ করিলেন ঃ "স্থির হও, বালকের হস্ত পরিত্যাগ কর।"

রাজার রুষ্ট কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া প্রহরী বালকের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইল। বালক প্রাণভয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিতা মাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইল।

রাজা দ্রুতগতিতে ভিখারিণীর নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "মা, তোমার কি হইয়াছে ? তোমার বালককে এই প্রহরী ধরিয়াছিল কেন ?"

ভিখারিণী রাজার পদতলে লুণ্ঠিতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল ঃ "মহারাজ ! আমি ও আমার পুত্র ঘোর অপরাধী। দুরন্ত শিশু ক্ষুধার জ্বালায় আমার নিকট খাবার চাহিতেছিল, আমি মায়ায় অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের অগ্রেই কিছু খাদ্য-ভিক্ষা করিয়াছিলাম। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আপনি ! এরূপ কুকার্য আর কখনও করিব না। ধর্মাবতার ! আপনি আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়া এই অনাথ বালকের প্রাণ-ভিক্ষা দিন। আমি আমার অঞ্চলের নিধিকে লইয়া দূরদেশে এখনই পলায়ন করিতেছি।"

রাজা ভিখারিণীর এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আর ধৈর্য ধারণ করিতে পরিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অজস্র বারিধারা বহিতে লাগিল, কি যেন এক অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হইল, দেহ-মন অবসন্ন হইয়া আসিল। রাজা ভূমির উপর বসিয়া পড়িলেন। পার্শ্বচরগণ রাজার এই অচিন্তিত অবস্থা দেখিয়া ত্রস্তভাবে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। রাজা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে সাবেগে অনাথবালককে স্বীয় বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখ-চুম্বন করিলেন এবং ভিখারিণীকে বাষ্পাকুল-লোচনে বলিতে লাগিলেন ঃ "মা গো ! তোর কিছু অপরাধ নাই, আমারই অপরাধ হইয়াছে। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা কর্ ! যাহারা অন্নহারা, সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। চল্

মা, আমার ভাণ্ডারে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত আছে, তন্মধ্যে তোর পুত্র যাহা কিছু খাইতে চায়, তাহা তুই নিজহস্তে তাহার মুখে তুলিয়া দিয়া হৃদয়ের দুঃখ দূর কর্; নচেৎ কিছুতেই আমি শান্তি-লাভ করিতে পরিতেছি না।”—এই বলিয়া রাজা ভিখারিণী-পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন—ভিখারিণী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় রাজার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

ভাণ্ডারে উপনীত হইয়া রাজা বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন, এবং ভাণ্ডারীকে বলিয়া দিলেনঃ “এই বালক ও বালকের মাতা যে-সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবে, তুমি তদ্দণ্ডে ইহাদিগকে প্রদান করিবে।” …তৎপরে ভিখারিণী ও তাহার পুত্র উদর পূর্ণ করিয়া নানা সুখাদ্য আহার করিল এবং প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া সানন্দে গৃহে গমন করিল।

রাজা তৎক্ষণাৎ কর্মচারিগণকে নির্দেশ দিলেন যে, যাহারা দীন-হীন সকলের নীচে পড়িয়া আছে—তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া ভূরিভোজনে যেন তৃপ্ত করা হয়। তাঁহার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইল, দীন-দরিদ্রের মুখে হাসি দেখিয়া তাঁহার ক্ষুব্ধ মনে শান্তি ফিরিয়া আসিল। রাজা রুদ্রনারায়ণের হৃদয় যে কত উন্নত, কত মমতাপূর্ণ ও কত পরার্থপর, ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি প্রজাগণের ভক্তি ও বিশ্বস্ততা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

ব্রাহ্মণভোজনাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। কোলাহলপূর্ণ নাটমন্দির নিস্তব্ধ হইয়াছে। দিনমণি পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দুই-একজন প্রহরী ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাজা একাকী মন্দির-দ্বারে উপবিষ্ট। রাজার গাম্ভীর্যপূর্ণ সুন্দর মুখমণ্ডলে যেন এক গুরুতর চিন্তার রেখাপাত হইয়াছে। অন্যমনা হইয়া তিনি যেন কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন, কে যেন জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছে: "রাজন্, চিন্তিত হইবেন না! আপনার বংশ লোপ হইবে না, কীর্তিমান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার বংশ উজ্জ্বল করিবে।'—এই বাক্য রাজার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল। তিনি চকিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে আপাদলম্বি-জটাজূট-মণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘায়ত-বপু, রুদ্রাক্ষমালা-বিভূষিত-কণ্ঠ, শান্তোজ্জ্বল-বদনমণ্ডল, প্রদীপ্ত-চক্ষু, ত্রিশূলপাণি, পরিহিতরক্তবস্ত্র এক সন্ন্যাসী-মূর্তি। রাজা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া সমাগত মহাপুরুষের পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিলেন। সন্ন্যাসী সস্নেহে রাজার হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন।

পাদ্য-অর্ঘ্য প্রদানান্তর সন্ন্যাসীর পাদ-বন্দনা করিয়া রাজা তাঁহাকে ব্যাঘ্রচর্মাসনে উপবিষ্ট করাইলেন, এবং বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মহাত্মন্! আমি এখনই যে আশীর্বাদ-বাণী শ্রবণ করিলাম, তাহা, বোধ হয়, আপনারই শ্রীমুখনিঃসৃত! কিন্তু আমি ও আমার জায়া উভয়েই তো প্রায় বার্ধক্যদশায় উপনীত হইলাম, এতকাল পরে সন্তানোৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হইতে

পারে ? তবে আপনি বাক্‌সিদ্ধ, আপনার আশীর্বাদে অসম্ভবও সম্ভব হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার হৃদয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে, আপনি অধীনের গৃহে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া অধীনকে চরিতার্থ করেন।”

সন্ন্যাসী সহাস্যবদনে বলিলেন : “রাজন, আপনি ধন্য ! আপনার অমৃতোপম খাদ্য আজ বিশ্বপতি নিজে গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। আজ আপনি প্রকৃত ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়াছেন। দরিদ্রের মুখেই ভগবান আহার করিয়া থাকেন। রাজন্! আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না। অপেক্ষা করিবার আমার অধিক সময় নাই। দুই-একটি কথা বলিবার জন্যই আমি আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।...

—আপনার বর্তমান পত্নীর গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হইবে না। আপনি দ্বিতীয় দারগ্রহণ করুন। সেই স্ত্রীর গর্ভে আপনার কুলপাবন পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। আপনার রাজ্যাধিকার মধ্যেই কোন তেজস্বি-ব্রাহ্মণবংশে আপনার উপযুক্তা নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মহাশক্তিশালিনী রমণী। সেই রমণীরত্ন লাভ করিয়া সফলমনোরথ হউন।”

সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়াই রাজসকাশ হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। নানাপ্রকার চিন্তাতরঙ্গে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। যদিও তাঁহার হৃদয়ে একটি পুত্র-লাভের বাসনা বলবতী ছিল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দারগ্রহণে তিনি অত্যন্ত

অনিচ্ছুক ছিলেন। সন্ন্যাসীর আদেশক্রমে কার্য করিবেন কি না, তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনোমধ্যে নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; কিন্তু কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। চিন্তাকুলিত রাজা বিনিদ্র রজনী যাপন করিলেন। অতঃপর পণ্ডিতাগ্রগণ্য, মহাশক্তির উপাসক, প্রধান-পরামর্শ-দাতা গুরুদেব হরিদেব ভট্টাচার্যের উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া গুরুর আবাসভূমি দেবীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সূর্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইয়াছেন। বিহঙ্গগণ বৃক্ষ-শাখে সুখাসীন হইয়া সন্ধ্যার আগমনগীতি গান করিতেছে। কুলবধূগণ গৃহপ্রাঙ্গণ সম্মার্জিত ও গঙ্গাজলে পবিত্রীকৃত করিয়া সন্ধ্যাদেবীর সংবর্ধনাহেতু দীপদান ও শঙ্খধ্বনি করিতেছে। সন্ধ্যাদেবী অসংখ্য হীরকখচিত তিমিরবসন পরিধান করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। দেবালয়ে ব্রাহ্মণগণ তারস্বরে সুমধুর স্তবপাঠ করিতেছেন। আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝরের শব্দে গ্রামসকল আনন্দশব্দ-পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

সেই সন্ধ্যা-লগ্নে রাজা রুদ্রনারায়ণ অশ্বারোহণে দেবীপুরে উপস্থিত হইলেন। কাটশাঁকড়া হইতে দেবীপুর ন্যূনাধিক তিন ক্রোশ, এই পথ অতিক্রম করিতে রাজার প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগিল। রাজা দেবীপুর গ্রামে প্রবেশ করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে গুরুগৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। রাজা যখন গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন

গুরুদেব সন্ধ্যাবন্দনায় নিযুক্ত। রাজাও দেবমন্দিরে গমন করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিলেন এবং তৎপরে গুরুদেবের পাদপদ্ম অর্চনা করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত হইলে গুরুদেব অসময়ে রাজার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা সন্ন্যাসীর সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণনা করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

গুরুদেব রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন: "বৎস! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। সন্ন্যাসীর অমোঘ আশীর্বাদে তুমি নিশ্চয়ই পুত্ররত্ন লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সন্ন্যাসীর যেরূপ মূর্তি বর্ণনা করিলে, তাহাতে জ্ঞান হয়, নিশ্চয়ই তিনি একজন মহাপুরুষ। তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিয়া তোমাকে অবশ্যই দ্বিতীয় দারগ্রহণ করিতে হইবে। তুমি কালবিলম্ব না করিয়া পুনর্বার বিবাহ করিতে কৃতনিশ্চয় হও। এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হইবার নহে।"

গুরুদেবের এই অভিমত শ্রবণ করিয়া রাজা অতি নম্রভাবে বলিলেন: "ভগবন্! এই বয়সে আবার আমাকে সংসার-জালে আবদ্ধ হইতে আদেশ করিতেছেন কেন? আমি তো রূপবতী ও গুণবতী ভার্যা লাভ করিয়া যথেষ্ট সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি। সে সুখভোগে আমার মন আর ধাবিত নহে। আমি আর নশ্বর সুখ চাহি না, গুরুদেব! আমি আর রাজ্য চাহি না, ধন চাহি না পার্থিব সুখের জন্য আমি লালায়িত নহি। ভগবন্! আমি সেই সুখ চাই, যে-সুখের ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই; সেই

সুখের জন্য আমার চিত্ত সদা উন্মুখ, যে-সুখভোগে কখনও অবসাদ আসে না, যে-সুখস্রোতে ভাসমান হইলে ত্রিতাপ চিরতরে দূরে পলায়ন করে। যতদিন না আমি সেই আনন্দ লাভ করিতে পারি, ততদিন চিরানন্দময়ীর অভয়চরণ-যুগল হৃদয়ে রাখিয়া প্রতিনিয়ত ধ্যান করিব, ইহাই আমার একান্ত বাসনা।”

রাজার দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহে অনিচ্ছা ও ভোগের মানুষের অন্তস্তলে ত্যাগের মানুষটিকে দেখিয়া গুরুদেব শান্তস্বরে বলিলেন: “বৎস! তুমি অপুত্রক। পুত্রের জন্যই লোকে ভার্যা-গ্রহণ করে—ইন্দ্রিয়সুখের জন্য নহে। সুখভোগ করিবার জন্য তোমাকে পুনর্বার বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতেছি না। সন্ন্যাসীর আশীর্বাদক্রমে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হইলে, আমাদের শাস্ত্রমতে তুমি পুন্নামনরক হইতে রক্ষা পাইবে এবং পিতৃঋণ পরিশোধ হইবে। তুমি সংসারাশ্রমী রাজা। রাজ্যের মঙ্গল-চিন্তা তোমার অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্যের অনুরোধে তুমি অচিরে দ্বিতীয় দার-গ্রহণ কর, অন্যথা করিয়ো না। মহর্ষিগণও পুত্রোৎপত্তির জন্য দার-গ্রহণ করিতেন। ইহাতে সংসারীর অবশ্য কর্তব্য প্রতিপালিত হয়, অধর্ম হয় না। বংশধারা রক্ষা করাই সৃষ্টির সাধনা।”

গুরুদেবের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্যে রাজা পুনর্বার বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন এবং গুরুচরণে প্রণিপাত পূর্বক প্রাসাদাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

রাণী
ভবশঙ্করী

অপূর্ব কিশোরী

পেঁড়োর গড়ের অনতিদূরে দীননাথ চৌধুরী নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণ পেঁড়োদুর্গাধিপের অধীনে একজন নায়ক বা সর্দার ছিলেন। দীননাথ ছিলেন দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ। তিনি অশ্বারোহণে ও অস্ত্রশস্ত্রচালনায় এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ রণ-কুশল বীরপুরুষ বঙ্গদেশে অতি অল্পই বর্তমান ছিল। তাঁহার রাজদত্ত সুবিস্তৃত জায়গীর ছিল। তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকেই যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত হইতে তিনি বাধ্য করিতেন। তাঁহার অধীনে সহস্রাধিক যোদ্ধা থাকায় তিনি রাজ্য-মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-রূপে পরিগণিত হইতেন। সংসারে তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল।

এই কন্যাই আমাদের বীরা রাণী ভবশঙ্করী। দীননাথের পত্নী পুত্রটিকে প্রসব করিয়াই ইহলীলা সংবরণ করেন। সুতরাং দীননাথ শিশুপুত্রের লালনপালনের ভার এক বিশ্বস্ত ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

কন্যাটি মাতৃবিয়োগের পর হইতে পিতার এতই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল যে, সর্বদাই সে পিতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। দীননাথ যে-স্থানে গমন করিতেন, কন্যা ভবশঙ্করীকে অশ্বের উপর স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া সেই স্থানেই লইয়া যাইতেন। তিনি কন্যাকে সর্বদা পুরুষোচিত যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত রাখিতেন এবং অস্ত্রশস্ত্র-চালনায় শিক্ষিত করিতেন।

এইরূপে ভবশঙ্করী বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যে যেরূপ মনোহারিণী, যুদ্ধ-বিদ্যাতেও সেইরূপ পারদর্শিনী হইয়া উঠিলেন। দীননাথ কন্যাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন, এক দণ্ডও চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিতেন না; সেইজন্য বাল্যাবস্থায় তাঁহার বিবাহ-কথা একেবারে মনেই স্থান দেন নাই। লাবণ্যময়ী কন্যার যৌবনের ·প্রথম-উন্মেষে দীননাথ তাহার বিবাহের জন্য একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ভবশঙ্করী নানা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এত উচ্চাভিলাষিণী হইয়াছিলেন যে, সাধারণ লোকের অঙ্কশায়িনী হওয়া অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করিতেন। তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, যদি কখনও উপযুক্ত পতি-লাভ হয়—তবেই বিবাহ করিবেন, নতুবা আজন্ম কুমারী থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন।

পিতা যখন তাঁহার বিবাহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি কোনও প্রকারে তাঁহার এই মত পিতার গোচরে আনয়ন করেন। দীননাথেরও প্রাণে একান্ত বাসনা যে, এরূপ সর্বসদ্‌গুণ-বিভূষিতা সৌন্দর্যময়ী কন্যা রাজবংশীয় কোন বীরপুরুষের হস্তে অর্পণ করেন। সেইজন্য তিনি কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করিলেন না। কন্যার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, দীননাথ ততই তাঁহাকে নানা বিদ্যায় সুশিক্ষিতা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভবশঙ্করী রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতিতে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞা ও যুদ্ধ-বিদ্যায় সুনিপুণা হইয়া উঠিলেন। যৌবনে তাঁহার সুগঠিত দেহের লাবণ্যচ্ছটা তাঁহার বরবপুকে এক অপূর্ব শোভায়

উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। রক্তবস্ত্রপরিধানা এই রমণীমূর্তি যখন শূলহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিত, তখন মনে হইত যেন মানবী-রূপে মহেশমনোমোহিনী, মহাশক্তিরূপিণী, মহিষমর্দিনী দুর্গা দনুজ-দলন করিবার জন্য ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

*   *   *   *

হে বঙ্গবাসিজনগণ। একবার মনশ্চক্ষে এই বঙ্গবাসিনী বীররমণীর সুমোহন রূপ দেখিয়া জীবন সফল করুন। এমন রূপ কি আর কখনও দেখিবেন ? এমন রমণীমূর্তি কি যোদ্ধৃবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আর কখনও বঙ্গদেশে আবির্ভূতা হইবে ? যে বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি শক্তিমূর্তির উপাসনা হইয়া থাকে, সেই বঙ্গদেশে কি শক্তিরূপিণী রমণীগণ চিরকাল শক্তিহীনা অবলা হইয়াই থাকিবেন ? বঙ্গবাসিগণ কি আর কখনও তাঁহাদিগকে মহাশক্তির অংশভূতা ও বরাভয়দাত্রী রূপে নিরীক্ষণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার অবসর পাইবে না ? তাহারা চিরকালই কি মৃন্ময়ী শক্তিমূর্তির উপাসনা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিবে ? চিন্ময়ীর উপলব্ধি হইবে না ? হিন্দুশাস্ত্র নারীকে শক্তিরূপিণী বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা এই শক্তিরূপিণী রমণীগণকে বিলাসিনী করিয়া তুলিয়াছি। আমরা শক্তির প্রকৃত উপাসনা না করিয়া, কার্যতঃ ইহাকে পদদলিত করিয়া আসিতেছি, শাস্ত্রের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমরা প্রমাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কাজেই আমাদের মহাশক্তিরূপিণী নারীগণ আজ শক্তিহীনা। আমরা জীবন্তে মৃত।

প্রথম দর্শন

ব্রাহ্মণরাজগণের রাজ্যকালেও দামোদর নদের শাখা রোণের তটভূমি ঘন অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। এই অরণ্যে বন্যবরাহ, বন্যমহিষ, হরিণ প্রভৃতি পশুগণ অবাধে বিচরণ করিত। এক দিবস ভবশঙ্করী এক বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া বর্শা-হস্তে অরণ্যের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটি হরিণ বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিতেছে। হরিণটিকে দেখিয়া বীরাঙ্গনা সেই দিকে অশ্বচালনা করিলেন।

তুরঙ্গের ক্ষুরোত্থধ্বনিতে মৃগ চমকিত হইয়া প্রাণভয়ে পলায়নপর হইল। ভবশঙ্করীও হরিণকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বগমনের দড়্‌বড়্‌ শব্দে বনের পশুগণ ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পক্ষিগণ নিশ্চিন্ত মনে বৃক্ষশাখে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা এই শব্দে ভীত হইয়া আকাশে উড়িতে উড়িতে কলরব করিতে লাগিল; দুর্বল বন্য-প্রাণিগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

কুমারী যখন মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে নদী-খাতের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন মৃগটি তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া পড়ায় তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বর্শা নিক্ষেপ করিলেন। অব্যর্থ সন্ধানে মৃগ আহত হইল। ভবশঙ্করী মৃগের নিকটে গমন করিয়া বর্শাটি তাহার দেহ হইতে উত্তোলন করিয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তিন-

চারিটা প্রকাণ্ড বন্যমহিষ নদীর জল হইতে উঠিয়া অতি রোষভরে গ্রীবা বক্র করিয়া তাঁহার অশ্বকে আক্রমণ করিবার জন্য বেগে অগ্রসর হইতেছে।

ইহা দেখিয়া কুমারী প্রথমে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া পলায়ন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু ক্ষণপরেই তাঁহার বীর-হৃদয় হইতে ভয় দূরীভূত হইল। তিনি দৃঢ়হস্তে বর্শা ধারণ করিয়া এরূপ তেজের সহিত সর্বাগ্রবর্তী মহিষটির প্রতি ইহা নিক্ষেপ করিলেন যে, বিপুল বলশালী মহাকায় পশু ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ ভূমিশায়ী হইল। ভবশঙ্করী অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত তাহার শরীর হইতে বর্শা উত্তোলন করিয়া লইলেন, এবং এরূপ দক্ষতার সহিত অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন যে, দুর্দান্ত ক্রুদ্ধ পশুগণ তাঁহার অশ্বকে কিছুতেই আঘাত করিতে সমর্থ হইল না। একে একে তিনি মহিষগুলিকে কৌশলের সহিত নিহত করিয়া, শেষ মহিষটির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার সুবর্ণ-বর্ণ-গণ্ডিত ললাটতলে মুক্তাফল-সদৃশ ঘর্মবিন্দুসকল শোভা পাইতে লাগিল, মদনচাপ-সদৃশ মনোহর ভ্রূযুগ কুঞ্চিত হইল, রোষে চক্ষুর্দ্বয় রক্তিমাভা ধারণ করিল। তিনি এক হস্তে অশ্বের রশ্মি আকর্ষণ করতঃ অশ্ব হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়া, অন্য হস্তে বর্শা লইয়া সেই উন্মত্ত পশুর গ্রীবা ছিন্নভিন্ন করিলেন।

রাজা রুদ্রনারায়ণ এক দ্রুতগামী ছিপে আরোহণ করিয়া নদীপথে কাটশাঁকড়া শিবমন্দির অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। যে সময়ে ভবশঙ্করী ক্রোধোন্মত্ত মহিষের গ্রীবাদেশ বর্শা দ্বারা

বিদ্ধ করিয়াছেন, ঠিক সেই সময়ে রাজার তরণী কিয়দ্দূরে দৃষ্ট হইল। রাজা দূর হইতে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তদভিমুখে শীঘ্র তরি-চালনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র তরণী বায়ুবেগে তট-নিকটে আনীত হইল। রাজা একলম্ফে তীরে অবতরণ করিলেন এবং মহা-শক্তিশালিনী যুবতী রমণীর অসামান্য বীরত্ব দেখিয়া বিস্ময়াভি-ভূত অবস্থায় বিমুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ সেই সুন্দরী কামিনীর রোষ-বিস্ফারিত নয়নযুগল এবং গর্বোদ্দীপ্ত আরক্তিম মনোহর বদনমণ্ডলের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

ক্ষণপরেই রাজা স্বীয় মানসিক দুর্বলতায় লজ্জিত হইয়া আত্মসংবরণ করিলেন, এবং স্নেহপূর্ণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"তরুণি! তুমি কে? তোমাকে দেখিয়া উচ্চ-বংশোদ্ভবা বলিয়া অনুমান হয়—কিন্তু"...

রাজার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ভবশঙ্করী কহিলেন: "আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। মনে হয় না যে, ইহাই আপনার প্রশ্নের বিষয়। আপনার মনে একটা কৌতূহল জাগিয়াছে—বুঝিয়াছি। কিন্তু কেন?"

তরুণীর সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ সরল আচরণে রাজার সমস্ত দ্বিধা সরিয়া গেল। তিনি সহজসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন: "তুমি কি-জন্য এই গহন অরণ্যে একাকিনী এই অসমসাহসিক কার্যে নিযুক্তা হইয়াছ? তোমার অশ্বারোহণ-দক্ষতা ও অস্ত্র-চালনা দেখিলে বোধ হয়—তুমি যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণা। তোমার জন্মভূমি কোথায়? তুমি কি ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবা?"

রাজার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ভবশঙ্করী নির্বাক্ হইয়া নিজ অশ্বপৃষ্ঠে স্থিরভাবে উপবিষ্টা রহিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইল, যেন তিনি একজন অপরিচিত পুরুষের এই সকল প্রশ্নে অসন্তুষ্টা হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নকারীর রাজোচিত পরিচ্ছদ দেখিয়া, তাঁহার কথার কি উত্তর দিবেন, তাহাই তিনি চিন্তা করিতেছিলেন।

রাজা স্বীয় প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় বলিলেন: 'বুঝিয়াছি, তুমি আমার কথার উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছ। আমার এই অনধিকারচর্চায়, বোধ করি, তুমি মনে মনে কিছু বিরক্তও হইয়া থাকিবে। জানি, বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকগণ অপরিচিত কোন পুরুষের সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিতা হয়, কিন্তু ইহাও জানি যে, তাহারা মহাবিপৎপাতের সম্ভাবনা ব্যতিরেকে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে কখনও লোকলোচনের সম্মুখীন হয় না।"

রাজার এই কথায় ভবশঙ্করী আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি ধীরকোমলস্বরে শির অবনত করিয়া উত্তর দিলেন: "তিন-চারি বৎসর পূর্বে আমি একবার আমাদের রাজাকে কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে দর্শন করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে—আপনিই আমাদের রাজা। আমি অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় ছিলাম, তাই আপনাকে প্রথম দৃষ্টিতে চিনিতে পারি নাই। তজ্জন্য আপনার কথায় আমি একটু অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই হেতু যুক্তকরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, দয়া করিয়া প্রগল্ভা নারীর সমস্ত অপরাধ মার্জনা

করুন। সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিয়া চলিয়া যাইব, আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না।”

ভবশঙ্করী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া কি যেন ভাবিলেন, কিন্তু ক্ষণপরেই ব্রীড়াবনতমুখী হইয়া পুনরায় কহিলেনঃ “মহারাজ! আমি ক্ষত্রিয়কুমারী নহি, আমি ব্রাহ্মণকন্যা। আপনার রাজ্যাধিকার-মধ্যেই আমার জন্মভূমি। আমার পিতা শ্রীযুক্ত দীননাথ চৌধুরী। অত্যন্ত স্নেহ-বশতঃ তিনি আমাকে কিঞ্চিৎ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন। অস্ত্রশস্ত্র-চালনার চর্চা রাখিবার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে মৃগয়ায় বহির্গত হই। কিন্তু একাকিনী রমণীর মৃগয়াচ্ছলে এই গহন অরণ্য-মধ্যে আগমন অত্যন্ত নির্বুদ্ধির কার্য হইয়াছে।”

এই কথা বলিয়া ভবশঙ্করী নৃপ-চরণে প্রণতা হইলেন এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সেই স্থান হইতে ত্বরিতগতিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। রাজা রুদ্রনারায়ণের দৃষ্টির উপর যেন একবার বিদ্যুৎ চমক হানিয়া অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ভবশঙ্করী চলিয়া যাইবার পরও কিছুক্ষণ রাজা চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া রহিলেন। ভবশঙ্করীর সুগঠিত মনোরম দেহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে একটু হেলিয়া পড়িয়াছে এবং বীরনারী সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত ও প্রবালগঞ্জিত অধর মুক্তোজ্জ্বল দন্তপাতি দ্বারা দংশন করিয়া করিকরসুদৃঢ়হস্তে রোষবক্রগ্রীব মহিষকে সুতীক্ষ্ণ বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, এই দৃশ্য রাজার মানসপটে তখনও চিত্রিত ছিল।

রাজা ভাবিতে লাগিলেন—দেবগণশক্তিসমুদ্ভবা দশভুজা

বুঝি নব অবতাররূপে আবার অসুরনিধনকারণ ভূলোকে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এইরূপ তন্ময়চিত্তে ভবশঙ্করীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কিছুক্ষণের জন্য যেন তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল। কিঞ্চিৎ পরে আত্মসংবিৎ ফিরিয়া আসিলে, রাজা পুনরায় নৌকারোহণ করিলেন। নৌকা কাটশাঁকড়া অভিমুখে ছুটিল।

R

মিলন-দৌত্য

কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে রাজবাঞ্ছিত দেবদেবের সায়ন্তন পূজারতির সবিশেষ আয়োজন পূর্বাহ্ণ হইতেই চলিতেছিল। রাজার আগমনের পূর্বেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইল। যথাসময়ে রাজা শিবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেবমূর্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন, এবং চিত্ত স্থির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু পরমসুন্দরী বীরা নারীর চিন্তা কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইল না। অনন্তর রাজা সেই তেজস্বিনী রূপলাবণ্যবতী তরুণীর বিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য দীননাথ চৌধুরীর নিকট এক দূত প্রেরণ ক'রলেন। তিনি দূতকে এই কথা বলিয়া দিলেন যে, রাজা রুদ্রনারায়ণ কোন বিশেষ প্রয়োজন-বশতঃ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। যত শীঘ্র সম্ভব তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।

দূত প্রভঞ্জনগতি তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া দীননাথের গৃহাভিমুখে ছুটিলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষীর দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন যে, রাজা রুদ্রনারায়ণের নিকট হইতে একজন দূত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

দীননাথ দ্বাররক্ষীর মুখে এই সংবাদ শুনিবামাত্র শশব্যস্তে বহির্বাটীতে আগমন করিয়া দূতের সাদরসম্ভাষণ

করিলেন এবং রাজার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ অবগত হইতে সমুৎসুক হইলেন।

দূত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন: "হে বঙ্গবীরচূড়ামণি! রাজার চিন্তাক্লিষ্ট বদনমণ্ডল দেখিয়া ও কথাবার্তা শুনিয়া আমি অনুমান করিতেছি, অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন কার্যের জন্য তিনি আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ, তিনি শিবমন্দিরে উপস্থিত হইবার অল্প পরেই আমাকে এই বলিয়া আপনার নিকট পাঠাইলেন যে, আপনি যতশীঘ্র সম্ভব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করুন।"

বীরপুঙ্গব দীননাথ দূত-মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সসম্মানে বলিলেন: "আপনি অবিলম্বে রাজসকাশে গমন করিয়া তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন যে, অধীন দীননাথ যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে নৃপাদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিবে।"

অনন্তর দীননাথ দূতকে বিদায় দিয়া সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিলেন এবং রণবেশে সজ্জিত হইয়া দুই জন শরীররক্ষক অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে কাটশাঁকড়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই দীননাথ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

রাজা সসম্ভ্রমে দীননাথের হস্তধারণপূর্বক স্বীয় দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে উপবিষ্ট করাইলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া যথেষ্ট আপ্যায়িত করিলেন।

রাজ্য-সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কথাবার্তার পর, রাজা দীননাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "বীরবর, অদ্য এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া আমি অতি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি এবং সেই কৌতূহল-নিবারণের জন্যই আমি আপনাকে আহ্বান করিয়াছি।"

রাজার বাক্য শ্রবণ করিরা দীননাথ সবিনয়ে বলিলেন : "কি দৃশ্য দেখিয়া আপনি এত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছেন, দয়া করিয়া আমার নিকট তাহা বর্ণনা করুন ; আমি যথাশক্তি আপনার কৌতূহল-নিবারণের চেষ্টা করিব।"

রাজা বলিতে লাগিলেন : "আজিকে অপরাহ্নে আমি যখন নৌকাযোগে কাটশাঁকড়া অভিমুখে আসিতেছিলাম, তখন কিয়দ্দুর হইতে দেখিতে পাইলাম—কুল্-আকাশের নিকটবর্তী নদীতটে এক বীরাঙ্গনা রণরঙ্গিণী-মূর্তিতে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া বর্শা-প্রহারে এক বিপুলকায় ভীষণ বন্যমহিষ বধ করিতেছে। এই অভিনব দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেইদিকে দ্রুতবেগে নৌকা চালাইতে বলিলাম। নৌকা সেই স্থানের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, আমি লম্ফপ্রদান করিয়া তটে অবতরণ করিলাম এবং সেই তরুণীর নিকটে গমন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তরুণী সলজ্জভাবে অল্প কথায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া অশ্বে কশাঘাত করিল এবং মুহূর্তমধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার কন্যাই কি অস্ত্রশস্ত্র-প্রয়োগে এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছে, আর শিকার করাই কি তাহার প্রিয় খেলা ?"

দীননাথ বিনীতভাবে রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন : "তরুণী

আপনার প্রশ্নের উত্তরে কি আত্মপরিচয় দিয়াছে, শুনিলে বুঝিতে পারি, সে আমার কন্যা কি-না !”

রাজা বলিলেন: “সেই তরুণী আপনার কন্যা বলিয়াই পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, অপনার কন্যা যুদ্ধবিদ্যায় এতাদৃশ দক্ষতা লাভ করিল কি প্রকারে ? আর ইহাও আমার জানিতে কৌতূহল—যুবতী কন্যাকে শ্বশুরালয়ে না রাখিয়া নিজের বাটীতেই-বা রাখিয়াছেন কেন ?”

দীননাথ কহিলেন: “মহারাজ ! আমার বক্তব্য শুনিলে আপনার সমস্তই বোধগম্য হইবে। একটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া আমার পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। স্ত্রী-বিয়োগসময়ে পুত্রটি অত্যন্ত শিশু ছিল, সুতরাং তাহার লালনপালনের ভার ধাত্রীর হস্তেই অর্পণ করি। কিন্তু সেই সময়ে কন্যাটির জ্ঞানোদয় হইয়াছিল। মাতৃবিয়োগের পর হইতে সে আমার এত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল যে, তিলেকের জন্যও আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। কাজেই, আমি যেখানে যাইতাম সেখানেই তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া লইয়া যাইতাম। এইরূপে কন্যা অশ্বারোহণে পটুতা লাভ করিল। আমি যখন সৈন্যগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইতাম, তখন কন্যাও অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করিত। অল্পবয়সে তাহার অস্ত্র-শস্ত্র প্রয়োগে নিপুণতা দেখিয়া আমি অতি যত্ন-সহকারে তাহাকে যুদ্ধবিদ্যায় যথাশক্তি শিক্ষিতা করিয়াছি, এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সাহায্যে তাহাকে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি ও গণিতবিদ্যায় সুশিক্ষা দান করিয়াছি। মহারাজ !

উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আমি কন্যার এ-পর্যন্ত বিবাহ দিই নাই, এবং আমার কন্যাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি যদি তাহাকে অসি-চালনায় পরাস্ত করিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তিকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে, নচেৎ আজীবন কুমারী থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। কিন্তু ব্রাহ্মণবংশে এরূপ পাত্র পাওয়া সুদুর্লভ, সেইজন্য যুবতী কন্যাকে কুমারী-অবস্থায় নিজগৃহে রাখিতে বাধ্য হইয়াছি।"

দীননাথের এই কথা শুনিয়া রাজা মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন: "যুবতী কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখা শাস্ত্র-বিগর্হিত।"

রাজার এই বাক্যে দীননাথ উত্তর করিলেন: "কেন মহারাজ! মনু তো বলিয়া গিয়াছেন যে, কন্যার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুপযুক্ত পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য নহে। এতদ্ভিন্ন কন্যা নিজেই সাধারণ পুরুষকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে একেবারেই অস্বীকৃতা। এরূপ অবস্থায় তাহার বিবাহ না দেওয়া কিরূপে শাস্ত্র-বিগর্হিত হইতে পারে?"

এই কথা শুনিয়া রাজা সস্মিতমুখে বলিলেন: "ইহাতে আপনার কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না বটে। আমি আপনার কন্যার উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করিতেছি। শীঘ্রই আপনি সংবাদ পাইবেন। এক্ষণে রাত্রি অধিক হইয়াছে, আপনি গৃহে গমন করিতে পারেন।"

অনন্তর দীননাথ রাজাকে যথোচিত অভিবাদন করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন, এবং কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে রাজার পাত্র-অন্বেষণের কথা লইয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৪

মিলন-তত্ত্ব

রাজা রুদ্রনারায়ণ ভবানীপুরে প্রত্যাগত হইয়া বিদ্যাবতী বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করীকেই পরিণয়ের উপযুক্তা পাত্রী বিবেচনা করিলেন। কিন্তু তেজস্বিনী রমণী তাঁহাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে কি-না, তদ্বিষয়ে নানা চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার শরীরে যৌবনোচিত যথেষ্ট শক্তি থাকিলেও, তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছে এবং রাজা হইয়া একজন সর্দারের কন্যার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াও অত্যন্ত অপমানের কথা। মহাশক্তিশালিনী রণরঙ্গিনী যুবতী সামান্যা নারী নহে। ইহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলে আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। কিন্তু যুবতী পণ করিয়াছে, যে-ব্যক্তি তাহাকে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে, সে তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবে। এরূপ সর্ত মানিয়া লইয়া কি প্রকারে বিবাহের প্রস্তাব করা যাইতে পারে?

রাজা এবংবিধ নানা চিন্তা করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া দীক্ষাদাতা গুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

পণ্ডিতকুলচূড়া সর্বজন-সম্মানিত হরিদেব রাজাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন: "তোমার এ-বিষয়ে চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই। আমি স্বয়ং দীননাথ ও তাঁহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া, যাহাতে তাঁহারা এই বিবাহে সম্মত হন, তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। দীননাথের কন্যার সহিত তোমাকে অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে না।”

গুরুদেব রাজাকে আশান্বিত করিয়া এক দিবস দীননাথের ভবনে গমন করিলেন। দীননাথ রাজগুরু বশিষ্ঠকল্প হরিদেবকে স্বীয় ভবনে আগত দেখিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া তাঁহার পূজা করণান্তর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

হরিদেব দীননাথকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন: “হে বীরকুলকেশরী! আমি শুনিয়াছি, তোমার একটি পরম-রূপলাবণ্যবতী, অশেষগুণশালিনী, যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিনী অনূঢ়া কন্যা আছে। কন্যার বিবাহকাল অতীত হইলেও উপযুক্ত পাত্রাভাবে তাহার পরিণয়কার্য সম্পন্ন করিতে পার নাই। আমার এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তোমার শক্তিময়ী কন্যা রূপে ও গুণে অদ্বিতীয়া এবং কোন পরাক্রান্ত রাজার অর্ধাঙ্গিনী হইবার উপযুক্তা। আমাদের রাজা রুদ্রনারায়ণও এক মহাপুরুষের আদেশক্রমে পুত্রলাভেচ্ছায় দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। অতএব এই আশাতীত সুযোগ পরিত্যাগ করা কিছুতেই তোমার কর্তব্য নহে। আর আমি অবগত হইয়াছি যে, রাজা স্বয়ং তোমার রূপবতী কন্যার সৌন্দর্য ও শৌর্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। এক্ষণে এই বিবাহ-কার্যে তোমার মত জিজ্ঞাসা করি।”

এই কথা শুনিয়া দীননাথ উত্তর করিলেন: "মহারাজ রুদ্রনারায়ণ যদি এ অধীনের কন্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমার কন্যার ভাগ্যে এরূপ সুখোদয় হইবে, তাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। কিন্তু কন্যা আমার সাবালিকা ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। আমি তাহাকে আপনার সম্মুখে আনাইতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনি একবার এই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার মত জিজ্ঞাসা করুন।"

এই বলিয়া দীননাথ কন্যা ভবশঙ্করীকে রাজগুরু হরিদেবের সমক্ষে আনয়ন করিলেন। ভবশঙ্করী ধীরপদবিক্ষেপে মহাপণ্ডিত বর্ষীয়ান্ গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভক্তিভরে তাঁহার চরণযুগল অর্চনা করিলেন। হরিদেব কন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন: "মা, তুমি বহুগুণে বিভূষিতা হইয়া রমণী-গণের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছ। আশা করি, তোমার দ্বারা বঙ্গদেশের মহোপকার সাধিত হইবে। রাজা রুদ্রনারায়ণ পুত্রার্থে দ্বিতীয়বার দার-গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন। তুমি তাঁহার সহধর্মিণী হইয়া আমাদের আশা পূর্ণ কর।"

ভবশঙ্করী ব্রাহ্মণের এই প্রিয়বচনে ব্রীড়াবিনম্রবদনে বলিলেন: "মহাত্মন্! আপনার বাক্য আমার সর্বদা শিরোধার্য হইলেও, পিনাকপাণির আরাধনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে-ব্যক্তি অসিযুদ্ধে আমাকে পরাস্ত করিতে পারিবে, সেই বীর্যবান্ পুরুষসিংহকে আমি পতিত্বে বরণ করিব।"

ভবশঙ্করীর এই কথার উত্তরে ব্রাহ্মণ কহিলেন: "মা! রাজা রুদ্রনারায়ণের বীরত্ব ও রণদক্ষতা তোমার পিতার অবিদিত নাই। বোধ হয়, বঙ্গদেশে এমন কোন বীর-পুরুষ নাই, যিনি অসিযুদ্ধে রাজা রুদ্রনারায়ণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন। তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কি তাঁহার পক্ষে অপমানজনক নহে? তোমার প্রতিজ্ঞার অর্থ এই যে, অধিকতর বীর্যবান্ ও রণকুশল ব্যক্তিকে তুমি স্বামীরূপে গ্রহণ করিবে। রাজা রুদ্রনারায়ণ যে বীর্যে ও রণদক্ষতায় তোমার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। আমার স্মরণ আছে, বহুকালপূর্বে রাজবাটীতে সমরকৌশল প্রদর্শনের জন্য বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বীরগণ আমন্ত্রিত হন। সেই সময়ে সমস্ত বীর, এমন-কি তোমার পিতা পর্যন্তও রাজা রুদ্রনারায়ণের সহিত অসিযুদ্ধে পরাজিত হন। তোমার পিতা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পার।"

রাজগুরু হরিদেবের কথা শুনিয়া ভবশঙ্করী সংযতস্বরে বলিলেন: "দেব! আপনার বাক্যে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমাদের রাজা যে সমরনৈপুণ্যে বঙ্গদেশে অদ্বিতীয়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। যাহা হউক্, বিবাহের পূর্বে রাজবলহাটের রাজবল্লভী দেবীর পূজাকালে বলিদানের জন্য দুই স্থানে পাশাপাশি দুইটি করিয়া মহিষ ও তন্নিম্নে একটি করিয়া মেষ স্থাপন করা হউক্। খড়্গের এক আঘাতে রাজাও একদল পশুকে বধ করিবেন, আমিও অন্যদল পশুকে

বধ করিব। এই কার্যে তাঁহাকে আমার সহিত অসি-ধারণ করিতে হইবে না, এবং আমিও মহাশক্তির নিকট রাজার শক্তির পরিচয় লইয়া দেবীর সম্মুখেই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিব; আমার পণও রক্ষা হইবে।”

এই কথা বলিয়া বীর্যবতী বালা ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান হইতে সলজ্জভাবে প্রস্থান করিলেন।

গুরু হরিদেব যথাসময়ে ভবশঙ্করীর এই প্রস্তাব রাজার গোচরে আনিলেন। রাজার নিকট প্রস্তাবটি প্রথমে অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু সবিশেষ বিবেচনার পর ইহাতেই সম্মত হওয়া ভিন্ন কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না।

* * * *

এক শুভদিনে রাজবল্লভীদেবীর পূজার বিশেষরূপ আয়োজন হইল। আগমাচার্য রাজগুরু হরিদেব ভট্টাচার্য দেবীর পূজায় স্বয়ং ব্রতী হইলেন। সেনানায়কগণ নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। সুবিস্তৃত মন্দির-প্রাঙ্গণ ও নাটমন্দির পূজাদর্শনার্থী নরনারীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

রাজা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবীর সম্মুখে বীরাসনে যুক্তকরে উপবিষ্ট আছেন। সুললিত মন্ত্রধ্বনিতে সেই স্থান এক অপূর্ব দিব্যভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ধূপ-ধুনা ও পুষ্পের সৌরভে মন্দিরতল আমোদিত। মাঝে মাঝে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঝাঁঝর, দামামা, ভেরী, তূরী ও ঢক্কার গুরুগম্ভীর নিনাদে সমস্ত নগর আনন্দময় হইয়া উঠিতেছে। প্রায় মধ্যাহ্নকাল

উপস্থিত হইয়াছে, এমন সময়ে পূজক ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া উদ্দিষ্ট ব্যাক্তিগণকে বলিলেন ঃ "বলিদানের সময় উপস্থিত, পশুগণকে পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আন।"

এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র দশ-বারজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি পশুগণকে স্নান করাইতে লইয়া গেল ; জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট কলকলধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। প্রহরিগণ শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে লাগিল। স্নানান্তে পশুগুলিকে আনিয়া দেবীর সম্মুখে প্রাঙ্গণতলে একস্থানে দুইটি মহিষকে পাশাপাশি আবদ্ধ করা হইল এবং মহিষ দুইটির নিম্নে একটি মেষ স্থাপিত হইল ; সামান্য অন্তরে ঐরূপ আর-একদল পশুও সজ্জিত হইল।

হরিদেব উদকপূর্ণ কোশা হস্তে লইয়া পশুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে পূজা করণান্তর দেবীকে নিবেদন করিয়া দিলেন। তৎপরে রাজার নিকট গমন করিয়া পূজিত ও সিন্দুরাঙ্কিত খড়্গ তাঁহার হস্তে দিয়া তিনি আশীর্বাদ করিলেন।

রাজা গলবস্ত্র হইয়া তাঁহার পদতলে প্রণত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন ঃ "গুরুদেব! বীরবালা ভবশঙ্করী তাঁহার প্রতিজ্ঞামত এখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই, তবে আমার স্বহস্তে পশুবধ করিবার আবশ্যক কি ?"

গুরুদেব সস্নেহবচনে কহিলেন ঃ "বৎস! চিন্তিত হইয়ো না। বীরাঙ্গনা এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবেন।"

ক্ষণপরেই দূরে দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। সকলেরই দৃষ্টি তোরণদ্বারের দিকে আকৃষ্ট হইল।

দেখিতে দেখিতে এক সুন্দরী রমণী সুবৃহৎ শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া অপরূপা মূর্তিতে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ সূর্যকরে ঝলসিতে লাগিল। তাঁহার সুদৃঢ় মনোহর বপু রক্তবস্ত্রে সুশোভিত। সুন্দর ললাটতল সিন্দুরবিন্দুর দ্বারা উদ্ভাসিত। সুচিক্কণবেণী কৃষ্ণসর্পের ন্যায় পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান। ঘোর রক্তবর্ণ জবার মালা তাঁহার গলদেশে প্রলম্বিত। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন শিব-হৃদয়-নিবাসিনী মহাশক্তি মূর্তি-ধারণ করিয়া পৃথিবীর পাপ, তাপ, অত্যাচার বিনাশ করিবার জন্য আজ এই মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়াছেন। এই রুদ্ররূপিণী বীর্যবতী মনোহারিণী তরুণী রমণীকে দেখিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল।

বীরাঙ্গনা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং দেবীকে প্রণাম করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণবর্গ ও রাজার নিকট প্রণতা হইলেন। রাজগুরু হরিদেব ভবশঙ্করীকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার অসি দেবীর সম্মুখে লইয়া গিয়া পূজা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি জলদগম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন: "বলিদানের সময় উপস্থিত। উপস্থিত জনগণ সকলেই তারস্বরে মহামায়ার জয়-ঘোষণা করুন।"

গুরুদেবের মুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হইতে না হইতে, রাজা রুদ্রনারায়ণ ও বীরাঙ্গনা ভবশঙ্করী অসি-হস্তে নিজ নিজ স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। 'জয় মা' শব্দে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। সকলেই সোৎসুকনেত্রে

রাজার ও বীরা নারীর দিকে চাহিল। দুইটি অসি যুগপৎ উথিত হইল এবং অসি-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চারিটি মহিষমুণ্ড ও দুইটি মেষমুণ্ড ভূলুন্ঠিত হইল।

রমণী তৎক্ষণাৎ বলির রক্ত লইয়া রাজার ললাটে ফোঁটা দিলেন এবং স্বীয় গলদেশ হইতে জবার মালা লইয়া রাজার গলায় পরাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি দেবীকে প্রণাম করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে অশ্বে আরোহণ করিয়া কশাঘাত করিলেন। অশ্ব বিকট হ্রেষারব করিয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে বীরাঙ্গনা দৃষ্টির বহির্ভূতা হইলেন।

সকলেই অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সকলেই চিত্রাপিত মূর্তির ন্যায় স্থির। সমস্ত মন্দির-প্রাঙ্গণ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। বাতাস পর্যন্ত যেন গতিহীন। সকলেই মনে করিতে লাগিল—এই যে ব্যাপার সংঘটিত হইল, ইহা সত্য না স্বপ্ন।

রাজগুরু হরিদেব বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া দিলেন।—শুভক্ষণে রাজা রুদ্রনারায়ণ ভবশঙ্করীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

রাণী ভবশঙ্করীর জন্য গড়ের বাহিরে দামোদর-তীরে এক প্রাসাদ নির্মিত হইল। নবপরিণীতা রাণী সেই প্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাজকার্যেই তিনি রাজাকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষতঃ, সৈন্যগণ যাহাতে যুগোপযোগী যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত হয়, তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগিনী হইলেন। প্রায়ই তিনি স্বয়ং সৈন্যগণের শিক্ষা-কার্য পরিদর্শনে ব্যাপৃত থাকিতেন। কালক্রমে রাজ্যমধ্যস্থ ব্রাহ্মণেতর সমস্ত সমর্থ ব্যক্তিকেই যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষায় দেবী ভবশঙ্করী বাধ্য করিয়া তুলিলেন। রাজ্যের স্থানে স্থানে তাঁহারই উৎসাহে দুর্গ নির্মিত হইল। তারকেশ্বরের নিকটবর্তী একটি পত্তনে (পরে ছাউনাপুর নামে খ্যাত) ভূমধ্যস্থ দুর্গ-স্থাপনা তাঁহার দূরদর্শিতা প্রমাণ করিল *। এই ছাউনাপুর-দুর্গপরিখার ‡

---

* এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে সৈন্যগণের 'ছাউনি' বা সেনানিবাস ছিল বলিয়াই ইহার নাম ছাউনাপুর হইয়াছে।

‡ ব্রাহ্মণরাজগণ মন্দিরের দেবসেবা-নির্বাহের জন্য ভূ সম্পত্তি দান করেন। বিশ বৎসর পুর্বে পর্যন্ত তেঘরা-নিবাসী এক ব্রাহ্মণ এই রাজদত্ত ভূসম্পত্তির আয়ে দেবসেবা চালাইতেন। ইহার বর্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা অবিজ্ঞাত। হুগলী জেলায় এ-মন্দির এখনও বর্তমান আছে।

ছাউনাপুর ভূমধ্যস্থ দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও তদুপরি গহন অর৹ রায়বাঘিনী পৃ

বহির্দেশে রাণী ভবশঙ্করী এক দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই দেবমন্দিরের অভ্যন্তর-দেশে গুপ্তকৌশল তো ছিলই, এতদ্ভিন্ন রাজকার্যের প্রয়োজনে এই মন্দির ছিল তাঁহার সাময়িক বাসস্থান।

তৎপরে বাশুড়ী গ্রামে রাণী ভবশঙ্করী ভবানী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আরাধ্যা দেবী ছিলেন ভবানী। তিনি যখনই কোন গুরুকার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তৎপূর্বে তিনি ইষ্ট-দেবীর নিকট সকল প্রার্থনা জানাইয়া যেন তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিতেন *। রাণী প্রজাগণের উন্নতিসাধনকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। তিনি অশ্বারোহণে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং প্রজাগণের অভাব-অভিযোগ স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া সদ্যঃপ্রতিকারে তাঁহার চেষ্টার অভাব ঘটিত না। সেই সময়ে সুব্যবস্থার ফলে কৃষি, বস্ত্রবয়ন ও ধাতু-পাত্রাদি নির্মাণ-শিল্পের উন্নতি-সাধন দ্বারা প্রজাগণ সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র্য ও হীনবৃত্তি দেশ হইতে এক প্রকার বিদূরিত হইল। কৃষি ও বস্ত্রবয়নশিল্পের জন্য ভুরসুট হইল বহুপ্রসিদ্ধ।

রাজ্যের মঙ্গল-সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন বলিয়া রাণী ভবশঙ্করীকে প্রজাসাধারণ জগদ্ধাত্রীজ্ঞানে পূজা করিত।

---

* হুগলী জেলায় এই ভবানীদেবীর মন্দির আজিও বিদ্যমান। ধার্মিক-প্রবর রাখালকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভবানীদেবীর মন্দির ও ব্রাহ্মণরাজ-বংশপ্রতিষ্ঠিত সরাইমনসা দেবীর মন্দির বহুব্যয়ে সংস্কৃত করিয়া প্রাচীনকীর্তি রক্ষা করেন এবং দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও সম্মানভাজন হন।

লোকেশ্বরীর মহাশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত ভূরিশ্রেষ্ঠপুর সজীবতাপূর্ণ, প্রফুল্লতাময় আনন্দরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। সেই ভুরস্যুট এখনও আছে, কিন্তু আর সে সজীবতা নাই, আর সে প্রফুল্লতা নাই ; সকলই নির্জীব, সকলই নিরানন্দ। সেই প্রাণ-প্রাচুর্য, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও বিদ্যা বিদায় লইয়াছে। আসন আজ অনাদৃত পড়িয়া রহিয়াছে ।

অল্পকালের মধ্যেই রুদ্রনারায়ণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। রাণী ভবশঙ্করীর গর্ভে রাজা রুদ্রনারায়ণের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পুত্র-লাভ করিয়া রাজা বংশধারা অক্ষুণ্ণ হইল ভাবিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, জনপদ-কল্যাণ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে অকাতরে ভূমি ও সুবর্ণ দান করিতে লাগিলেন, এবং দরিদ্র প্রজাগণকে রজতখণ্ড ও অন্ন-বস্ত্র বিতরণে মুক্তহস্ত হইলেন। রাজ্যে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। প্রকৃতিবর্গও প্রজাবৎসল রাজার বহু-আকাঙ্ক্ষিত বংশধর জন্মগ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া মহোল্লাসে উৎফুল্ল হইল এবং নিজ নিজ সাধ্যানুসারে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল।

রাজকুমারের নামকরণ হইল প্রতাপনারায়ণ।

পট-পরিবর্তন

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মুঘলসম্রাট্ আকবর শাহ্ দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, এবং পাঠানদল বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও পাঠানসর্দারগণ উড়িষ্যা হইতে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে অত্যাচারের বিষ ছড়াইয়া দিত। এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুনরপতিগণ সকলেই প্রায় বাদশাহ্ আকবর শাহের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠান-সর্দারগণ তাঁহাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য ভয়, ভক্তি প্রদর্শন করিতে, এমন-কি উৎপীড়ন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। ভূরিশ্রেষ্ঠপুররাজ রুদ্রনারায়ণের সহায়তা-লাভের জন্য তাঁহার সহিত মৈত্রী-স্থাপনে পাঠান-সর্দার বহু চেষ্টা করিয়াও নিষ্ফল হন। এই কারণে পাঠান-সর্দারের প্রচ্ছন্ন আক্রোশ-বহ্নি নিত্য ধূমায়িত হইতেছিল। বস্তুতঃ শস্য-শিল্প-সমৃদ্ধ ভূরিশ্রেষ্ঠের উপর পাঠানের লোলুপ দৃষ্টি সর্বদাই নিবদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু সুযোগের নিতান্ত অভাব-হেতু পাঠানগণ বাধ্য হইয়া ক্ষান্ত ছিল।

*　　*　　*　　*

রুদ্রনারায়ণ ছিলেন শক্তিশালী নৃপতি। তাঁহার সুশিক্ষিত যুদ্ধ-কুশলী সৈন্যবল ছিল, নৌবল ছিল, তাঁহার রাজ্য ছিল সুরক্ষিত, এবং তাঁহার শাসনাধীন জনপদ ছিল কমলার ভাণ্ডার। ধর্ম-কর্ম-বিদ্যায় ভূরিশ্রেষ্ঠ তাঁহার সুশাসনের গুণে বঙ্গের মুকুটমণি হইয়া উঠিয়াছিল। তদুপরি তাঁহার সৌভাগ্যের অন্ত ছিল না।

শক্তিরূপিণী প্রেমললাম-ভূতা দেবী ভবশঙ্করীর মত সহধর্ম্মিণী তাঁহার জীবনে শান্তির স্বর্গ রচনা করিয়াছিলেন, এবং কুলপাবন নন্দন প্রতাপনারায়ণ জন্মগ্রহণ করার পর হইতে তাঁহার সকল আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু রাজা রুদ্রনারায়ণের ভাগ্যে এই পার্থিব সুখ-ভোগে পূর্ণচ্ছেদ পড়িল। প্রতাপনারায়ণ যখন পাঁচ বৎসরের শিশু, সেই সময়ে রুদ্রনারায়ণের হঠাৎ মৃত্যু হইল।

রাজা রুদ্রনারায়ণ কালগ্রাসে পাতত হইলে, রাণী ভবশঙ্করী অসহনীয় শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমস্ত বীরত্ব ও ধীরত্ব লুপ্ত হইল, তিনি সহমৃতা হইতে কৃতসংকল্পা হইলেন। এই সংকল্প ত্যাগ করিবার জন্য অনেকেই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই তিনি প্রবোধ মানিলেন না। এমন-কি অভিভাবক-হীন শিশুসন্তানের প্রতি মমতাও তাঁহার এই প্রবল শোকতরঙ্গে ভাসিয়া গেল।

অবশেষে এই দৈবদুর্বিপাকের সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী গুরুদেবকে দেখিবামাত্র অতিরিক্ত শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া মূর্ছিতা হইলেন। রাজ-পরিবারস্থ সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। তাহারা মনে করিল—বুঝি রাণীও তাহাদের ছাড়িয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। গুরুদেব তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্থির হইতে বলিলেন এবং অবিলম্বে সুশীতল বারি আনিতে অনুমতি করিলেন। রাণীর অনুচরীগণ বাষ্পাকুলনেত্রে ব্যজন করিতে

লাগিল, এবং গুরুদেব নিজহস্তে রাণীর মুখমণ্ডলে বারি-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতীত হইলে, রাণী সংজ্ঞা-লাভ করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন এবং সম্মুখে গুরুদেবকে দেখিয়া তাঁহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগল হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

গুরুদেব রাণীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন এবং নিজ উত্তরীয়বস্ত্রে তাঁহার চক্ষুজল মুছাইয়া—স্নেহপূর্ণ কোমলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেনঃ "মা! তুমি সামান্যা রমণী নও। তুমি মহাশক্তিরূপিণী বীরবালা। রাজার স্বর্গারোহণে প্রজাগণ নিতান্ত কাতর হইয়া তোমার মুখ-পানে চাহিয়া আছে। তোমাকে তাহারা জগদ্ধাত্রী বলিয়া পূজা করিয়া থাকে। মা! তুমি এই অসংখ্য প্রজার মুখের দিকে চাহিয়া শোক সংবরণ কর। মূঢ়গণই শোকে বিমুগ্ধ হয়, তোমার ন্যায় মহীয়সী রমণীর এতদূর কাতর হওয়া উচিত নহে। মা! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি ভিন্ন এই সুবিস্তৃত রাজ্য শাসন করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। তোমার পুত্র অতি শিশু, এই শৈশবাবস্থায় সে পিতৃহীন হইল। এখন তুমিই তাহার পিতৃস্থানীয়া; তাহার সর্বাঙ্গীন শিক্ষার জন্য তোমাকেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আর এখন বঙ্গদেশের অবস্থা যেরূপ ঘোর সঙ্কটাপন্ন, তাহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সুদৃঢ়হস্তে রাজ্য-রক্ষার ভার ন্যস্ত না হইলে রাজ্যের মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। অতএব মা! সকল দিক্ চিন্তা করিয়া ধৈর্য্য ধারণ কর।"

রাণী কথঞ্চিৎ হৃদয়াবেগ সংযত করিয়া অশ্রুভারাক্রান্তনেত্রে গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেনঃ "দেব! আপনি আমায় এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন কেন? স্বামীই নারীর একমাত্র গতি। পতিই রমণী-হৃদয়গগনে সূর্যস্বরূপ বর্তমান থাকিয়া তাহার সমস্ত দুঃখান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ; স্ত্রীলোকের পতিই ধর্ম, পতিই কর্ম, পতিই একমাত্র উপাস্য দেবতা। স্বামীর কার্য ভিন্ন নারীর অন্য কোন কার্য নাই; এক কথায় স্বামী ভিন্ন পতিব্রতা স্ত্রীর পৃথক্ অস্তিত্বই থাকিতে পারে না।"

গুরু হরিদেব তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেনঃ "মা, উতলা হইয়ো না। স্বামীর অপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করাই তোমার ধর্ম। যাহারা দুর্বলচিত্ত, শোক তাহাদেরই জন্য। জীবনে এখন অনেক কর্তব্য বাকি।"

রাণী অশ্রুনিরুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিলেনঃ "গুরুদেব! জীবনসর্বস্ব স্বামীর বিরহে কিরূপে জীবনধারণ করিব? আজ্ঞা করুন, তাঁহারই সেবায় অর্পিত আমার এই অকিঞ্চিৎকর দেহ তাঁহার চিতানলে ভস্মীভূত করিয়া হৃদয়ের অনির্বচনীয় জ্বালা প্রশমিত করি। দেব! এ দেহ জ্বলিয়া না যাইলে প্রাণের জ্বালা মিটিবে না। তিনি অমরধামে একাকী প্রস্থান করিয়াছেন। আমি যে তাঁহার চিরসঙ্গিনী; আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া এই মরলোকে অবস্থান করিব?"

হরিদেব শান্তস্বরে বলিলেনঃ "এই জগতে কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে না। সকলকেই মরিতে হইবে। কিন্তু বিনা কর্ম-সাধনে মানব-জন্ম নিষ্ফল। তোমার পতির

মরদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের তো লয় নাই। তাঁহাকে ধ্যানে তুমি স্মরণ করিলেই তাঁহার দেখা পাইবে।"

রাণীর মনে এই প্রবোধ-বচন কোন রেখাপাত করিল না। তিনি ব্যাকুলভাবে কহিলেন ঃ "বিবাহের পর হইতে আজ পর্যন্ত শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, জাগরণে, গৃহে, অরণ্যে, সম্পদে, বিপদে, সুখে, দুঃখে, যুদ্ধস্থলে, শত্রুমধ্যে সর্বদাই যে আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতাম। এখন তিনি চলিয়া গেলেন, আমি না যাইয়া থাকিব কিরূপে! তাঁহার দেহ বৈশ্বানর ভস্মীভূত করিবে, আমার দেহ করিবে না কেন? তাঁহার আত্মার যে গতি, আমার আত্মারও সেই গতি ; তাঁহার দেহের যে পরিণতি আমার দেহেরও সেই পরিণতি। গুরুদেব! আমার সংকল্পিত কার্যে আর আপনি বাধা দিবেন না।"

এই কথা বলিয়া রাণী অবনতমস্তকে উপবিষ্টা রহিলেন ; যেন কি একটা গুরুতর সংকল্প গ্রহণ করিতে তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

গুরুদেব এই দেখিয়া-শুনিয়া কাতর হইলেন। রাণীর বীতরাগ মনকে টানিবার জন্য তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুনর্বার বলিলেন ঃ "মা, তুমি সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ; তোমাকে বুঝাইবার আর কিছুই নাই। তুমি যাহা বলিলে—পতিব্রতা নারীর তাহাই ধর্ম, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু মা! একটু ধৈর্যধারণ করিয়া ভাবিয়া দেখ ; তোমার পুত্র অতি শিশু। তোমার স্বামীর মস্তকে যে গুরুতর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল, সেই রাজ্যভার

তিনি এখন কাহার হস্তে অর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন? এই শিশু-সন্তানের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার কাহার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন? এই শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যতদিন না রাজ্যভার স্বয়ং গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, ততদিন এই শিশুর অভিভাবক স্বরূপ তোমাকেই রাজ্যরক্ষা করিতে হইবে। ইহা না করিলে তোমাকে অধর্মে পতিত হইতে হয়। তুমি এই মাত্র বলিয়াছ, স্বামীর কার্যই তোমার কার্য। শিশু-পুত্রের লালন-পালন ও শিক্ষা তোমার স্বামীর অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এই কর্তব্য অসম্পূর্ণ রাখিয়াই তিনি ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহেই এরূপ স্থলে তাঁহার অসম্পূর্ণ কার্য সম্পন্ন করা তোমারও অবশ্য কর্তব্য ও ধর্মসঙ্গত।"

রাণী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন: "ইহাই কি আপনার নির্দেশ?

হরিদেব সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: "হাঁ মা! তুমি জননী, জননীর কর্তব্য তোমাকে করিতেই হইবে। আরও ভাবিয়া দেখ, তোমার স্বামীর নশ্বরদেহমাত্র ধ্বংস হইয়াছে। আত্মা অবিনশ্বর। দেহ, তিনি নহেন—আত্মাই তিনি, কেবল এই দেহ-রূপ গৃহে বাস করিতেছিলেন। তোমার আত্মা যদি তাঁহার আত্মার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো তুমি তাঁহার অভাব বুঝিতে পারিবে না। ধ্বংসশীল দেহের জন্য শোক-প্রকাশ উচিত নহে। তাঁহার আত্মা তোমার আত্মার সহিত মিলিত হইয়া তোমার দেহেই

কার্য করুক্।....এই পৃথিবী কর্মক্ষেত্র। কর্ম করিবার জন্য আত্মা দেহ-ধারণ করেন। ভগবদিচ্ছায় যখন তোমার দেহ আপনাআপনি ধ্বংস হইবে, তখন তোমার আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। দেহাত্মবুদ্ধি হইয়া তোমার নিজ ইচ্ছানুসারে দেহ ধ্বংস করিবার কোন অধিকার নাই। অতএব ধৈর্য ধারণ কর। শোক-প্রকাশ করিবার কারণ অতি অকিঞ্চিৎকর। স্বার্থজ্ঞানশূন্য হইয়া জগতের হিতার্থে কার্যে প্রবৃত্ত হও। শিশু-পুত্রকে লালন-পালন কর। রাজপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যাহাতে সে রাজ্যভার-গ্রহণে সমর্থ হয়, তাহাকে তদনুরূপ শিক্ষা প্রদান কর।"

রাণী ধীরে ধীরে বলিলেন: "একি আদেশ করিতেছেন, গুরুদেব? আপনি থাকিতে আর আমাকে টানিতেছেন কেন?"

হরিদেব তাঁহার কথায় আরও গুরুত্ব আরোপ করিয়া কহিলেন: "তুমি কি জান না, রাজা রুদ্রনারায়ণ মুঘলপক্ষ অবলম্বন করায় পাঠানগণ তাঁহার উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিল! এখন তাঁহার মৃত্যুতে যদি তাহারা রাজকার্যে তোমার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে, তবে নিঃসন্দেহে জানিয়ো—এ-রাজ্য নিশ্চয় পাঠান-কবলিত হইবে।...আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ভগবান্ যে তোমায় এরূপ শক্তিশালিনী ও রণনিপুণা করিয়াছেন, কারণ এ-রাজ্য তোমার দ্বারা শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। দ্বিগুণ উৎসাহ ও দ্বিগুণ শক্তির সহিত তুমি রাজকার্য পরিচালনা কর। নিশ্চিত জানিয়ো, পাঠানগণ এই অবসর কখনও ত্যাগ করিবে না।"

তিনি এখন

ছেন ?

কা

রাণী হতাশ স্বরে কহিলেন ঃ "তবে কি বলেন, আমি এই দারুণ শোকাহত অবস্থায় বর্ম অঙ্গে তুলিয়া শত্রুর সম্ভাবিত অভিযানে বাধা দিতে ছুটিব ?"

হরিদেব এইবার দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন ঃ "তোমার নিজ সত্তা ভুলিয়া যাও। মনে রাখিয়ো—তোমার স্বামীর রাজ্য-রক্ষা করা তোমার ধর্ম। রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে আশান্বিত হইয়া পাঠানরা মহোৎসাহে এ-রাজ্য করায়ত্ত করিতে যত্নবান্ হইবে। সম্মুখে মহাবিপদ্ উপস্থিত। এ বিপদে তুমিই একমাত্র ভরসা। রাজ্যের সমস্ত প্রজা তোমার মুখ-পানে চাহিয়া আছে ; তুমি তাহাদের রক্ষা-বিধানে সচেষ্ট হও। বৎসে! গো, ব্রাহ্মণ রক্ষা কর, হিন্দুধর্ম রক্ষা কর। বিধর্মিগণ যেন দেবালয় ও দেবমূর্তি চূর্ণ করিতে সমর্থ না হয়। মা! মহৎ কার্য এখন তোমার সম্মুখে। এই কার্য সাধন করিয়া দেহ-ধারণের সার্থকতা সম্পাদন কর। তোমার অক্ষয় কীর্তিতে ভুবন ভরিয়া যাউক্।"

গুরুদেবের উক্তিতে রাণীর বিচার-শক্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন ঃ "দেব! আপনার আদেশ সর্বথা শিরোধার্য। কিন্তু আপনার জ্ঞানগর্ভ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়াও আমি শোক-পরিহারে সমর্থ হইতেছি না। আমি পূর্বের ন্যায় উৎসাহ ও আনন্দের সহিত রাজকার্য পরিদর্শন করিতে পারিব বলিয়া বোধ হইতেছে না। তবে আপনার আজ্ঞা ও প্রতাপের প্রতি মমতা হেতু আমি জীবন-রক্ষা করিব। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া কয়েকজন মাত্র সহচরীর সঙ্গে কাটশাঁকড়া শিবমন্দিরে বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

কিছুদিন প্রতাপ আমার নিকট থাকুক্। পরে তাহার শিক্ষার ভার আপনার উপর পড়িবে এবং আপনার আশ্রমেই সে বাস করিবে। সম্প্রতি রাজ্যের শাসন-ভার সেনাপতি ও দেওয়ানজির উপরই অর্পিত হউক্। তাঁহারা বহুদর্শী ও কর্মক্ষম। এ বিষয়ে আপনার অভিমত জানিতে পারিলে, কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদেরই হস্তে আমি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই।”

রাণীর কথা শুনিয়া হরিদেব বলিলেন ঃ “বৎসে! অধিকাংশ বঙ্গবাসী আজকাল যেরূপ স্বার্থপর, অধার্মিক ও অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কাহারও উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ রাজ্যলোভ দুর্দমনীয়। স্বার্থ ও রাজ্যলোভের বশবর্তী হইয়া লোকে কি না অকার্য, কুকার্য করিতে অগ্রসর হয়? মা! তুমি কি জান না যে, স্বার্থ ও রাজ্য-লোভের বশবর্তী হইয়া কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র, বলপ্রয়োগে না পারিয়া, ছলে ও কৌশলে দিল্লীশ্বর মহাপরাক্রমশালী বীরাগ্রগণ্য পৃথ্বীরাজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল? কেবল পৃথ্বীরাজের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের সর্বনাশ করিয়া গিয়াছে সেই কুচক্রী; যাহার ফল প্রত্যেক হিন্দু নরনারী এখনও হৃদয়ে হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেছে। ঐ পাপাত্মার পাপকার্যের বিষময় ফল কতকাল যে ভারত ভোগ করিবে তাহাই-বা কে বলিতে পারে? পাপিষ্ঠ জয়চন্দ্র যদি ভারতে জন্মগ্রহণ না করিত, তাহা হইলে কি আজ, মা, মুসলমানের ভয়ে সদা শঙ্কিতচিত্তে বাস করিতে হইত? কখন্ তাহারা সতীর সতীত্বনাশ করে, কখন্ তাহারা হিন্দুর ধর্মনাশ করে, কখন্ তাহারা দেবমন্দির চূর্ণ করে, এই ভয় হৃদয়ে

পোষণ করিয়া কি আজ হিন্দু নরনারীকে হিন্দুস্থানে বাস করিতে হইত ? লক্ষ্মণসেনের রাজত্বও তো—মা, ঐরূপ বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই ধ্বংস হইয়াছে। তাহা না হইলে কি সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বিনাযুদ্ধে রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত ? অতএব আমার দৃঢ় ধারণা, রাজকার্য পরিচালনে বহু সমর্থ ব্যক্তি থাকিলেও সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি তাহাদের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে পাঠানগণ যে তাহাদের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া রাজ্যহরণের চেষ্টা করিবে না, ইহাই-বা কে বলিতে পারে ?"

ভবশঙ্করী শান্ত-সংযত স্বরে কহিলেন : "গুরুদেব, বিশ্বাসের শক্তিতেই বিশ্বাস সাব্যস্ত হয়। অবিশ্বাসের কি হেতু থাকিতে পারে ?"

হরিদেব দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন : "মা ! আমি বারংবার বলিতেছি, আমার কথা অবহেলা করিয়ো না। তুমি যদি কিছুমাত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রাজকার্য পরিদর্শন কর, তাহা হইলে রাজ্যের কোন ব্যক্তিই তোমার বিরুদ্ধাচারী হইতে সাহসী হইবে না। বৎসে ! এখন তোমার মহাবিপদের সময় উপস্থিত। প্রতাপের রাজ্য সযত্নে রক্ষা করিয়া প্রতাপের হস্তে যতদিন না অর্পণ করিতে পারিবে, ততদিন তোমার নিস্তার নাই। বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী হইয়া কেবল জপপূজাদি করিয়া কালাতিবাহন করিলেই চলিবে না। দিবসের অধিকাংশ সময়েই তোমাকে রণবেশে থাকিতে হইবে।

আমার আদেশ, এক মুহূর্তের জন্যও, এমন-কি ভোজনকালে ও বিশ্রাম সময়েও, তুমি অস্ত্রত্যাগ করিতে পারিবে না। একটি আগ্নেয়াস্ত্র সর্বদা নিকটে রাখিবে, এবং জয়দুর্গা দেবী তোমার পূজায় প্রীতা হইয়া আশীর্বাদ স্বরূপ অতি অদ্ভুত উপায়ে যে কৃপাণখানি তোমাকে দান করিয়াছেন, সেই দৈব অস্ত্রটি সর্বদা কটিবন্ধে বাঁধিয়া রাখিবে। আরও তুমি যে সমস্ত বলবতী রমণীকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিতা করিয়াছ, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী—তাহাদিগকে দেহরক্ষিণী-রূপে সর্বদা নিকটে রাখিবে। সাবধান, তাহারা যেন ক্ষণকালের জন্যও তোমার সঙ্গভ্রষ্ট না হয়। এক কথায়, তুমি সর্বক্ষণই আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার জন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত থাকিবে। কখনও আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়ো না।"

গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাণী ভবশঙ্করী বিনীতভাবে বলিলেন ঃ "দেব ! এক্ষণে আমি নিজের অবস্থা ও কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু শোকে আমার মন এতই কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি কিছুতেই ধৈর্য ধারণ করিতে পারিতেছি না। অনুমতি করুন, মনঃস্থির করিবার জন্য অন্ততঃ মাসত্রয় আমার বিশ্বাসিনী সহচরীগণের সহিত কাটশাঁকড়া শিবনিবাসে গমন করিয়া বাস করি। সেখানে আমার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করিয়া শোকাগ্নি নির্বাপিত করিতে চেষ্টা করিব। এই মাসত্রয় আমি রাজকার্য পরিদর্শন করিতে পারিব না। আমার ইচ্ছা, মন্ত্রী ও সেনাপতির উপর এই কয় মাসের জন্য রাজকার্যের সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করি।"

রাণী শোক-নিবারণের জন্য কাটশাঁকড়া শিবনিবাসে কিছুকাল.বাস করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে, গুরুদেব অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাণীর কথায় সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি রাণীকে বলিয়া দিলেন: "বৎসে! তুমি যখন একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, তখন শিবনিবাসে গিয়া কিছুকাল বাস কর ; কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে কখনও বিস্মৃত হইয়ো না।"

অনন্তর গুরুদেব আশীর্বাদ করিয়া রাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জগজ্জয়িনী বীরশক্তি

ভুরিশ্রেষ্ঠের ভরদ্বাজ-রাজবংশের কুলদেবতা "জয়দুর্গা" অষ্টধাতুনির্মিতা দশভুজা দুর্গামূর্তি *। ইতঃপূর্বে বীরা রাণী ভবশঙ্করী জয়দুর্গার পূজা করিয়া এই বাসনায় তাঁহার সম্মুখে হত্যা দেন যে, কোন বীরপুরুষ যেন তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারে। অনাহারে, অনিদ্রায় প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল, রাণী মন্দিরের একপার্শ্বে করযোড়ে উপবিষ্টা, তৃতীয় দিবস মাধ্যাহ্নিক পূজাবসানে দৈববাণী হইল: "বৎসে! তোর বাসনা পূর্ণ হইবে। তুই আমারই শক্তিতে শক্তিমতী হইবি। আমি তোকে একখানি তরবারি দান করিতেছি—রাজবাটীর পূর্ব দিকে সরোবরের জলে তরবারিখানি নিমজ্জিত আছে। তুই এখনই উঠিয়া স্নানার্থ সেই সরোবরে গমন কর্। পুষ্করিণীতে নামিয়া আকণ্ঠ অবগাহন করিলেই সেই মণিমণ্ডিত তরবারিখানি তোর হস্তগত হইবে। সেই তরবারি হস্তে থাকিতে কেহই তোকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না।"

রাণী ভবশঙ্করী দৈববাণী-অনুসারে সরোবরে গমন করিয়া জলমধ্য হইতে একখানি অপূর্ব তরবারি প্রাপ্ত হন। তিনি

---

* এই মূর্তি এখনও পেঁড়োরগড়ে পেঁড়োদুর্গাধিপতি রাজা নরেন্দ্রনাথ রায়ের পুত্র কবিকুলকেশরী ভারতচন্দ্রের জ্ঞাতিবংশীয়গণের গৃহে বিরাজমান থাকিয়া অর্চিতা হইতেছেন।

সর্বদাই এই তরবারিখানি অতি সযত্নে সঙ্গে রাখিতেন *। শিবালয়ে যাত্রা করিবার সময়—তিনি এই দেবদত্ত অসি সঙ্গে লইলেন।—

ইহার পরবর্তী ঘটনা-চিত্র এই যে, রাণী ভবশঙ্করী কাটশাঁক্ড়া শিবনিবাসে বাস করিতে গমন করিয়াছেন। মন্ত্রী দুর্লভ দত্ত, সেনাপতি চতুর্ভুজের সাহায্যে রাজ্যশাসন করিতেছেন। প্রজাবৎসল রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যুতে এবং সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রীরূপিণী রাণী ভবশঙ্করীর রাজকার্য-ত্যাগে প্রজাগণ অতিশয় বিমর্ষভাবে কালাতিপাত করিতেছে।

এদিকে রাজা রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া পাঠান-দলপতি ওস্‌মান ভুরস্থট-রাজ্য অধিকারের আশায় কৌশলজাল বিস্তার করিতে প্রয়াসী হইলেন। ওস্‌মান ভাবিলেন, এখন ভূরসিট্ট রাজ্য রাজশূন্য, রাজপুত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক; রাণীই রাজ্যমধ্যে সর্বেসর্বা। এখন চেষ্টা করিলে তাঁহাকে হস্তগত করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না। যদি একান্তই তাঁহাকে বশীভূত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে কৌশলে তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ওস্‌মান মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া একজন বিশ্বস্ত

---

* অদ্যাবধি সেই বিশ্ববিজয়ী তরবারির ভগ্নাবশেষ পেঁড়োরগড়ে রাণী ভবশঙ্করীর জ্ঞাতিবংশধরগণের গৃহে রক্ষিত আছে।

হিন্দু-কর্মচারীকে ব্রাহ্মণরাজ-সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিলেন।

দূত গুপ্তভাবে চতুর্ভুজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ওস্মানের উপদেশমত তাঁহাকে বলিল: "বীরবর! উড়িষ্যাধিপতি পাঠানরাজ ওস্মান বহু সম্মান জানাইয়া আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, রাজা রুদ্রনারায়ণের পূর্ববর্তী ভুরস্থুটের সকল নরপতিই বঙ্গীয় পাঠানভূপতিগণের সহায় ছিলেন। কেবল রাজা রুদ্রনারায়ণই মুঘলপক্ষ অবলম্বন করেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ এক্ষণে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। রাণী ও তাঁহার শিশুপুত্র বর্তমান থাকিলেও, কার্যতঃ আপনিই এখন ভুরস্থুট রাজ্যের সর্বময় কর্তা। আপনি যদি পাঠানরাজের পক্ষালম্বন করিয়া মুঘলের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহাকে সৈন্যাদির দ্বারা সাহায্য করেন, তাহা হইলে তিনি আশা করেন, বঙ্গদেশ মুঘল-কবল হইতে পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন, এবং আপনার সাহায্যের প্রতিদানস্বরূপ আপনাকে ভুরসিট্ট রাজ্যের অধীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিবেন। আপনার অভিমত জানিতে পারিলে, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কার্যসিদ্ধিকর গুপ্তপরামর্শ করিতে প্রস্তুত আছেন।"

ইহা বলিয়া দূত নীরব হইলে সেনাপতি বলিতে লাগিলেন: পাঠানসর্দার ওসমান যে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণরাজগণ সকলেই পাঠান নরপতিগণের সহিত মিত্রভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু রাজীবলোচনকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিয়া তদ্দ্বারা হিন্দু-দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণ করাইবার পর হইতে রাজা

রুদ্রনারায়ণ পাঠান দলপতিগণের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েন এবং বঙ্গে পাঠানশক্তি ধ্বংস করিবার অভিপ্রায়ে মুঘলপক্ষ অবলম্বন করেন। রাজা রুদ্রনারায়ণ কতলু খাঁর পক্ষ ত্যাগ না করিলে, নিশ্চয়ই তিনি বঙ্গদেশ পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু রাজা রুদ্রনারায়ণ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া নবাগত অজ্ঞাত-কুলশীল মুঘলগণকে বিশ্বাস করিয়া যে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার একেবারেই সম্মতি ছিল না। তৎকালে রাজাকে অনেক বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি নিজে যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সেইজন্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও গড়মান্দারণে আমাকে পাঠান-বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে হইয়াছিল।”

চতুর্ভুজ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া চিন্তার পর পুনরায় কহিলেন ঃ “এক্ষণে আমি পাঠানপক্ষ অবলম্বনে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক, এবং আশা করি, মন্ত্রী-মহাশয়ও আমার কার্যে অনভিমত প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু রাণীকে সম্মত করা অসাধ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি স্বামীর অনভিলষিত কোন কার্য প্রাণান্তেও করিবেন না। রাণী ভবশঙ্করী মহাশক্তিশালিনী, সমরকুশলা বীরাঙ্গনা। তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল। ভুরসিট্ট রাজ্যে এমন কোন বীরপুরুষ নাই, যে রাণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা বলিতে সাহসী হইতে পারে। এমন-কি, আমিও সেই চামুণ্ডারূপিণী রমণীর নিকট শঙ্কিতভাবে অবস্থান করি। অতএব পাঠানপক্ষ অবলম্বনের কথা কিছুতেই আমি রাণীর নিকট উত্থাপন করিতে পারিব না। তবে বীরশ্রেষ্ঠ ওসমান আপনার নিকট যাহা শপথ করিয়াছেন, তাহা যদি তিনি

কার্যে পরিণত করিতে ইতস্ততঃ না করেন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ভুরসিট্ট রাজ্যের বহুসহস্র সমরকুশল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইব এবং মুঘল-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব।”

রাজা পাইবার আশায় চতুর্ভুজের কাছে অন্য সমস্ত প্রশ্ন তুচ্ছ হইয়া গেল, ধর্মাধর্ম-বিবেক-রহিত হইয়া তিনি এক কূট প্রস্তাব করিয়া বসিলেন: “পাঠানপতি আমাকে ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের অধীশ্বর করিবেন, স্বীকার করিয়াছেন। ইহা যদি সত্যসত্যই তিনি কার্যে পরিণত করেন, তাহা হইলে রাণীকে হস্তগত করিবার এক সুন্দর ও সহজ উপায় আমি বলিয়া দিতে পারি। রাণী স্বামীর মৃত্যুতে এখন শোকাতুরা হইয়া, রাজকার্য পরিদর্শন পরিত্যাগ করতঃ কাটশাঁকড়া শিবনিবাসে কয়েকটি মাত্র সহচরা লইয়া বাস করিতেছেন। যদি এই সুযোগে নিশীথকালে তাঁহার বাসগৃহ আক্রমণ করা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বন্দিনী হইবেন। তখন পাঠানপতি ওসমান তাঁহাকে হাতে পাইয়া, যে কোন উপায়ে স্বীয় বাঞ্ছিত সাধনের জন্য সম্মতা করিতে পারিবেন, এবং আমিও নির্ভয়ে পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিতে পারিব।”

সেনাপতির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত বলিল: “আপনি যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ বীরপুরুষ। আপনি মান্দারণের যুদ্ধে যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহা অসাধারণ বলা যায়। একজন নারীকে হস্তগত করিবার জন্য অতি কাপুরুষের ন্যায় কৌশল-জালবিস্তারে প্রয়াসী হইতেছেন কেন? আপনি যদি

পাঠানরাজের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাণীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনি পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিতে পারেন। ভুরস্থটের সমস্ত যোদ্ধাই আপনার আজ্ঞাবহ; এমন-কি, মন্ত্রী পর্যন্তও আপনার আয়ত্তে। এরূপ অবস্থায় রাণীকে এত ভয় করিবার কারণ কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

দূতের সন্দেহ-ভঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি কহিলেন: "আপনি কি রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বের কথা শুনেন নাই? তাঁহার রণরঙ্গিণী মূর্তি-দর্শনে মহাবীরের হৃদয়ও সভয়ে কম্পিত হইতে থাকে। মহাশক্তিরূপিণী রাণী অসিহস্তে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলে, তাঁহার সম্মুখে স্থির থাকিতে পারে, এমন যোদ্ধা পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ! তবে তিনি এখন স্বামিশোকবিধুরা হইয়া নির্জন স্থানে কালাতিপাত করিতেছেন। এই সুযোগে সিংহীকে আনায়বদ্ধ করিতে না পারিলে, পাঠানপতির অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার আর কোনও উপায় নাই। কিন্তু সাবধান, এই কার্য অতি সঙ্গোপনে সম্পন্ন করিতে হইবে। রাণী নিশীথকালে একাকিনী শিবসাধনায় নিযুক্তা থাকেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সহসা অবরুদ্ধ করিতে পারিলেই কার্যসিদ্ধি হইবে। ধৃত হইবার পূর্বে রাণী এই ষড়্যন্ত্রের বিন্দুমাত্র অবগত হইলে, মহাবিপদ্ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। রাণীকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব স্থানে স্থানে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব তাঁহাকে বন্দিনী করিবার কার্যে আমি তো কোন সাহায্যই করিতে পারিব না, পরন্তু পাঠানরাজকেও অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত রণকুশল বলবান্ যোদ্ধাকে ছদ্মবেশে সজ্জিত করিয়া,

তাহাদের সহিত ভুরস্থট্ রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যদি মুঘলযুদ্ধে ভুরস্থটসৈন্যের সাহায্য পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমি যাহা যাহা করিতে বলিলাম, তাহা যেন বর্ণে বর্ণে প্রতি-পালিত হয়। নারী বলিয়া পাঠানপতি যেন কিছুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন না করেন। তিনি যেন সর্বদা মনে রাখেন যে, তিনি এক প্রবল পরাক্রান্ত বীরকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। যদি বিন্দুমাত্র অসাবধানতা প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে আততায়িগণের মধ্যে একজনকেও জীবিত অবস্থায় ফিরিতে হইবে না। রণচণ্ডীর ভীষণ অসিমুখে সকলেরই মুণ্ড ভূলুণ্ঠিত হইবে। পাঠান-দলপতি ওস্‌মান যদি এই ভীষণ কার্যসাধনে সমর্থ হন, তবেই আমি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিতে পারি, নচেৎ আমার নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য-প্রাপ্তির আশা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বলিবেন।"

এই বলিয়া সেনাপতি দূতকে বিদায় দিলেন।

দূতের মুখে ভুরস্থটরাজসেনাপতি চতুর্ভুজের প্রস্তাব ও পরামর্শ শ্রবণ করিয়া পাঠানসর্দার ওস্‌মান ভাবিতে লাগিলেন: "সেনাপতি যখন রাণীকে করায়ত্ত করিবার গুপ্ত কৌশল বলিয়া দিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই রাজ্যপ্রাপ্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া থাকিবে। পাপিষ্ঠ রাজ্যলোভে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া অসহায়া রাণীকে শত্রুহস্তে অর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত নহে। যাহা হউক্, আমার কার্যসিদ্ধি হইলেই হইল। ভুরস্থট রাজ্য যদি আমার করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে মুঘল-সমরে বিজয়-লাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা; কারণ, ভুরস্থটরাজ্য শস্যসম্পদে

সমৃদ্ধিশালী বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ এবং ভুরস্থটের সৈন্যগণ বলবিক্রমে ও রণকৌশলে মুঘল ও পাঠান সৈন্য অপেক্ষা কিছুতেই নিকৃষ্ট নহে। অতএব ভুরস্থটে সৈন্যস্থাপন করিয়া মুঘল-বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিলে, সেনাগণের আহারের অভাব কখনও হইবে না, অধিকন্তু আমার সৈন্যবলও প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। তদুপরি ভুরস্থটের চারিপাশে আরও সুদৃঢ় প্রাকার রচনা করিলে সফলতা লাভ করা অসম্ভব নহে। এরূপ অবস্থায় রাণীকে যে প্রকারে হউক্ হস্তগত করা নিতান্ত আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন রাণী শৌর্য-বীর্য-বতী যুবতী এবং বঙ্গদেশের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। এরূপ নারীরত্ন লাভও সৌভাগ্যের কথা। ইহাতে অধর্মই বা কি? সুন্দরী রমণী ও বসুন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা। যৌবনবতী রাণী এক্ষণে পতিহীনা। তাহাকে কোনরূপে একবার হস্তগত করিতে পারিলেই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সে যে আমার বশীভূত হইয়া পড়িবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

পাঠানসর্দার ওস্মান এইরূপ চিন্তা করিয়া কয়েকজন বিশ্বস্ত সমরদক্ষ অনুচরের সহিত ছদ্মবেশে ভুরস্থটরাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

* * * *

স্বামীর মৃত্যুর পর হইতেই রাণী ভবশঙ্করী কাটশাঁক্ড়া শিবমন্দিরে বাস করিতেছেন। রাণীর দেহরক্ষিণী সমরনিপুণা বিংশতি বিশ্বস্তা সহচরী তাঁহার তত্ত্বাবধানে নিযুক্তা আছে। প্রতিদিন মহাড়ম্বরে পূজা হইতেছে এবং আগত ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও

ভিক্ষুকগণ পরম পরিতোষের সহিত পান-ভোজনাদি করিতেছে। প্রতি রজনীতে শিবনাম কীর্তন হইতেছে। কাটশাঁক্ড়া গ্রাম উৎসবানন্দে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পূজাদর্শন, প্রসাদ-ভক্ষণ ও নামকীর্তন শ্রবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

রাণী এইরূপে দিনপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন গুরুদেব আসিয়া শিবমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। রাণী পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। তৎপরে গুরুদেব উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাণী তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিলেন।

গুরুদেব রাণীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন: "মা! তুমি শিবনিবাসে আগমন করিলে সেনাপতির কার্যাদি দর্শন করিয়া তৎপ্রতি আমার কিছু সন্দেহ উপস্থিত হয়; তজ্জন্য আমি তোমার রক্ষাবিধানে কতকগুলি গুপ্তচর নিযুক্ত করি। অদ্য প্রাতঃকালে একজন চর আম্‌তা হইতে আসিয়া আমাকে সংবাদ দিল যে, বারো-তেরো জন অপরিচিত ব্যক্তি ছদ্মবেশে আম্‌তার বাজারে অবস্থান করিতেছে। যদিও তাহারা হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা হিন্দু নহে, সকলেই মুসলমান এবং অমিতবলশালী বলিয়া বোধ হয়। আমার নিযুক্ত চরও সন্ন্যাসীর বেশে আম্‌তার বাজারে ছিল। ছদ্মবেশধারিগণ তাহাকে কথায় কথায় বলে যে, রাণী ভবশঙ্করী কাটশাঁক্ড়া গ্রামে প্রতিদিন সন্ন্যাসী-ভোজন করাইতেছেন, সেইজন্য তাহারা কাটশাঁক্ড়া গ্রামে যাইতে ইচ্ছুক। শীঘ্র

তাহারা আমৃতা হইতে কাটশাঁকড়া গ্রামে গমন করিবে।....
গুপ্তচরের মুখে এই কথা শুনিয়া এবং সেনাপতির ভাবগতিক দেখিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি। আমার মনে যেন স্বতঃই উদয় হইতেছে যে, সেনাপতি, বোধ হয়, পাঠান-দলপতির সহিত মিলিত হইয়া তোমার বিরুদ্ধে কোন ষড়্‌যন্ত্র করিয়া থাকিবে। পাঠানগণের অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও রাজা রুদ্রনারায়ণ মুঘলপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই হেতু পাঠানগণ তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় তাহারা তাঁহার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হয় নাই, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুতে অবসর বুঝিয়া, সম্ভবতঃ, সেনাপতিকে হস্তগত করিয়াছে। যাহা হউক্, মা! তুমি অদ্য রজনীতে বিশেষ সতর্ক থাকিবে। সন্ধ্যার পর হইতেই দেবদত্ত অসি কটিবন্ধে আবদ্ধ রাখিবে। দেহরক্ষিণীগণ মন্দিরের চতুর্দিকে অতি সাবধানতার সহিত সমস্ত রাত্রি প্রহরীর কার্যে যেন নিযুক্ত থাকে। আর যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে রাজধানী হইতে কতকগুলি বিশ্বস্ত যোদ্ধা এখনই এখানে আনাইবার জন্য সেনাপতিকে বলিয়া পাঠাই।”

গুরুদেবের কথা সমাপ্ত হইলে রাণী নির্ভীকভাবে বলিয়া উঠিলেন: “দেব! বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই, এবং রাজধানী হইতে সৈন্য আনাইবারও আবশ্যকতা দেখি না। এই লঘু ব্যাপারে নগরবাসীদের মনে সহসা আশঙ্কা উদ্রেক করা কোনক্রমেই উচিত নহে। তদুপরি সেনাপতি চতুর্ভুজের সত্যই যদি এরূপ দুর্মতি জাগিয়া থাকে, সে-ক্ষেত্রে

তাহাকে আমাদের কার্যধারা জানিবার অবসর দিলে কুফলই ফলিবে। আপনি বিশ্বাস করুন, প্রকৃতই যদি ঐ মুষ্টিমেয় পাঠান আমার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য রজনীযোগে শিবমন্দিরে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে দাসী আপনার আশীর্বাদে দুই-চারি জন পার্শ্বরক্ষিত্রী লইয়া একাকিনীই, বোধ হয়, তাহাদের মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থা হইবে। এতদ্ভিন্ন আমার অনেকগুলি সহচরী এখানে উপস্থিত আছে। তাহারা আমার নারীবাহিনীর শ্রেষ্ঠদল। তাহাদের বীরত্ব ও রণকৌশল আপনার নিকট অবিদিত নাই। যদিও এই অনুমিত অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয়, আপনার আশীর্বাদ থাকিলে, তাহা হইতে যে নিশ্চয়ই উদ্ধার পাইব, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আপনি নিশ্চিন্তমনে গৃহ-গমন করুন।....

—আর অবস্থা বিবেচনা করিয়া যদি বুঝি—দ্বাদশের পিছনে সংখ্যাগুরু আততায়ী আছে, তাহা হইলে এই অঞ্চলে গুপ্ত আশ্রমবাসী শৈবসন্ন্যাসী-বেশী দ্বিসহস্র মল্লবীরকে আহ্বান করিব। ব্যবস্থার ত্রুটী হইবে না।"...এই বলিয়া রাণী গুরুপদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিলেন, গুরুদেবও আশীর্বাদ করিয়া রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ভবশঙ্করী অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস সর্বনাশের কারণ ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী ছাউনি হইতে ছদ্মবেশে দুই তিন শত রক্ষীসেনাকে সেখানে উপনীত হইবার জন্য সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

রাণী সন্ধ্যা-সমাগমে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রণবেশে সুসজ্জিতা হইলেন এবং তদুপরি একখানি শ্বেত পট্টবস্ত্র পরিধান

করিলেন। সহচরীগণও অস্ত্র-শস্ত্র গ্রহণ করিয়া বর্মাবৃত দেহে মন্দিরের চতুর্দিকে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান পূর্বক শত্রুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, এবং দিকে দিকে সমাগত সৈন্যদল মক্ষীর মত অতি সংগোপনে ছড়াইয়া রহিল।

রাণী মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া শিবলিঙ্গের সম্মুখে এক-খানি সুপ্রশস্ত ব্যাঘ্রচর্ম পাতিলেন এবং তদুপরি উপবিষ্টা হইয়া তন্ময়চিত্তে শিবারাধনায় নিযুক্তা রহিলেন। রাণীর সম্মুখে দেবদত্ত উলঙ্গ কৃপাণ দীপালোকে ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল। বামদিকে একখানি বিশাল ঢাল শোভা পাইতেছিল। রাণীর বদনমণ্ডল আজ অপূর্বদীপ্তিতে উদ্ভাসিত, যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে চিরপরিচিত, প্রাণপ্রিয়, অকপট, অমিতশক্তিশালী কোন এক বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে অদম্য তেজের আবির্ভাব হইয়াছে; যেন শত্রু-দমন করিবার জন্য তাঁহার দেহ-মধ্যে মহাশক্তির চমকপ্রদ ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে: সেই ক্রীড়াতরঙ্গে তপ্তকাঞ্চনাভাপূর্ণ শরীর হইতে এক অত্যদ্ভুত জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া মন্দিরতল দিব্যালোকে আলোকিত করিয়াছে।

ঘোরা রজনী। সমস্ত নরনারী নিদ্রার সুকোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম-লাভ করিতেছে। গ্রামখানি নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও কুক্কুরসকল বিকট চিৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পেচকের কর্কশ রব শ্রুতি-গোচর হইতেছে। এই কালনিশায় সদাগতিও ভীতিপূর্ণ পদসঞ্চারে উন্নতবৃক্ষশিরে লুক্কায়িত হইতেছে। এ-হেন ভীষণ সময়ে ধরাতলে কত অকর্ম, কত কুকর্ম সংসাধিত হয়—দেখিবার

জন্যই যেন অমরগণ গগনমণ্ডলে সহস্র লোচন বিস্ফারিত করিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। এই ভয়াবহ রজনীতে হঠাৎ অদূরে মনুষ্যপদবিক্ষেপ-শব্দ কর্ণগোচর হইল। রাণীর দেহরক্ষিণী বীরাঙ্গনাগণ কোষমুক্ত অসি-হস্তে ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কতকগুলি রমণী রণরঙ্গিণী মূর্তিতে দক্ষিণ করে বর্শা উত্তোলন করিয়া মন্দিরের চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

মন্দির হইতে কিছু দূরে এক বিভীষণ নারীকণ্ঠস্বর নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রমণী গর্বিতভাবে চিৎকার করিয়া বলিলঃ "যে হও—সে হও, পরিচয় প্রদান না করিয়া একপদ অগ্রসর হইলেই মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইবে।"

অপরিচিত ব্যক্তি বাক্যব্যয় না করিয়া অসি নিষ্কোষিত করিল। রমণী বাঘিনীর ন্যায় লম্ফপ্রদান করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কেত-ধ্বনিতে সে-স্থল উচ্চকিত হইল। গুপ্তস্থান হইতে ছদ্মবেশী সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া আসিল। পাঠান বীরগণও একত্রিত হইল। অসির ঝন্‌ঝনা-শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল। রাণীর শরীররক্ষিণী বীরাঙ্গনাগণও সকলেই সেইদিকে ধাবিত হইল। রক্ষী-সেনাগণ অস্ত্র-হাতে 'মার্-মার্' রবে যোগদান করিল। ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা শব্দে রাণীর ধ্যান-ভঙ্গ হইল। তিনি বামহস্তে চর্ম ও দক্ষিণহস্তে দেবদত্ত অসি ধারণ করিয়া

দৈত্যদর্পনিসূদনী, করালিনী রুদ্রাণীরূপে মন্দিরদ্বারে দণ্ডায়মানা হইলেন। শতদীপ-প্রোজ্জ্বল গর্ভগৃহ হইতে মুক্তদ্বারপথে নাতিদীপ্ত আলোক আসিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে পড়িতে, প্রতিভাত হইল এক মধুর-ভীষণা প্রতিমা।

নারীর ছদ্মবেশে ভুরস্তটের বীর সৈন্যরা যে সেখানে পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিল, এই সন্দেহ পাঠানসর্দারের মনে জাগে নাই। সেইজন্য, রাণীর কেবল দেহরক্ষিণীগণই পাঠান যোদ্ধৃ-বর্গের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছে, এই ভ্রান্ত ধারণায় পাঠান-দলপতি ওস্‌মান রাণীর উদ্দেশে গুপ্তভাবে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক বৃক্ষান্তরাল হইতে মন্দিরদ্বারে রাণীর অপূর্ব বিদ্যুতাকৃতি রণরঙ্গিণী মূর্তি সন্দর্শন করিয়া ওস্‌মান মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি গুপ্ত স্থানে অদৃষ্ট থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ সর্বসৌন্দর্যের আবাসভূমি মহামহিমময়ী মূর্তি নিস্পন্দভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। স্বতঃই তাঁহার মনে উদয় হইল ঃ "মন্দিরদ্বারে এই রমণী-মূর্তি কে? এ দেবী না মানবী? এরূপ বরবর্ণিনী নারী তো কখনও নয়নগোচর করি নাই! এত সুন্দর, এত মধুর, এত মহিমময়, এত স্থির শান্ত অথচ গুরুগম্ভীর, এত গর্বপূর্ণ অথচ সহাস্য, এত ভ্রুকুটিকুটিল অথচ মনোরম বদনমণ্ডল তো কখনও দেখি নাই! ইনিই কি রাণী ভবশঙ্করী?"

এক হাতে চর্ম, এক হাতে অসি, যেন শত্রু-দর্প খর্ব করিবার জন্য স্বয়ং বীরত্ব মনোহারিণী রমণীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ মন্দির-দ্বারে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ওস্‌মান রাণীর অপরূপ রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিতে করিতে চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান র'হিলেন। রাণীর সহচরীগণ তাঁহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া যে পাঠান বীরগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে এবং এই অবসরে যে তিনি রাণীকে হস্তগত করিবার অভিসন্ধিতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছেন, এ-কথা ওস্‌মান একেবারেই বিস্মৃত। প্রকৃত অবস্থা যে এতক্ষণে কি গতি লইয়াছে, সেই বোধশক্তিও তাঁহার বশে নাই। কল্পনার সুখময় স্বপ্নরাজ্যে এখন তিনি আনন্দপূর্ণ মোহঘোরে বিমোহিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান এক প্রকার বিলুপ্ত। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করিয়া মনসিজ তাঁহার বিলসিত ধনুর্গুণ আরোপ করেন, নারীর মনোলোভা তনুকান্তি বাণ-রূপে বীর্যবানকে এমন-কি বিজ্ঞজনকেও বিদ্ধ করে, মোহের-আবেশে বীর্যবাণের বীর্য বিজ্ঞের জ্ঞান নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। বিপদের মুখামুখি হইয়াও বীর্যশালী ওসমানের আত্মসংযম আজ ভ্রষ্ট। এমন সময় নারীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত তীব্র ভৎসনা-বাক্য দূর হইতে তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

ভীষণ গর্জন করিয়া রমণীগণ বলিতেছেঃ "ভীরু, কাপুরুষ! দুষ্ট অভিপ্রায়ে নারী-অধিষ্ঠিত দেবস্থান কলুষিত করিতে আসিস্ কোন্ সাহসে? স্ত্রীলোকের সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে যাহারা লজ্জাবোধ করে না, তাহাদের জীবনে ধিক্! তাহাদের অস্ত্র ধারণে শত ধিক্! প্রাণের মমতা যদি এতই প্রবল, তবে কোন্ সাহসে শৃগাল হইয়া সিংহীর গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলি? যা, কুক্কুর! প্রাণ লইয়া প্রস্থান কর্; তোদের ঘৃণিত রক্তে আমাদের পবিত্র অসি আর কলঙ্কিত করিব না।"

কিন্তু রক্ষীসৈন্যগণ পলায়নপর পাঠানসৈন্যদের অনুসরণ করিয়া সম্পূর্ণ নিঃশেষ করিয়া দিল।—

নারী-কণ্ঠের রূঢ় তিরস্কার-বাচন কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্রই ওস্‌মানের চমক ভাঙ্গিল। তিনি প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অনুচরগণ যে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বাকি রহিল না। এখন তাঁহার প্রাণে ভয় জাগিল। রাণীকে হস্তগত করিবার আশা তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হইল। স্বীয় প্রাণরক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একবার মনে করিলেন—অঙ্গনাগণের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। আবার ভাবিলেন—একাকী এতগুলি সমর-নিপুণা রমণীর সহিত রণে নিযুক্ত হওয়া বাতুলতা মাত্র। বীর্য-প্রকাশের এ স্থান নয়। এতদ্ভিন্ন সৈন্যরা পৃষ্ঠ-রক্ষা করিতেছে কি-না, সে-বিষয়েও সংশয় জাগিল। ইহাতে পরাজয় অনিবার্য, এমন-কি, জীবননাশ হইবারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এরূপ অবস্থায় গুপ্তভাবে পলায়নই বুদ্ধিমানের কার্য। অনুচরগণের মধ্যে, বোধ হয়, অনেকেই নিহত। অবশিষ্ট হয়তো পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যয় হইল ঃ অবশ্যই কোন গুপ্ত ব্যবস্থা ছিল, নহিলে এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে। তাঁহার সমস্ত কৌশল আজ ব্যর্থ। আরও দুই শত ছদ্মবেশী সেনার অন্য দিক্ হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিবার কথা, কিন্তু তাহারা নিশ্চয় উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতঃপর আর অপেক্ষা না করিয়া শীঘ্র এ-স্থান পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। নচেৎ এখনই বীরাঙ্গনাগণ বিজয়োল্লাসে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে,

আত্মগোপনের কোন সুযোগ মিলিবে না, এবং তিনিও নিরাশ্রয় শিশুর ন্যায় তাহাদের হস্তে ধৃত হইবেন। ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সমস্তই নির্মূল হইবে। নিজে ফাঁদ পাতিয়া নিজেই জড়াইয়া পড়িবেন। হয়, চিরকাল বন্দীভাবে কালযাপন করিতে হইবে, না হয়, রমণীকরচালিত কৃপাণতাড়নে তৎক্ষণাৎ মস্তক দেহ-বিচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইবে।...এইরূপ ভাবিয়া পাঠানসর্দার ওস্মান ভগ্ন-হৃদয়ে একাকী বনপথে প্রচ্ছন্নভাবে সত্বর প্রস্থান করিলেন।

সহচরীগণের বিজয়োল্লাসধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাণী ভীষণ শঙ্খনাদ করিতে করিতে যুদ্ধস্থলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। দেবালয়ের ভৃত্যগণ এতক্ষণে সাহস পাইয়া চতুর্দিকে মশাল জ্বালিয়া দিল। রাণী যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, হত ব্যক্তিগণের আকৃতি পাঠান-যোদ্ধার ন্যায়। অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে আহ্বান করিয়া মৃতদেহ-রক্ষার ভার দিলেন। পুনরায় তিনি চিন্তা-কুটিল মুখে মন্দিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৯ এই অভাবনীয় ঘটনা দর্শনে রাণীর মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন ঃ রাজার মৃত্যুর পর অত্যন্ত শোকবিহ্বলা হইয়া রাজ্যশাসনের ভার তিনি মন্ত্রী ও সেনাপতির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন এবং ভগবৎ-আরাধনায় প্রাণে শান্তি-লাভ করিবার জন্য শিবনিবাসে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই সুযোগে, বোধ হয়, মন্ত্রী কিংবা সেনাপতি নৃপতি-বিহীন রাজ্য হস্তগত করিবার আশায় প্রলুব্ধ

হইয়াছে। তাঁহাকে শিবমন্দিরে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহারা পাঠানদস্যুদিগকে পাঠাইয়া থাকিবে।

আবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল: রাজা রুদ্রনারায়ণ মুঘলপক্ষ অবলম্বন করায় পাঠান-দলপতি তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পরাক্রম দেখিয়া তাঁহার জীবিতাবস্থায় তৎপ্রতি কোন রূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণে প্রতিহিংসা লইবার জন্য, খুব সম্ভব, প্রথমে তাঁহার যুবতী ভার্যাকে করায়ত্ত করিয়া অবশেষে সহজে রাজ্য-লাভ করিবার ভরসায় পাঠানসর্দার এইরূপ কাপুরুষোচিত ঘৃণিত কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যাহাই হউক, কিন্তু পাপিষ্ঠগণ কি জানে না যে, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ রুদ্রনারায়ণের সহধর্মিণী ভবশঙ্করী দুর্বলহস্তে অসি-ধারণ করে নাই! তাহারা বুঝে নাই যে, ভবশঙ্করী জীবিত থাকিতে অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্র প্রতাপনারায়ণের রাজ্য বলপূর্বক অধিকার করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি না বুঝিয়া থাকে, শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে। গুরুদেবের উপদেশ না শুনিয়া যথার্থই অন্যায়কার্য হইয়াছে। তিনি যদি এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পূর্বে সতর্ক করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে যে কি অনর্থপাত হইত, তাহা ভাবিলে সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠে। সর্বকল্যাণ-দাতার কৃপায় এবার কুচক্র নিষ্ফল হইয়াছে। এক্ষণে রাজকার্য ত্যাগ করিয়া শিবমন্দিরে বাস করা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ নহে। তাঁহাকে হস্তগত কিংবা হত্যা করিয়া, শিশু রাজপুত্রকে নিহত করিতে পারিলেই দুরাত্মাগণের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাণীর ক্রোধানল হৃদয়কন্দরে জ্বলিয়া উঠিল। রাজার মৃত্যুজনিত শোক এই ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি দান করিতে লাগিল। অবিলম্বে রাজ্য-শাসনভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়া দুর্বৃত্ত-দলন করিবার আশায় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং নিজে রণরঙ্গিণীমূর্তিতে সৈন্যগণের যুদ্ধশিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইতঃপূর্বে প্রজাগণের পক্ষ হইতে দুই-চারিজন পুরবৃদ্ধ মুখপাত্র আসিয়া রাণীর সমীপে নব নব উদ্ভূত উৎপাত ও অন্যায়ের বিবরণ জানাইয়া তাঁহাকে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তখন তিনি সে কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু গুরুদেবের কথা শুনিয়াই রাণী সেনাপতির উপর সংশয়াবিষ্টা হইয়াছিলেন, এবং রাজ্য-মধ্যে যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ক্রমে ক্রমে ভঙ্গ হইতেছে— তাহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার আর দ্বিধা জাগিল না। প্রজাদের আবেদন তাঁহার স্মরণে আসিল; উভয় রাজকর্মচারাই সমুচ্চ পদে আসীন হইয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন। দৃঢ়হস্তে ইহার প্রতিরোধ করা নিতান্ত আবশ্যক।

আশু কর্তব্য বিবেচনায় রাণী দেওয়ান দুর্লভ সম্বন্ধে সবিশেষ মস্তিষ্ক-চালনা করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। রাজ্যের নিরাপত্তাই চিন্তনীয় বিষয়। প্রথমে চক্রান্তের মূল-সন্ধান করিয়া প্রত্যক্ষ প্রামাণ্যে সেই আদিকারণের উচ্ছেদ আনাই শ্রেয়স্কর। এক্ষণে তিনি সেনাপতির হস্ত হইতে সৈন্য-চালনার ভার সম্পূর্ণরূপে নিজহস্তে গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্পা হইলেন।

রজনীর শেষযামে ভবশঙ্করী যোগীন্দ্র মহেশ্বরের পূজন-বন্দনা সম্পূর্ণ করিবার মানসে যোগাসনে বসিলেন। তাঁহার বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানের কোন ক্রুটী হইল না, কিন্তু অন্তরঙ্গ আরাধনায় অনুপ্রাণনার বিচ্ছেদ ঘটিল। আজিকার অচিন্তিত ঘটনা তাঁহার চিত্তলোকে দ্বন্দ্ব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। এই অনিবিষ্ট মনে তিনি পরমদেবতার চিন্ময়রূপের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন না। তবে কি তিনি প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছেন? মর্মগত প্রাণের সন্ধান পাইবার জন্যই যে তিনি ধর্ম-সাধনায় আত্মলোপ করিতে চাহিয়াছেন। যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই তো তাঁহার প্রেয়ঃ। তবে অন্তরের অন্তস্তলে প্রশ্ন জাগে কেন? কে ইহার সমাধান করিবে? নিয়ত শোক-দুঃখে নিমগ্ন থাকিয়া সাড়ম্বর ধর্মচর্যা দ্বারা সান্ত্বনা-লাভ করিবার চেষ্টা আত্মবিস্মৃতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে?···এই চিন্তায় আকুল হইয়া ভবশঙ্করী সাশ্রুনেত্রে শান্ত যোগিবর শিতিকণ্ঠ শঙ্করের উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন: "ওগো দেবাধিদেব শুভঙ্কর, তুমি ত্রিলোকের রক্ষার জন্য বিষ-পান করিয়া গরলকণ্ঠহার। তোমাকে নিত্য অর্চনা করিয়াও আমার শিবজ্ঞান জাগে নাই, শুভাশুভ-বোধ জাগিবে কিরূপে? তুমি সেই জ্ঞান দাও, কি আমার কর্ত্তব্য—নির্দেশ কর। ওগো রুদ্র, ওগো সর্বময়, তোমার ত্রিনয়নের অগ্নিতে আমার ভ্রান্তি, আমার মিথ্যা অহঙ্কার, আমার আত্ম-সর্বস্ব বুদ্ধি দগ্ধ কর। হে প্রবলপ্রাণ—প্রাণরহস্য উদ্‌ঘাটিত কর। কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা মহাভারতীয় শিক্ষা হইতেই আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু কর্ম দ্বারা যে জ্ঞান-লাভ

হয়, সে জ্ঞানের তপস্যা আমি করি নাই। আমার দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধর সেই কর্মের আদর্শ, এই আদর্শ দুঃসাধ্য প্রয়াসে আমাকে কঠোর ভাবেই প্রবর্তিত করিবে। তোমার কৃপা-প্রসাদে আমার ধর্ম হউক্ শ্রেয়োবুদ্ধিপ্রধান। যখনই অন্যায় মর্ত্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনই—হে শূলপাণি—তোমার প্রকাশ হইয়াছে অব্যর্থ মহিমায় প্রলয়ঙ্কর মূর্তিতে। আমার ক্লৈব্য, আমার দুর্বলতাকে ধিক্কার দিবার জন্যই কি আজি বলবান্ শত্রুকে আমার দ্বারে দৈব দুর্লক্ষণের মত উপস্থিত করিয়াছ? দেশমাতৃকার প্রতি আমার কর্তব্য-বিমুখতার কারণেই কি তোমার এই সাবধান-সংকেত? এই কি আমার সত্যধর্ম? তবে আমার হৃদয়ে শক্তি দাও, বাহুতে বল দাও, আমাকে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত কর। দেশজননীই হইবেন আমার আরাধ্যদেবতা; আমি মানুষদেবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিব।”

রাণীর অশান্ত মন কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেও, তাঁহার অন্তরে জাগরিত সকল সংশয় দূর হইল না। তিনি জানিতে চাহেন—একটি মাত্র উত্তর, তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠপথ।…প্রত্যূষ হইতে আর দুই-এক দণ্ড বাকি, তিনি স্বহস্তে মন্দিরের ঘণ্টা নিনাদিত করিলেন, ঘণ্টার গম্ভীর নাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইল। ঠিক সেই মুহূর্তে সন্ন্যাসী-বেশী পাঁচজন মল্লনায়ক রাণীর সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। রাণী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে তাকাইলেন। প্রধান মল্লনায়ক বলিল: “দেবী, নিশামুখে এই অঞ্চলের প্রান্তদেশে একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে;

কিন্তু এখানেও তো দেখিতেছি—অনুরূপ যুদ্ধ বাধিয়াছিল! এই আশ্চর্য যোগাযোগের কারণ কি ?”

রাণী অসহিষ্ণু হইয়া উত্তর দিলেন: “আমার একদেশ-দর্শিতাই ইহার কারণ। এখন সংঘষের ফলাফল জানিতে আমি উৎসুক হইয়াছি।”

মল্লপ্রধান তখন পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল: “ফল হইয়াছে শত্রুনিপাত। আমরা অবশ্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু গুরুদেবের অনুমতিক্রমে আমরা এই অঞ্চল-রক্ষার জন্য নিত্য নিয়মিত প্রহরার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। ইহার সুফল যে আমরা পাইয়াছি, আমাদের বৃত্তান্ত শুনিলেই বুঝিবেন গত সন্ধ্যার প্রাক্কালে কর্তব্যরত এক মল্ল-প্রহরী শতাধিক সন্ন্যাসীকে নদীর দিক্ হইতে আসিতে দেখিয়া বিশেষ কৌতূহলী হইয়া উঠে। প্রহরী সুকৌশলে তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সন্দেহ-যুক্ত হয়। তৎক্ষণাৎ সে ত্বরিতপদে পথবর্তী আমাদের আম্র-কানন-ঘাটিতে পৌঁছাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেয়। তখন মল্ল-রক্ষীরা দলবদ্ধভাবে অপরিচিত সন্ন্যাসিগণের প্রতীক্ষায় থাকে। তাহারা সেখানে আসিবামাত্র রক্ষিদল পথ-রোধ করিয়া নানা প্রশ্নে তাহাদের অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করে। সেই বিলম্বের জন্য আগন্তুকগণ বিরক্ত হইয়া উঠে, তাহাদের শীঘ্রই কাটশাঁকড়া-মন্দিরে হাজির হইতে হইবে বলিয়া ঝুঁকিয়া পড়ে। ইতোমধ্যে আশ্রমের আমরা সকলেই সংবাদ পাইয়া গিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত আয়োজন সম্পূর্ণ করিলাম। আততায়িগণের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্য

অবলম্বন করা হয়। তারপর অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে শিঙ্গায় ফুৎকার তুলিয়া মল্লরক্ষীদলকে সংকেত দিবামাত্রই ছদ্মসন্ন্যাসীরা বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন তাহারা বিপদ্ আসন্ন বুঝিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। অবশেষে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। সেই বনস্থলীতে মশালের আবছায়া আলোকে আমরা তাহাদের উপর চাপিয়া পড়িয়া হত্যা করিতে থাকি। মল্ল-পক্ষের অল্প কয়েকজন হতাহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু শত্রু-পক্ষের একটি প্রাণীও প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে নাই। মৃত শত্রুগণকে দামোদরের খালে ভাসাইয়া দিয়াছি, এতক্ষণ দামোদরের স্রোতোমুখে বহুদূর বাহিত হইয়া জলজন্তুদের ভক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।—জননী, আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি—শত্রুরা সকলেই ছদ্মবেশী মুসলমান। রাত্রিতে সেই ঘটনা-স্থল ত্যাগ করা সমীচীন নহে বলিয়া, এখন এই অপ্রীতিকর সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। এইপ্রকার অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব কি কারণে হইল, তাহার বিচার আপনি করুন।”

রাণী মনে মনে গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন। অতঃপর তিনি মল্লবীরগণের কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের পুরস্কৃত করিলেন, এবং তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন পূর্বক অধিকতর সতর্ক থাকিতে নির্দেশ দিলেন। অনন্তর রাণী ভবশঙ্করী শিবমন্দিরে আর কালক্ষেপ না করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রত্যাবর্তন

রাজা রুদ্রনারায়ণের আকস্মিক মৃত্যুতে প্রত্যেক জনপদ-বাসী হতবুদ্ধি হইল। মাথার উপর সুদৃঢ় আশ্রয় অতর্কিতে ভাঙ্গিয়া পড়িলে মানুষ যেমন নিজকে বিপন্ন অসহায় মনে করে, সেইরূপ ভূরিশ্রেষ্ঠের প্রজাবৃন্দ তাহাদের মহদাশ্রয় হারাইয়া দুস্তর সমুদ্রে ভেলার ন্যায় আপনাদের নিরালম্ব বোধ করিতে লাগিল। সূক্ষ্মদর্শী রাজগুরু হরিদেব জনগণের মনোভঙ্গ ও আকুলভাব লক্ষ্য করিয়া দেশের মঙ্গল সম্বন্ধে সংশয়িত হইয়া উঠিলেন। এই অবস্থার সুযোগ ধরিয়া স্বার্থান্বেষীর দল রাজ্য-মধ্যে বিশৃঙ্খলা জাগাইয়া তুলিতে পারে, ক্ষমতা ও প্রাধান্যের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাওয়াই অধিকতর সম্ভবপর। জনসাধারণের হিতাহিত বিবেচনা নাই, আপনাদের আপৎকাল মনে করিয়া ইহারা ভ্রান্তবিশ্বাসে যে-কোন বলদর্পীকে শরণ লইবার যোগ্য জ্ঞানে আত্ম-সমর্পণ করিতেও দ্বিধাগ্রস্ত হইবে না। সে-ব্যক্তি প্রকৃত জনবৎসল দেশের হিতৈষী কি-না, তাহাও বিচার করিবার মত ধৈর্য তাহাদের নাই। দোলায়মান জনচিত্তকে যে-কোন উপায়ে শান্ত করিতে না পারিলে, অশান্তির প্রেত-নৃত্যে এই সুশৃঙ্খল শান্তির রাজ্য ধ্বংসের মুখে যাইতে বিলম্ব হইবে না। সর্বোপরি পুনঃপ্রতিষ্ঠা-লোলুপ পাঠান-শত্রুরা এই রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। এই জনপদে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিলে তাহাদের সমূহ লাভ, কারণ—তাহারা

যে ইহাকে একটি দুর্জয় কেন্দ্রে পরিণত করিয়া পুনরায় বাঙ্গালা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে অভিযান চালাইতে সংকল্প পোষণ করিতেছে, এই আগ্রহাতিশয় অজ্ঞাত নহে। অতএব এই অসময়ে কোনরূপ বিপর্যয় ঘটিবার পূর্বেই যথাযোগ্য প্রতিবিধান করা আশু কর্তব্য।

সবিশেষ চিন্তা করিয়া হরিদেব পৌরপ্রধানগণকে সাদরে আহ্বান করিলেন। তিনি দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণমূর্তি-রূপে পূজিত হইতেন, এবং তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও নিপুণা বুদ্ধি সবজনবিদিত ছিল। সেইজন্য গুরুদেবের আমন্ত্রণ সকলে অনুকূল হৃদয়েই গ্রহণ করিল। হরিদেব আহূত পৌরগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "আজিকে মহারাজের অবর্তমানে আমরা এক অপ্রত্যাশিত সন্ধিক্ষণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। রাজকুমার বালক, রাজ্য-রক্ষা বা প্রজা-পালন তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে। এখন আপাতদৃষ্টিতে এই রাজ্যের রক্ষণসমর্থ কোন ব্যক্তি নাই বলিয়াই মনে হইতেছে। তবু বলিতেছি—নিরাশ্বাসের বিশেষ কারণ নাই। আপনারা সকলে একবার দৃষ্টি প্রসার করুন, তখনই দেখিতে পাইবেন—রাজা রুদ্রনারায়ণ আমাদের নিরাশ্রয় রাখিয়া যান্ নাই। আপনাদের চক্ষের সমক্ষে কোন মূর্তিই কি জাগিয়া উঠিতেছে না? আপনারা কি জানেন না: রাণী ভবশঙ্করীর সম্পূর্ণ সহযোগিতায় রাজা সমস্ত রাজনীতিক বিষয় ও শাসন-কার্য সম্পন্ন করিতেন? এই অপূর্ব বীরাঙ্গনা যে একজন শ্রেষ্ঠ বীরের তুলনায় কোন অংশে ন্যূন নহেন, তাহার প্রমাণ কি আপনারা পান্ নাই? তিনি

যথার্থ লোকেশ্বরী, প্রজাগণের শক্তিরূপিণী জননী, তিনিই মহাদেবীর প্রসাদে আমাদের বরাভয়করে রক্ষা করিবেন। এ-বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কোন কুটিল প্রশ্নই জাগিতে পারে না। বস্তুতঃ, এ দেশ রক্ষকহীন হয় নাই, ইহা নিশ্চয় জানিবেন। সাধারণ জনগণের মধ্যে যে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে, তাহা আপনারা দূর করুন, সমুচিত আশ্বাস-বাক্যে তাহাদের মনের বল ও উৎসাহ ফিরাইয়া আনুন ; নহিলে স্বার্থের দ্বন্দ্ব লাগিবে, আত্মপরায়ণ ব্যক্তি মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া পাঠান-শত্রুগণের সহিত হাত মিলাইয়া নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির উপায় খুঁজিবে, এমন-কি আত্মবিক্রয় করিতেও সেরূপ ব্যক্তির বিবেকে বাধিবে না। তাই আপনাদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আত্মপ্রবঞ্চনার বশে গিয়া নিজেদের অমঙ্গল ডাকিয়া আনিবেন না, সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া নিরাকুল জনগণকে সুবুদ্ধি-দানে পুনর্বার তাহাদের সচেতন করুন। তাহা না হইলে চক্রান্তকারীর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পাইবে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে, ষড়্‌যন্ত্রে লক্ষ্মণসেনের রাজ্য যেমন ভঙ্গ হইয়া আততায়ী মুসলমানের পদানত হইয়াছিল—সেইরূপ এই রাজ্যও বিক্ষিপ্ত হইবে, পাঠান-কবলিত হইবে। অতএব, দেশকে যদি আপনারা ভালোবাসেন, এই কার্য আপনাদেরই। রাজ্যের এই শান্তি-রূপ অক্ষুন্ন থাকিবে, কোনদিকে গ্লানি জাগিবে না। এখন একমাত্র কর্তব্য—দেশবাসীকে আত্মস্থ হইতে হইবে।"

পৌরপ্রধানগণ গুরু হরিদেবের যুক্তিপূর্ণ বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হইল রাণী

ভবশঙ্করীর উপর। তাঁহারা জনপদবাসিগণকে এই আশার বার্তা শুনাইলেন। জনগণের বিভ্রম কাটিয়া গেল। তাহারা হতাশ্বাস-প্রাণে যেন নব-বল পাইল, তাহাদের সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হইল। দেশবাসী সমস্বরে জয়ঘোষণা করিয়া উঠিল: "জয় রাণী ভবশঙ্করীর জয়! জয় লোকেশ্বরী দেবী ভবশঙ্করীর জয়!"

রাজার মৃত্যু-জনিত যে সমস্যা ধীরে ধীরে প্রবল আকার ধারণ করিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা আরম্ভেই নিবারিত হইল দেখিয়া—হরিদেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। দেশময় বিঘোষিত হইল: বীরব্রতা রাণী সবল-হস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। নৃপতি-বিয়োগ-কাতর প্রজাগণ শোক-দমন করিয়া সেই শুভবার্তা উৎসাহে উঠিল। কাহারও মনে আর কোন খেদ বাসা বাঁধিয়া রহিল না। কিন্তু গুরুদেব যাহা স্থির ভাবিয়াছিলেন, দৈববিড়ম্বনায় তাহার বিপরীত ঘটিবার আশঙ্কা জাগিল। রাণী পতি-শোকে এতদূর মোহমান হইয়া পড়িলেন যে, রাজ্যভার গ্রহণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। গুরুদেবের শত যুক্তি শত অনুনয় সত্ত্বেও তিনি স্বীয় সংকল্পে অটল রহিলেন। এই বৃত্তান্ত পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

পুরবাসিগণের বিশ্বাস ছিল: রাজার ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর রাণী নিয়ম-অনুসারে রাজকার্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু সকলে বিষণ্ণমুখে দেখিল—রাণী রাজ্য-চালনার ভার দেওয়ান ও সেনাপতির হস্তে ন্যস্ত করিয়া নিজে মন্দির-

বাসিনী হইয়াছেন। তাঁহার এই উদাসীনতায় প্রজাগণ দমিয়া গেল। সেই সময়ে হরিদেব তাহাদের প্রবোধ দিয়া শুনাইলেন : "আমার প্রতি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো। সদ্যঃশোকবিধুরা রাণী স্বল্পকালের জন্য বিশ্রাম চাহিতেছেন। তৎপরেই তিনি তোমাদের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। তোমাদের দূরে রাখিয়া তিনি অধিক দিন থাকিতে পারিবেন না। তোমরা নির্ভাবনায় দিনযাপন কর। ইতোমধ্যে যদি কিছু অনুযোগ করিবার প্রয়োজন ঘটে, তাহা হইলে জানিয়ো—তাহার দ্বার তোমাদের জন্য সবদাই মুক্ত থাকিবে।"

গুরু হরিদেবের কথা কেহ অবিশ্বাস করিল না। কোন বিসংবাদী সুর উঠিল না। কিন্তু দেওয়ান ও সেনাপতির শাসন-কার্যের উপর হরিদেব সুতীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি কয়েকজন অতিবিশ্বাসী দক্ষ পুরবাসীকে গুপ্তচরের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রথম কয়েক মাস সহজভাবেই কাটিয়া গেল। অনন্তর বাধিয়া উঠিল ছদ্মবেশী অন্যায়ের সহিত সত্যের বিরোধ।

দেওয়ান দুর্লভ দত্ত রুদ্রনারায়ণের রাজত্বকাল হইতেই রাজস্বসচিব-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজ্য-মধ্যে তাহার প্রভাব ছিল বহুপ্রসারী। অর্থাগমের নানাবিধ পন্থা সুগম করিয়া রাজকীয় ধন-সংস্থান-বর্ধনে তিনি অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। অন্তর্বাণিজ্য- ও বহির্বাণিজ্য-সংক্রান্ত তাহার আয়কর ব্যবস্থার গুণে দেশের আর্থিক অবস্থা পূর্বাপেক্ষা উন্নততর হইয়া উঠে। তাঁহারই প্রস্তাব-অনুসারে রাজা রুদ্রনারায়ণ হারমাদদিগকে সরস্বতীর নিকটবর্তী ব্যাতোর অনূপে অস্থায়ীভাবে ব্যবসায়

করিবার অনুমতি দান করেন ··এমন-কি নবাগত বিদেশীরা ব্যবসায়িক আনুকূল্যের জন্য দেওয়ানের মধ্যস্থতায় ভুরস্থট-রাজের নিকট হইতে সপ্তগ্রামের প্রায় এক ক্রোশ দূরে ভাগীরথী-কূলের স্বল্প পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইবার সুযোগ পাইয়াছিল। কিন্তু বেশীদিন স্থায়ী না হইলেও শুল্ক-সংগ্রহের সেই যোগাযোগ ঘটাইয়া দেওয়ান প্রশংসার অধিকারী হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর্থনীতিক সমস্ত বিষয়েই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত। কোথায় আউওল জমি, কোথায় সুনা জমি, লাল জমি, কোথায় মণ্ডলী বা জঙ্গলবুড়ী তালুক, বৃহদাংশিক ও ন্যূনাংশিক প্রজাগণের সহিত কিরূপ সংবিদা-বিধান প্রবর্তিত, গ্রাম্যমণ্ডল চৌধুরী ইজারাদার পত্তনিদার প্রভৃতির ইতিকর্তব্যতা, এবং রাজ্যের আয়-ব্যয়ের অঙ্ক তাঁহার নখদর্পণে ছিল। তিনি ছিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ, কৃতকর্মা ও কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন। তাঁহার অধিকাংশ কার্যই নিয়মবদ্ধ ছিল, রাজা ও দেশের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ও অনুরাগের কোনদিন অভাব দৃষ্ট হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, দেওয়ানের সততা ও কর্মকুশলতার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়া রাজা রুদ্রনারায়ণ তাঁহার প্রতি অবিচল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবদ্দশায় দেওয়ান কখনও নিয়ম-তন্ত্র অতিক্রম করেন নাই। সেইজন্য তিনি রাজার প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত কর্মচারীরূপে গণ্য হইতেন। রাণী ভবশঙ্করীও সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দুর্লভ দত্তকে রাজ্য-পরিদর্শনের দায়িত্ব-পূর্ণ গুরুভার নিঃসন্দেহে অর্পণ করেন। কিন্তু রাজ-প্রভুর অধীনে যে সুস্থ মন লইয়া

তিনি কার্য-পরিচালনা করিতেন, স্বয়ং প্রভুত্ব লাভ করিয়া স্বীয় অধিকার-ক্ষেত্রের সীমা লঙ্ঘন করিলেন। তাঁহার সেই বল্‌গা-হীন মন যে উৎকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিবে, তাহা আর বিচিত্র কি! উৎকট শক্তি-মাদকতার ক্রীড়াপুত্তল হইয়া উঠিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইল না। রাজ্যের প্রতি তাঁহার লোলুপ-দৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে অতিরিক্ত ধন-লালসা তাঁহার ন্যায়পরতা ও সুবুদ্ধির ভিত্তি টলাইয়া দিল। দেশ ও দেশবাসীর উৎকর্ষ-সাধনের নামে তিনি যে-পন্থা অনুসরণ করিলেন, তাহা সর্বসাধারণকে উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিল।

রাজমহিষী সরলবিশ্বাসে দেওয়ান দুর্লভ দত্তের হস্তে রাজ্যের আর্থনীতিক দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন: সেইরূপ সৈন্যাধ্যক্ষ চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর 'পরে রাজনীতিক ও দেশ-রক্ষার ভারার্পণ করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। কারণ, তিনি জানিতেন: চতুর্ভুজ ছিলেন রণকুশল ও সাহসী এবং একাধিক ক্ষেত্রে নিজ শক্তিমত্তা, সৈন্য-পরিচালন-নৈপুণ্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্বক রাজা রুদ্রনারায়ণের বিশ্বাস-অর্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল বিবেচনায় ভবশঙ্করী উভয়ের উপর নিতান্ত নির্ভর করিয়াই এই কোলাহলময় জগৎ হইতে দূরে এক নিভৃত স্থানে একান্তবাসিনী থাকিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্বেশ্বর তাঁহার সংকল্প চূর্ণ করিলেন, যাহা অনিবার্য—তাহাই ঘটিল। অবস্থা-চক্র আবর্তিত হইল। মনোময়ী কল্পনা ও কঠিন বাস্তবে লাগিল সংঘর্ষ। কর্ম-বিমুখ মুহূর্তগুলি তাঁহাকে লজ্জা দিল, সুপ্ত শক্তি তাঁহাকে গঞ্জনা দিয়া

কর্মকাণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আহ্বান করিল। তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা-লালিত নিশ্চিন্ত ভাব বিদায় লইল। কেবল দেব-সেবা দ্বারা আপনার বীরপ্রকৃতিকে তিনি লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। বিপদের সাক্ষাৎ পাইয়া রাণী গুরুদেব-কথিত নিরলঙ্কার সত্য উপলব্ধি করিলেন।

কতদিন অতীত হইয়াছে, তিনি নির্লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যের কোন সংবাদই রাখিতেন না, কেবল অচল দেব-বিগ্রহের ধ্যান-ধারণায় ও পূজার্চনায় তাঁহার অলস নিঃসঙ্গ দিন-রাত্রি সার্থক করিবার ব্রতে নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে জনপদবাসিগণের দুঃখ-সমুদ্র গুমরাইয়া উঠিতেছিল, সে-শব্দ তদ্‌গতচিত্ত রাণীর শ্রবণে প্রবেশ করিল না। দরিদ্রের ক্ষীণ কণ্ঠ শূন্যে মিলাইয়া গেল। রাণীর স্থলাভিষিক্ত নব্য শাসকদ্বয়ের মতিগতি ক্রমশঃ বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রজাগণ, যাহা প্রত্যাশা করে নাই, সেই সমস্ত অপ্রিয় ঘটনা একে একে ঘটিতে দেখিয়া, সংশয়াকুল হইয়া উঠিল। লোভ, মোহ এবং মাৎসর্য একসঙ্গে জ্বলন্ত উল্কার ন্যায় আপনার তাপ-দাহে উত্তপ্ত হইয়া চারিদিক্ সন্তাপিত করিয়া তুলিল। একদিকে দুরন্ত লোভের দাপাদাপি, অন্যদিকে অধিকার-প্রমত্ত স্বৈরবুদ্ধির সতর্ক-কুটিল অভিযান। অধিকাংশ নগরে ও গণ্ডগ্রামে নবনিয়ম-ছদ্মে হরণ ও পীড়ন সমতালে চলিতে লাগিল। দেওয়ানের লোভী-কর প্রসারিত হইল—যাহাদের স্বল্প সম্বল—সেই দরিদ্র গৃহস্থের কুটীর পর্যন্ত। উপরন্তু দেওয়ান নিজদলভুক্ত ও নিতান্ত অনুগত অনভিজ্ঞ জনবর্গকে নিযুক্ত

করিয়া অধিকাংশ পুরাতন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং অর্থ- ও হিসাব-সংক্রান্ত কার্যের নিমিত্ত নিয়োজিত সুদক্ষ ব্যক্তিগণকে অনভ্যস্ত বিষয়ে অপসারিত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। নানা ক্ষেত্রে অকারণে পূর্বচুক্তি ভঙ্গ করা হইল, বর্ধিত হারে নূতন নিষ্পত্তির জন্য পীড়াপীড়ি চলিল। অতিলাভ-লিপ্সু দেওয়ানের বিশাল কবলে সব তলাইয়া যাইতে লাগিল। সীমাতিরিক্ত কর-বৃদ্ধিতে ধনী-দরিদ্র সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িল। আর রাজ্য-সংরক্ষণ-ব্যপদেশে জনগণের শ্রমার্জিত অর্থ আহরণ পূর্বক সৈন্যের বল-পূর্তির অভিনয় সর্বসাধারণকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। এতদ্ভিন্ন রাজনগরে মুসলমান ফকিরের যাতায়াত এক-দুই করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল; প্রায়ই পথে-প্রান্তরে পাঠান অশ্বারোহীর হঠাৎ আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া নগরবাসিগণ প্রমাদ গণিল। প্রজাবৃন্দের ঘোরতর অসন্তোষ, অভিশঙ্কা ও মর্মদাহী দীর্ঘনিঃশ্বাসে সমস্ত জনপদের আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ শাসনকর্তার পদাধিষ্ঠিত উভয় দুরাচারীই ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা না করিয়া কেবল আপনাদের ইষ্ট-সন্ধানে অনিয়মকে বাছিয়া লইলেন।

এইরূপ বিসদৃশ অনৃত আচরণে গুরু হরিদেব নিরতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। চতুর্ভুজকে অধিক ক্ষমতাশালী বিচারে তাঁহার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়া অনেক অনুযোগ করিলেন, এমন-কি শাসাইতেও ছাড়িলেন না; তাঁহাকে নানাভাবে বোধ দিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে বলিলেন: "তোমাদের উভয়ের উপর রাণী অতিবিশ্বাসে যে গুরু দায়িত্ব দিয়া গিয়াছেন, তোমরা

তাহার অপমান করিতেছ। অশেষ নিগ্রহে দিনের পর দিন প্রজারা প্রপীড়িত হইয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ বাস্তু-ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছে, এবং কার্যশৃঙ্খলার উত্তরোত্তর শোচনীয় অবস্থান্তর প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকে এই স্থান ছাড়িতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। এমন সোনার রাজ্যে এ-কি দাবানল জ্বলিয়া উঠিল? একদিকে অন্যায় করারোপণ, অন্যদিকে সময়ে অসময়ে মুসলমান ফকির ও অশ্বসাদার প্রাদুর্ভাব। পীড়ন-শোষণের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে এই ভীতির কারণ। প্রচলিত রাজ্যশাসননীতির এই বিপর্যয় ঘটাইবার বুদ্ধি কেন জাগিয়া উঠিল? এইরূপ চলিলে সর্বনাশের পথ-রোধ করা সুদূরপরাহত হইয়া উঠিবে। যে-আগুন ধিকিধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাহা সর্বগ্রাসী হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিবে, কেহই রক্ষা পাইবে না, তোমরাও মরিবে। আমার অনুরোধ—যদি মঙ্গল চাও, অবিমৃশ্যকারীর মত কার্য করিয়ো না, এখনও সাবধান হও, আর আত্মঘাতে অগ্রসর হইয়ো না। আমার জ্ঞানে এরূপ কখনও দেখি নাই। সর্বদ্রষ্টা ভগবান্ তোমাদের এই জ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন না।"

কিন্তু সুচতুর সেনাপতি কপট-বিনয়ে হরিদেবের সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিলেন: "গুরুদেব, আপনি এই রাজ্যের পূজ্যপাদ, পুণ্য ও হিতৈষণার প্রতিমূর্তি। আপনার প্রত্যেকটি সদুপদেশ আমি শিরোমণি-রূপে গণ্য করি। কিন্তু এ-স্থলে আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, আপনি আমার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিতেছেন। দেওয়ান যে-সমস্ত কার্যের

জন্য দায়ী, তাহাতে আমার কোন সংস্রব নাই বলিলেই হয়, আপনি আবশ্যক-বোধে তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া সংযত করুন। আমি কেবল রাজ্য-রক্ষণাবেক্ষণেই নিযুক্ত। এ-সম্পর্কে আপনি যে গুরুতর প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহা নিতান্তই ব্যষ্টিগত, নিজস্ব বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপরেই ইহার উৎপত্তি। নিশ্চয়ই কোন পরশ্রীকাতর স্বার্থান্বেষী আপনার কূটস্থ ধর্ম-সমাহিত চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে, আপনার ভাবপ্রবণ সরল-শুভ্র মনের পটে মনঃকল্পিত ভাবী বিপদের চিত্র-অঙ্কনে—তাহা মসিলিপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাই আপনার মনোবিকার ঘটা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার সংশয় অমূলক। যে কেহ ঈর্ষা-বশে আপনার কাছে গোপনে আমার বিরুদ্ধে যাহাই বলিয়া থাকুক, সেই সমস্ত বিষয়ে তাহার কোন নিশ্চয়জ্ঞান নাই।"

চতুর্ভুজের বাক্ছলে হরিদেবের অণুমাত্র মতপরিবর্তন হইল না ; কারণ, তিনি ইহার কার্যকলাপের পরোক্ষ প্রমাণ পাইলেও, কুশাসনের ফলে জনপদের ব্যবস্থা যে বিপরিণত—তাহা অবিসংবাদিত সত্য। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন: "তোমার নিকট সদুত্তর আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি অযথা এক কল্পিত ব্যক্তি সৃষ্টি করিয়া আমাকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। ধর্মসাক্ষী করিয়া আমাকে সত্য বলো—রাজধানীতে পাঠানের দর্শন মিলিতেছে কেন?"

চতুর্ভুজ প্রথমে থতমত খাইলেন বটে, কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া উত্তর দিলেন: "প্রকৃত বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এই জনরবের মূল হেতু। ইহাকে ঠিক বলা যায়—সর্পে

রজ্জু-ভ্রম। মুঘলদের সঙ্গে আমাদের মৈত্রী আছে, এ-ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রয়োজনে মুঘল বার্তাবহের আগমন কি অস্বাভাবিক মনে করেন? মূর্খ নগরবাসী, মুঘল-পাঠান চিনিবার মতও তাহাদের চক্ষু নাই। যাহাই হউক্, এই মিথ্যা-প্রচারে আপনার ন্যায় উদারপ্রকৃতি বিচক্ষণ ব্যক্তি যে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া অনুদার মনের পরিচয় দিবেন, তাহ আমার ধারণাতীত। এক্ষণে আমার নিবেদন এই যে, শাসন-ব্যাপারে আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিতে আমি অক্ষম। রাজনীতি ও ধর্মনীতির ক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ধর্ম বা শাস্ত্রোপদেশের প্রয়োজন ঘটিলে, আপনার সকল বাক্য শিরোধার্য করিব। রাজনীতি-সম্বন্ধে আপনার দেশনা নিরর্থক, অনধিকারচর্চা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কর্তব্য-বিষয়ে আমি যথেষ্ট সচেতন আছি।”

দুষ্টচরিত্র চতুর্ভুজের এই বাক্‌পারুষ্যে মর্মাহত গুরু উপলব্ধি করিলেন, এই অমিতাচারী জনশত্রু দেশবৈরী অমাত্যদ্বয়কে দমন করিতে আর অধিক বিলম্ব হইলে রাজবিপ্লবের সমূহ সম্ভাবনা, হয়তো রাণীর অনবধানতার ফলে রাজদণ্ড স্খলিত হইয়া পড়িতে পারে। পাপাশয় চতুর্ভুজ মনে মনে সেই অভিসন্ধিই সযত্নে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু দুরাত্মার সবিশেষ জ্ঞান ছিল যে, প্রজাশক্তি রাণী ভবশঙ্করীর অনুকূল, অভীষ্ট সিদ্ধ করা তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত, সেইজন্য শক্তিশালী পাঠান-ওসমানের সাহায্য রাজপট্ট-আরোহণের সুদৃঢ় সোপান বলিয়া তাহার সুনিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল।

গুরু হরিদেব অদৃষ্টবাদীর ন্যায় ভাগ্যনিয়ন্তার উপর নির্ভর

করিয়া বসিয়া রহিলেন না। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন—অত্যাহিত আসন্ন। তিনি চতুর্ভুজের গতিবিধির প্রতি সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন, এবং অতি সংগোপনে চর লাগাইয়া সেনাপতির চিত্ত-সঞ্চিত অভিপ্রায়ের নিগূঢ় ইঙ্গিত ও দেশদ্রোহিতার প্রকৃত পরিচয় পাইলেন। বিপদ্ গোপন পদ-সঞ্চারে আগাইয়া আসিতেছে বুঝিয়া, তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না, সকলের অগোচরে কাটশাঁক্ড়া শিবনিবাসে উপনীত হইয়া রাণী ভবশঙ্করীকে প্রত্যাসন্ন বিপৎকালের আভাস দিলেন। রাণী গুরুদেবের সতর্ক বাণী মান্য করিয়া আপদুদ্ধারের নিমিত্ত সময় থাকিতে প্রস্তুত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। রাণীর তৎপরতায় আক্রমণকারী শত্রুগণ সম্পূর্ণ নির্জিত হইয়া তাহাদের দুষ্টকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিল প্রাণ-বলি দিয়া। গুরুদেবের কূটবুদ্ধির নিকট চতুর্ভুজ-প্রস্তাবিত ওস্মানের গুপ্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল।

রাণী ভবশঙ্করী কাটশাঁক্ড়া হইতে যাত্রা করিয়া সর্বাগ্রে গুরু হরিদেবের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদেব আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "আসিয়াছ—মা! এতদিনে কি তোমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে? তোমার আগমনে আমি প্রাণ পাইলাম। এবার আশা হয়, ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ভাগ্যাকাশে যে কৃষ্ণ খণ্ডমেঘ উদিত হইয়াছে, তাহা কাটিয়া যাইবে। পুনরায় মেঘাবৃত সূর্যের প্রকাশ দেখিবে দেশবাসী।"

রাণী আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন : "গুরুদেব, আপনারই স্নেহ-প্রীতির দাক্ষিণ্যে আমি অভাবনীয় দুর্ঘটনার কূটযন্ত্র হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আপনিই আমাকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দেব, ধর্ম-সাধনায় নির্বিরোধে আমি পরমা শান্তি-লাভের জন্য দেহ-মন সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতেও বাধা জাগিল কেন? আমার কি প্রাণের ধর্ম নাই? ভগবান্ কি আমাকে সর্ববিষয়ে রিক্ত পাথেয়শূন্য করিবেন?"

হরিদেব তাঁহাকে প্রবোধ-বচনে শান্ত করিয়া বলিলেন: "মা, প্রাণধর্ম কাহাকে বলো? তুমি এই রাজ্যের জননী, তোমাকে জননীর কর্তব্য করিতে হইবে, তোমার প্রজাপুত্রগণকে পালন করিতে হইবে, ইহাই তোমার প্রাণধর্ম। দেশমাতৃকার সেবাই তোমার সত্যধর্ম—অন্য ধর্ম নাই।"

রাণী ব্যাকুল-স্বরে কহিলেন : "আমি ধর্মাধর্ম বুঝিতে পারিতেছি না, আমাকে উপদেশ দিন্, আমি আপনার শরণাপন্ন। আমার মনের দ্বন্দ্ব দূর করুন।"

হরিদেব বলিলেন : "তুমি কি অবগত নও যে, ভারতীয় আর্যধর্ম আধ্যাত্মিক—যে-ধর্ম দ্বন্দ্বাতীত পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়াসী! তবে তোমার মনে দ্বন্দ্ব জাগিল কি জন্য? কারণ, তোমার মনের যে গভীরতা আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তাহার মধ্যে যে ক্রিয়া আছে—তাহা স্বাভাবিকী, তাহা সৃষ্টিসংকল্পের সহজ আনন্দে বেগবতী। তুমি কি জান না, নানা স্বভাবের নানা লোককে লইয়া সংসার গড়িয়া তোলাই তোমার কার্য, এই সংসারই তোমার আপনার, এ-স্থলে শ্রেয়োবুদ্ধিই দ্বন্দ্বের সমাধানে উদ্ভূত

হইয়া থাকে। সংসারে নিয়ত সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেই নিরন্তর সংগ্রামের মাহাত্ম্যবোধ তোমার মধ্যে সদাজাগরিত না থাকিলে, নানা ক্ষেত্রে তুমি অবতীর্ণ হইবে কিরূপে, কর্মের ভিতরে ইহার প্রয়াসই-বা প্রধান হইয়া উঠিবে কোন্ শক্তিতে? এখন তোমাকে বুঝিতে হইবে, তোমার স্বধর্ম কি? জননী জন্মভূমির রক্ষণ ও সেবাই তোমার স্বধর্ম, এই স্বধর্ম-পালনে তোমার যদি নিধনও হয়—তথাপি বরণীয়। ভুমি বিস্মৃত হইয়ো না আমাদের শাস্ত্রের বাণী। তুমি আজ প্রমাদগ্রস্তা। প্রমাদই সর্বনাশের কারণ। মহর্ষি সনৎসুজাত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন ঃ

'প্রমাদং বৈ মৃত্যুমহং ব্রবীমি।
তথাঽপ্রমাদমমৃতত্বং ব্রবীমি'॥

—প্রমাদই মৃত্যু, অপ্রমাদ অমৃতত্ব।...ভগবান্ বুদ্ধ জগৎকে অনুরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। অপ্রমাদই কর্মনীতি, তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য উদ্যম, ইহার বিপরীত অতিপত্তি বা কালাতি-বাহন, জড়ত্ব, অনবধানতা। এ বিষয়ে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ণোদ্যমে কর্মসাধন, কঠিন পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও অখণ্ড মনঃসংযোগ মানবজীবনের মুক্তির উপায়। তোমার নবজাগরণ হউক্ মহাশক্তিরূপে, শত্রুজয় করিয়া—অন্যায়কে দমন করিয়া যশোলাভ করো, সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করো। ইহাই তোমার ধর্ম। কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মের ফলে কদাচ নহে, কর্মের ফল-কামনা করিয়ো না, আবার নিষ্কর্মা হইয়া মূক-বধির পাষাণ-পূজায় কালহরণ করিয়ো না।"

রাণী গুরুদেবের পদপ্রান্তে তাঁহার শির লুটাইয়া দিয়া বলিলেনঃ "দেব, আপনার নবদীক্ষা আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করিলাম। আমার অন্ধ নয়ন-সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছে আলোকোজ্জ্বল কর্মের পথ। বুঝিয়াছি—কর্মই জীবন, কর্মই জ্ঞান, কর্মেই মোক্ষ।"

এই সময়ে রাণী এক পথচারীর করুণ কণ্ঠ-স্বরিত গান শুনিতে পাইলেন। গানের ভাষা শুনিয়া তিনি বিচলিত হইলেন। হরিদেব তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ "মা, এই পদটিই সমগ্র জনপদবাসীর ব্যথাহত মনের কথা। সমস্ত পদটি তোমার শ্রুতিগোচর হইলে বুঝিবে, তোমার ঔদাসীন্যের ফলে রাজ্যের আজ কি দুরবস্থা হইয়াছে। আজি দীনদরিদ্রের হাহাকারে প্রকৃতি পর্যন্ত বিষণ্ণ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।"

রাণী ক্ষুব্ধ মনে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন :

"সেনাপতি চতুর্ভুজ,
দাওয়ান দুর্লভ দত্ত :
রাণী থাকে কাটশাঁকড়ায়,
রাজ্য হ'ল লণ্ডভণ্ড।

আয় রাণী মা,
আয় গো ফিরে,
তোর তরে যে নয়ন ঝুরে।
সোনার দেশ হ'ল মাটি,
দুটোই যে পাষণ্ড ॥

পাঠান করে আনাগোনা,
ভয়ে প্রাণ বোধ মানে না।
ধর্ মা অসি মুক্তকেশী,
মুসলমানে দে গো হানা,
নহিলে দেশ বাঁচে না॥

বাপ গেল, মা আশা ছিল,
মায়ের কোলে থাক্‌বো ভাল।
কেমনে নিঠুর হ'য়ে
গেলি গো মা ছেড়ে দিয়ে!
আশা-ভরসা হ'ল যে মা—
তোর বিহনে সব পণ্ড॥" *

দেওয়ান দুর্লভ দত্ত এবং সেনাপতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তীর স্বার্থপরতায় দেশের মধ্যে যে সেই সময়ে মহা অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা এই গান হইতে রাণীর সহজেই বোধগম্য হইল। রাজার মৃত্যুর পর রাণী ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া কাটশাঁকড়া শিবনিবাসে অবস্থান করিতে থাকিলে, প্রজাগণ রাণীকে রাজদণ্ড পরিচালন করিবার জন্য অতি কাতরতার সহিত আহ্বান করিয়াছিল।...এক্ষণে দর্পণে প্রতিফলিত চিত্রের ন্যায় রাজ্যের বর্তমান অবস্থা তাঁহার চোখের উপর সুস্পষ্ট হইয়া । রাণী সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা ও অর্থগৃধ্নু দেওয়ানের

* এই ছড়াটি ভুরসুটে প্রচলিত। এখনও ভুরসুটের অনেক রমণীর মুখে ইহা শুনিতে পাওয়া যায়।

অন্যায্য কার্য বুঝিতে পারিয়া এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সনির্বন্ধ অনুনয় অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

তেজস্বিনী রাজ্ঞী রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে রাজ্য-শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর তিনি প্রজাগণের করভার লাঘব করিয়া দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমস্তই আবার শৃঙ্খলা-পূর্ণ হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়্‌যন্ত্র হইতেছে অনুমান করিয়া, তিনি আত্মরক্ষার জন্য অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

রাণী ভবশঙ্করী পাপাত্মা সেনাপতির শাসন-ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দিলেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি চতুর্ভুজকে অধীন সেনানী-পদে নিযুক্ত রাখিলেন বটে, কিন্তু পেঁড়ো-দুর্গাধিপ রাজবংশীয় বীর্যবান্ ও বিচক্ষণ ভূপতিকৃষ্ণকে আহ্বান পূর্বক সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক-পদে বরণ করিলেন। এতৎসত্ত্বেও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া, তাহাদের শিক্ষা ও পরিচালন-ভার তিনি স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিলেন।

বৃদ্ধ দেওয়ান প্রজা-পীড়ন দ্বারা যে-অর্থ অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিয়া স্ফীতোদর হইয়াছিলেন, তাহার মূল্য-দানে কড়াক্রান্তিতে তাঁহাকে সমস্ত পরিশোধ করিতে বাধ্য করা হইল। তদনন্তর তাঁহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। এইরূপে অতি অল্পকালের মধ্যে দেশে শান্তি-স্থাপন করিয়া রাণী নির্ভীকভাবে রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন।

৯

নাটিকা

ওস্‌মান মন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে গুপ্তভাবে প্রস্থান করিয়া নিরাপদে উড়িষ্যায় পৌঁছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ-মন শিবমন্দিরেই রহিয়া গেল। তাঁহার মানসচক্ষে রাণী ভবশঙ্করীর সেই দিব্যমূর্তি সর্বক্ষণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন—রাণী বামহস্তে চর্ম ও দক্ষিণহস্তে অসি ধারণ করিয়া মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মানা। আলুলায়িত সুচিক্কণ কেশপাশ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে দোদুল্যমান, দুই-একটি ভ্রমর-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ সুবর্ণসুন্দর ললাটতলে ও গোলাপ-গঞ্জন গণ্ডদেশে মৃদু পবনে ঈষৎ সঞ্চালিত। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী আরক্তিম আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নযুগলের উপরিভাগে সুবঙ্কিম সূক্ষ্ম ভ্রূযুগ সামান্য কুঞ্চিত, ক্ষুদ্ররন্ধ্র তিলফুলনাসিকা ঘনঘনশ্বাস-বিস্ফারিত, প্রবাল-বিনিন্দী নবনীতকোমল ওষ্ঠাধর ক্রোধবিকম্পিত, মুখ-মধ্যে দুই-একটি মুক্তানিন্দিত দন্ত সুপ্রকাশিত। সুন্দর গ্রীবাদেশ বামপার্শ্বে ঈষৎ হেলায়িত। পীনোন্নত সুবিশাল বক্ষঃদেশ পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত। গুরু নিতম্বের উপর সঙ্কীর্ণ কটিতট সুশোভিত। জগৎশাসন করিবার জন্যই যেন মহাশক্তি-রূপিণী বরাঙ্গনা মোহিনী মুর্তিতে অবতীর্ণা। এই ভয়ঙ্করী অসামান্য-লাবণ্যবতী রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্যই ওস্‌মান উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রবল মুঘলদিগকে ভুলিয়া রাণী ভবশঙ্করীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

যে পাঠান-সর্দার যুদ্ধক্ষেত্রকে তাঁহার জীবনের রঙ্গভূমি বলিয়া চিনিতেন, রণবাদ্য ও অস্ত্রে-অস্ত্রে উত্থিত উন্মাদরাগিণী শুনিলে যাঁহার শ্রবণ পরিতৃপ্ত হইত, অশ্বের রণনৃত্য দর্শনে যাঁহার অন্তরে উল্লাস-তরঙ্গ উদ্দাম হইয়া উঠিত, সেই যুদ্ধ-ব্যবসায়ীর রসহীন কর্কশচিত্ত এক্ষণে সম্মোহনবাণ-বিদ্ধ হইয়া দ্রব-রসধারে ক্ষরিত হইতেছিল। যে-সমস্ত রূপবতী ভাবিনী তাঁহার সঙ্গ-বিরহিত প্রাণে ম্রিয়মাণা হইয়া অরুচিকর দীর্ঘ দিনগুলি যাপন করিতেছিল, সহসা তাহারা বহুপ্রতীক্ষিত সাদর আহ্বান পাইল। অনাদৃত রঙ্গ্‌মহল আবার সুসজ্জিত হইল। বিশেষ করিয়া ডাক পাইল ওস্‌মানের প্রিয়পাত্রী ভোগ্যা-বেগম নবাববাঈ। সেই বিলাসভবনে নৃত্য-গীতের রসরঙ্গে ডুবিয়া গিয়া ওস্‌মান তাঁহার রূপতৃষাতুর মনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চেষ্টা করিলেন। নাটিকা-রাগিণী তাঁহার কর্ণে মধু-বর্ষণ করিতে লাগিল। শৃঙ্গার- ও লাস্য-নৃত্যবিলাসে কিংকিণী-শিঞ্জনে সারা রঙ্গ্‌মহল প্রমোদ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। মোহিনী নবাববাঈ প্রেমবল্লভের মনোরঞ্জন করিতে কোন আয়োজনের ত্রুটি রাখিল না। কিন্তু এই সঙ্গীত-নাট ওস্‌মানের কামনা আরও প্রবল করিয়া তুলিল। সমস্ত রূপ-আনন্দ ম্লান করিয়া দিয়া রাণীর অনিন্দ্য রূপ তাঁহার চোখের ’পরে নাচিতে লাগিল। প্রথম দর্শনেই তাঁহার চিত্তে যে-নাটিকার অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মধুর-সমাপ্তির দূর-ত্বরায়— তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত। সহসা তিনি রঙ্গ্‌মহল ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য অভীষ্ট-লাভ। তাঁহার বিশ্বস্ত নায়েব খিদ্‌মৎ খাঁকে তলব দিয়া তিনি সওগাতের

পেটিকা সাজাইতে বলিলেন।—এবার রাগরূপ-ভ্রষ্টা নাটিকার অভিনয় শুরু হইল।

অনন্তর ওস্‌মান চতুর্ভুজকে বশীভূত করিয়া রাণী ভবশঙ্করীকে ছলে-বলে-কৌশলে হস্তগত করিবার জন্য বহুমূল্য মণিমাণিক্য-উপহারের সহিত পীতমুণ্ডী সংজ্ঞিত এক ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণদূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ওস্‌মান দূতের সঙ্গে দিলেন দুইটি পেটিকা, রত্ন-পেটিকা ভিন্ন আর-এক পেটিকায় একটি খঞ্জর পাঠাইলেন চতুর্ভুজের বিশ্বস্ততা ছলিবার উদ্দেশ্যে। তিনি সে-সম্পর্কে দূতকে যথাযোগ্য নির্দেশ দিলেন।

ছদ্মবেশী দূত পীতমুণ্ডী চতুর্ভুজের বাটীতে আসিয়া আতিথ্য-গ্রহণ করিল এবং ওস্‌মান-দত্ত উপঢৌকন গোপনে প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিল: "পাঠানপতি আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য এই মহামূল্য রত্নাদি আপনাকে উপহার দিয়াছেন, এবং আরও তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যদি আপনি রাণী ভবশঙ্করীকে কোন কৌশলে তাঁহার আয়ত্তে আনিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ভুরস্থটরাজ্য জয় করিয়া আপনাকে অর্পণ করিবেন। আপনি পাঠানরাজের মিত্র করদরাজা হইয়া স্বচ্ছন্দে রাজ্য-ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। এখন আপনার মন্তব্য কি প্রকাশ করিয়া বলুন।"

চতুর্ভুজ ওস্‌মান-দত্ত রত্নাদি-লাভে অত্যন্ত আহ্লাদিত ও ভবিষ্যতে রাজ্য-লাভের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া দূতকে বলিতে লাগিলেন: "যাহাতে পাঠান-দলপতির মনোভীষ্ট পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে আমি যত্নবান্ আছি; কিন্তু আমি সচেষ্ট থাকিলেই

কার্য সফল হইবে না। তাঁহার অদম্য ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। আমার উপদেশানুসারে তিনি কয়েকজন অনুচর লইয়া নিশীথ-কালে ছদ্মবেশে কাটশাঁক্ড়া শিবমন্দিরে রাণীকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাণীর অনুচরীগণের সহিত যুদ্ধেই পশ্চাৎপদ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। অবশ্য রাণী কোন রক্ষী-সেনা প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন কি-না, সে সংবাদ সঠিক না পাইলেও, কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছি। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে এই কৌশল কোন্ চক্রীর? যাহাই হউক্—প্রত্যক্ষভাবে যে বীরপুরুষ কয়েকজন রমণীর সহিত যুদ্ধে বিকল হইয়া গিয়াছেন, হয়তো রক্ষিসেনাও জনকয়েক থাকিতে পারে, তথাপি তাঁহার ন্যায় রণ-দুর্মদ যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে আশা-ভরসা কোথায়? ইহা যে কোন্ মন্ত্রবলে সম্ভবপর হইল, তাহা আমার ধারণাতীত। মহাশক্তিশালিনী, বীরাগ্রগণ্যা রাণী ভবশঙ্করীকে লাভ করিতে চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সিংহ ভিন্ন অন্য কেহ সিংহীকে বশীভূত করিতে পারে না। ওস্‌মানকে মহাবীর বলিয়াই আমার ধারণা ছিল, কিন্তু শিবমন্দিরের ঘটনা দেখিয়া তাঁহার ক্ষেত্র-জ্ঞান সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে, এবং ঐ ঘটনার পর হইতে রাণীও আমার উপর সন্দিহান হইয়াছেন। ফলতঃ, আমার ক্ষমতাও অল্প-বিস্তর ব্যাহত হইয়াছে। ... আমি বিশেষ চিন্তিত হই নাই, কেননা পুনরধিকার প্রাপ্ত হইবার মন্ত্র আমার জানা আছে। কিন্তু ছলে ও কৌশলে রাণীকে হস্তগত করিবার আশা দুরাশা মাত্র। ইহা অবশ্যস্বীকার্য যে,

তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত উন্নত, তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ, তাঁহার শৌর্য বীর্য সাহস ও রণকৌশল অসামান্য। তিনি সমস্ত গুণের আধার। প্রজাগণ সকলেই তাঁহাকে জগদ্ধাত্রীরূপে উপাসনা করে। পাঠান-দলপতি ওস্‌মান রাণীর অগ্নিশিখাবৎ জ্বলন্ত চক্ষুর দিকে, বোধ হয়, চাহিতেই সমর্থ হইবেন না। তিনি যত বড় বীর বা রণকুশলী হউন, তথাপি রাণীর মুখামুখি দাঁড়াইলে—তাঁহাকে সম্মোহিত হইতেই হইবে, তাঁহার মধ্যে এক অভূতপূর্ব জড়িমা জাগিয়া উদ্যত হস্ত নিস্তেজ করিয়া দিবে, তাঁহার পৌরুষে ধিক্কার বাজিবে। তাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, রাণীকে বন্দিনী করিয়া সবলে গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সাগরে সেতু-বন্ধনের ন্যায় ব্যর্থ প্রয়াস ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। আমি তো তাঁহাকে পূর্বেই বলিয়া দিয়াছিলাম যে, তিনি যদি নিশীথকালে শিবমন্দিরে রাণীকে হস্তগত করিতে না পারেন, তাহা হইলে পুনরপি আমার সাহায্যের আশা করা আর বাঞ্ছনীয় নহে। আফগাননায়ক সে কার্যে বিফলমনোরথ হইয়া আবার কেন অগ্নি-মধ্যে ঝম্পপ্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন, বুঝিতে পারি না।”

চতুর্ভুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রয়োজন-বোধে পীতমুণ্ডী বিনীতভাবে বলিল: “রাণী মহাতেজস্বিনী রমণী বলিয়াই তো পাঠান-দলপতি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। ইহাও সত্য—আভ্যন্তর ব্যাপারে সমস্ত অন্ধিসন্ধি জানা আপনার সাহচর্য-ভিন্ন একেবারেই সম্ভবপর নহে। আপনার বন্ধুত্ব ও বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে

সাহসী হইয়াছেন। মিত্রের প্রতি অভিমান ত্যাগ করুন। মানুষমাত্রেরই ভুল হইয়া থাকে। পাঠান-নেতৃবরের প্রস্তাব এই যে, আপনি যদি পাঠান বীরগণের ও আপনার অধীন সৈন্য-গণের সাহায্যে ছলনার জাল পাতিয়া রাণীকে ধৃত করিতে চেষ্টা করেন, তবে অতিবলদৃপ্তা ও অসমসাহসিকী হইলেও রাণী আত্মরক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থা হইবেন না। যদি আপনার ভুরস্থট-রাজপট্ট লাভ কবিবার আশা থাকে, তাহা হইলে স্বার্থহানিকর বদ্ধমূল ধারণা জলাঞ্জলি দিয়া, ওস্মানের সহিত মিলিত হইয়া, আপনি অকুণ্ঠচিত্তে রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করুন। ইহাতে তিলমাত্র সংকোচ বা সংস্কারগত চক্ষুলজ্জার দুর্বলতা থাকিলে উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইবে না। আর যদি পাঠান-দলপতিকে সাহায্য করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহাও প্রকাশ করিয়া বলুন। আপনি এতদূর অগ্রসর হইয়া যদি কর্তব্য-স্থির করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাহা হইলে আপনাকে উভয়সংকটে পড়িতে হইবে। অবগুণ্ঠন টানিয়া নর্তন-চেষ্টা যেমন অসংগত ও হাস্যকর, তেমনি দুই বিপরীত দিক্ একসঙ্গে রক্ষা করিবার কূটকৌশল আপনাকে মরণের গহ্বরে লইয়া গিয়া ফেলিবে। আপনার এই ভীরু মনের কোন সমর্থন নাই। আপনার যাহা অভিরুচি—তাহাই স্থির করুন।"...অনন্তর দূত অপর পেটিকাটি চতুর্ভুজের হস্তে সমর্পণ করিয়া পুনরায় কহিল,—"এইটিও আফগান-নায়ক আপনাকে উপহার দিয়াছেন।"

চতুর্ভুজ প্রলুব্ধ হইয়া পেটীটি খুলিবামাত্র তন্মধ্যে একটি খঞ্জর অস্ত্র দেখিয়া সচকিত হইলেন ; পরক্ষণেই হস্ত অপসারিত

করিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন ঃ “আমাকে ভুলক্রমে, বোধ করি, এই অস্ত্রটি পাঠানো হইয়াছে, কিংবা পাঠানপতি আমার সহিত রহস্য করিয়াছেন, অথবা ইহা আমার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা ? কিন্তু ইহা আমি স্পর্শ করিব না, যিনি দিয়াছেন—তাঁহাকেই ফিরাইয়া দিবেন।”

ওস্‌মানের পূর্ব নির্দেশ-মত দূত চতুর্ভুজের মনের প্রতিক্রিয়া, ভাবব্যঞ্জক অঙ্গচালনা ও বাচনভঙ্গী নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে বলিয়া উঠিল ঃ “আপনাকে বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তিনি এই অস্ত্রটি উপহার দিয়াছেন, আপনি যদি প্রত্যাখ্যান করেন—তাহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। তাঁহার শক্তি থাকে—তিনি আপনার সাহায্য ব্যতিরেকেই ভুরস্‌্মুট রাজ্য অধিকার করিবেন। তিনি মুঘলদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য যে বিরাট্‌ আয়োজন করিতেছেন, এক্ষণে না-হয় মুঘল-আক্রমণ স্থগিত রাখিয়া তৎপরিবর্তে ভুরস্‌্মুটই আক্রমণ করিবেন। ভুরস্‌্মুটের কত শক্তি যে, পাঠান-দলপাত ওস্‌মানের সে ভীষণ আক্রমণ-বেগ সহ্য করিতে পারে ? উপরন্তু পাঠান-অধিনেতা যখন রাণীকে অঙ্ক-শায়িনী করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখন তিনি যে-কোন প্রকারে হউক্‌, তাহা কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি কি করিবেন—বিবেচনা করিয়া বলুন, আমি শীঘ্র গমন করিয়া পাঠানপতিকে জ্ঞাপন করি। তাঁহার প্রতি আপনার বিশ্বাসের মূল্য তিনিই নির্ধারণ করিবেন।”

দূতের কথায় চতুর্ভুজ ব্যস্ত হইয়া উত্তর করিলেন ঃ

"ওসমানের সহিত আমার বিশ্বাস-ও কথা-ভঙ্গ করা অপেক্ষা আমি প্রাণ-বলি দিতেও ইতস্ততঃ করিব না। তাঁহার প্রীতিই আমার কাম্য। আমি জানি—পাঠান-সর্দার ওস্‌মান একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, এবং তিনি যদি সসৈন্যে ভুরস্থট আক্রমণ করেন, তাহা হইলে তিনি এই ক্ষুদ্র রাজ্য বিধ্বস্ত করিতেও পারেন। কিন্তু এই জনপদ বিধ্বস্ত করিতে তাহাকেও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে···ইহা যেমন সত্য, তেমনই তাঁহার ঈপ্সিত এই শস্যশালী সমর-কেন্দ্রের সমস্ত সুবিধা লোপ পাইবে, এবং তাঁহাকে এরূপ দুর্বল হইয়া পড়িতে হইবে যে, তিনি বহুদিন যাবৎ মুঘলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রাণীকে কখনও তিনি বশীভূত করিতে পারিবেন না, এ তাহার দুরাগ্রহ। তবে সুকৌশলে যুদ্ধ করিতে পারিলে, তাঁহাকে বন্দিনী করা হয়তো সম্ভবপর, কিন্তু জীবিতাবস্থায় পাওয়া দুষ্কর। আমি রাণীর গতিবিধি ও তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সুযোগ মাত্র জ্ঞাপন করিতে পারি, কিন্তু সসৈন্যে ওস্‌মানের সহিত মিলিত হইয়া রাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারি না। কারণ, সৈন্যগণ যদি বুঝিতে পারে যে, আমি রাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় আমার আদেশানুসারে কার্য করিবে না, অধিকন্তু তাহারা বিদ্রোহী হইয়া আমাকেই নিহত করিবে। তদ্ভিন্ন রাণীর সন্দেহ নিরাকরণ করিতে না পারিলে, আমার পক্ষে সমগ্র ভুরস্থটবাহিনীর প্রধান সেনানী-রূপে পরিচালন-ভার পুনঃপ্রাপ্ত হইবার সুযোগ নাই। এরূপ অবস্থায় পাঠানসর্দার ওস্‌মানের

প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিলেও, আমি প্রকাশ্যভাবে রাণীর বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিব না।"

ধূর্ত পীতমুণ্ডী তখন মনে মনে স্থির করিল, তাহাকে নানা প্রলোভনে হাতে না রাখিলে, কার্যোদ্ধারের আশা অতি অল্প, এই বিবেচনায় প্রকাশ্যে কহিল: "আপনি কিরূপ সুযোগে রাজ্ঞীকে আক্রমণ করিতে পরামর্শ দেন, এবং কি প্রকার কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিলেই-বা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করা যায়?"

ইহার উত্তরে চতুর্ভুজ বলিলেন: "আজকাল রাজ্ঞী প্রায়ই ছাউনাপুর দুর্গে গমন করেন এবং সেখানে তিন-চারিদিন অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দুর্গের প্রায় দুই-এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বদিকে বাশুড়ী গ্রামে 'ভবানী' আখ্যায় তিনি এক দেবী-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রাজ্ঞী ছাউনাপুর দুর্গে গমন করিলেই অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী ও লোকজন সমভিব্যাহারে এই ভবানীদেবীর পূজা করিবার জন্য অন্ততঃ একদিন বাশুড়ী গ্রামে উপস্থিত হন। ...রাজ্ঞী যখন পূজায় নিযুক্তা থাকিবেন, সেই সময়ে ওস্‌মান যদি সসৈন্যে তাঁহাকে অবরোধ করিতে পারেন, তবেই তিনি রাণীকে করায়ত্ত করিতে কৃতকার্য হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চল অতিক্রম করিয়া বাশুড়ী গ্রামে উপনীত হইতে হইবে। পাঠানসেনা ভুরস্থুটরাজ্যে প্রবেশ করিলেই আমি সসৈন্যে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার ছলে পাঠান-সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইব। সেই সময়ে পাঠানসৈন্যগণও যেন ভয়ে উত্তরদিক্ অভিমুখে পলায়ন করিতে থাকিবে, এবং আমিও আমার সেনার সহিত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইব।

পরে পাঠানসৈন্য ছাউনাপুর-দুর্গের নিকটবর্তী হইলে, আমিও বশবর্তী সৈন্যদল লইয়া রাজধানী-অভিমুখে ফিরিয়া আসিব। আমার সৈন্যগণকে এই বলিয়া বুঝাইতে পারিব যে, শত্রুগণ ছাউনাপুর-দুর্গের সমীপবর্তী হইয়াছে এবং রাজ্ঞী স্বয়ং এই দুর্গে অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব দুর্গস্থ সেনা এই পলায়মান শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া অল্পায়াসেই নিহত করিতে পারিবে। এইক্ষণে রাজধানীতে ফিরিয়া যাওয়াই সমীচীন; কারণ, রাজধানী অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে…কি জানি, যদি কৌশলী পাঠানগণ অন্য সৈন্যদল ত্বরিতগতিতে লইয়া আসিয়া রাজধানী আক্রমণ করিয়া বসে। এই প্রণালীতে অতি সন্তর্পণে কার্য করিলে, আমার সৈন্যগণ এমন-কি রাজ্যস্থ কোন ব্যক্তি আমার উপর সন্দেহ করিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবে না, বরং সেই প্রত্যাসন্ন বিপদে নাগরিকগণ আমার সময়োচিত ব্যবস্থার অনুমোদন করিবে। সেই অবসরে পাঠানসৈন্যগণও নির্বাধে গন্তব্যপথ অতিক্রম করিয়া ছাউনাপুর দুর্গের সন্নিহিত হইতে পারিবে।…

এই কৌশলে রাজ্ঞীকে অবরোধ করিতে পারিলে, বোধ হয়, পাঠান-দলপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে। এক্ষণে আপনি উড়িষ্যায় গমন করিয়া ওস্‌মানকে এই কার্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলুন। আর তিনি যেন নির্দিষ্ট দিনে ভূরস্থট রাজ্যে প্রবেশ করেন। রাত্রিযোগে প্রবেশ করিয়া গোপনে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ অনেকখানি নির্বিঘ্ন হয়, এবং বিপদের আশঙ্কাও হ্রাস পায়। কারণ,

রাজ্য-মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলে, পাঠানসেনা ছাউনাপুরের নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই মহিষী এই সংবাদ পাইয়া সতর্ক হইতে পারেন। পঠানসৈন্যগণের দ্বারা আক্রান্ত হইবার অগ্রেই যদি রাজ্ঞী এই বিষয় অবগত হয়েন, তাহা হইলে মহাবিপৎপাতের সম্ভাবনা। যথার্থতঃ, রাজ্ঞী সসৈন্যে পাঠানগণকে বাধা দিবার জন্য বহির্গত হইলে, তাঁহার আদেশে আমাকেও আমার অধীন সৈন্যদল লইয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিতে হইবে, পাঠান-পক্ষের কোন সাহায্যেই আমি আসিতে পারিব না। তাহা হইলে সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হইয়া পাঠানসেনা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।...

ভীমকান্তরূপিণী রাজমহিষী যুদ্ধ-সাজে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণা হইয়া আহ্বান করিলে, শুধু সৈন্যগণ কেন, রাজ্য-মধ্যে এমন একটিও মানুষ থাকিবে না, যে রাণীর কথায় দেশের জন্য স্বীয় জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পরাঙ্মুখ হইবে। সুতরাং পাঠান-দল-পতি অতি সতর্কতার সহিত যেন রাণীকে আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হয়েন। বহুসংখ্যক সৈন্য আনয়নের কোন আবশ্যকতা নাই। কারণ, তাহাতে গুপ্ত চক্রান্ত প্রকাশিত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। পাঁচ-ছয়শত কিংবা এক বা সার্ধসহস্র বিখ্যাত সুনির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃসাহসী বীর-যোদ্ধার সহিত রজনীর অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া আসিয়া রাণীকে মন্দির-মধ্যে সহসা আক্রমণ করিতে পারিলে, ইষ্টাপত্তির আশা অবশ্যই করা যায়। রাজ্ঞী অসাধারণ শক্তিশালিনী সমরনিপুণা বীরাঙ্গনা হইলেও, কয়েকজন সহচরী ও কতিপয় রক্ষীকে সম্বল করিয়া একাকিনী যুদ্ধ করিতে সাহস

করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। আর যদিই-বা তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়েন, তাহা হইলে এত অধিকসংখ্যক বীরপুরুষের সহিত যুদ্ধে শীঘ্রই নিরস্ত্র ও পরাস্ত হইবেন। তখন তাঁহাকে হস্তগত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইবে না।"

যে রাগিণী নাটিকায় প্রমোদকক্ষের দৃশ্য উত্তোলিত হইয়াছিল, সেই নাটিকা রূপান্তরিত হইয়া রহস্যঘন চক্রান্ত-নাট্যে আত্মপ্রকাশ করিল।

অগ্নিচক্র

দূত পীতমুণ্ডী যথাসময়ে উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করিল। ওস্‌মান দূতের নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া, কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। একবার তিনি মনে করিলেন : এই দুষ্ট ও দুর্লভ বিষয়ে আগ্রহ অবৈধ, এই বিপজ্জনক কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজ্ঞী যেরূপ জনবরেণ্যা, স্বদেশের মঙ্গলরূপিণী ও শক্তিশালিনী, তাহাতে সেনানী চতুর্ভুজ বিশেষ কোন সাহায্য করিতে সাহসী হইবে না। অধিকন্তু রাজ্ঞী যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলে বিবেকবুদ্ধিহীন অব্যবস্থিতচিত্ত সুযোগবাদী সেনানায়ক আমারই বিরুদ্ধাচরণে হয়তো প্রবৃত্ত হইবে। যে কৃতঘ্ন, তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা বুদ্ধির পরিচয় নহে। আমি যদি উহার উপদেশমত গুপ্তভাবে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া রাজ্ঞীকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে কোনও প্রকারে অকৃতকার্য হই, তাহা হইলে আর আমাকে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না। তদুপরি সমরনিপুণা রাজরাণীর মনোহারিণী ভয়ঙ্করী রণোন্মত্তা মূর্তি অবলোকন করিলে, প্রাণে যেন কেমন একটা অভূতপূর্ব ভাবের উদয় হয়। ভয় ও ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার রাতুল চরণযুগলে স্বতঃই লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে আকাঙ্ক্ষা জাগে। চিত্তচকোর সেই মুখচন্দ্রসুধা অবিরত পান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়ে। তাহার বিরুদ্ধে অসি-ধারণ করিতে হস্ত ভয়ে কম্পিত হয়। যে-হস্ত নিষ্কোষিত

অসি-ধারণ করিয়া কত শত বীরপুরুষের মস্তক দেহ-বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, সেই দৃঢ় কর কি জানি কি ভয়ে ভীত হইয়া রাজমহিষীর বিরুদ্ধে অসি উত্তোলন করিতে সাহসী হয় না। সেদিন নিশীথ-কালে শিবমন্দিরে রাণীর সেই তীব্রজ্বালাময়ী মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্রাসে ও বিস্ময়ে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এমন সাহস হইল না যে, আমি সেই একাকিনী রমণীর সম্মুখীন হই।

এই বীরাঙ্গনা যদি পূর্বাহ্নে কোন উপায়ে সংবাদ পাইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে আমার নিস্তারের আর কোন পন্থাই থাকিবে না। তাহার সম্মোহন-বাণে বিদ্ধ হইয়া আমি পঙ্গু হইয়া যাইব। সসৈন্যে আমাকে সমরাঙ্গনে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে।...আবার তাঁহার মনে উদয় হইল যে, এরূপ রমণীরত্ন যে-পুরুষের বক্ষঃদেশে সুশোভিত না হইল, তাহার জীবনই বৃথা। প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া এই কামিনী-শিরোমণিকে অঙ্কশায়িনী করিতেই হইবে।

এইরূপ কামনানলে দগ্ধীভূত হইয়া ওস্‌মান হিতাহিতজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলেন। তিনি পাঠান-বারগণের মধ্য হইতে প্রায় পঞ্চশত বা ততোধিক বিখ্যাত রণকুশল যোদ্ধা মনোনীত করিয়া চতুর্ভুজ-নির্দিষ্ট দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে চতুর্ভুজ-প্রেরিত এক বিশ্বাসী গুপ্তচর ওস্‌মানের নিকট উপস্থিত হইল। চর ওস্‌মানকে কুর্নিশ করিয়া বলিল: "আগামী বৈশাখী অমাবস্যায় রাণী ছাউনাপুর-দুর্গের নিকটবর্তী বাশুড়ী গ্রামে নির্জন ভবানীদেবীর মন্দিরে তান্ত্রিক সাধনায় পূর্ণাভিষিক্তা হইবেন। সেই দিন রাণীর নিকট তাঁহার গুরুদেব

এবং দুই-চারিজন অনুচরী ও রক্ষী-অনুচর ভিন্ন আর কেহই থাকিবে না। সেনানায়ক বলিয়া দিয়াছেন যে, অমাবস্যা রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই মন্দির-মধ্যে রাণীকে অবরুদ্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এবং অভীষ্ট-লাভের পরে সেনানায়কের সঙ্গে আপনার চুক্তি অবশ্যই আপনি পালন করিবেন। অতএব আপনি যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে গুপ্তভাবে বাশুড়ী গ্রামে উপস্থিত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রস্তুত হউন্। সেনানায়ক আপনার ও আপনার সেনার পথ-প্রদর্শনের জন্য দুই-চারিজন চর সেই দিনে প্রেরণ করিবেন।"

ওস্‌মান দূতের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহানন্দে তাহাকে মূল্যবান্ পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং সেনানী চতুর্ভুজের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দূতকে বিদায় দিলেন।

অনন্তর ওস্‌মান যথাসময়ে পঞ্চশতাধিক সশস্ত্র অশ্বারোহী যোদ্ধার সহিত ভুরস্থুট উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তিন দিন অশ্বারোহণে আসিয়া ভুরস্থুটরাজ্যের উপকণ্ঠে তিনি উপস্থিত হইলেন। পাঠানপতি দিবসের অবশিষ্ট সময় সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া রজনীযোগে ভুরস্থুটরাজ্যে প্রবেশপূর্বক প্রান্তর ও বনপথে সাবধানে মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি অশ্বারোহণে গমন করিয়া প্রভাতের কিছু পূর্বে খানাকুলের নিকটবর্তী এক ঘন অরণ্যে সমস্ত দিন লুক্কায়িত থাকিবার জন্য প্রবেশ করিলেন।

সেই গহন বনদেশে একটি বিরাম-প্রশস্ত মুক্ত স্থান অন্বেষণ করিয়া সমাগত পাঠান-সৈনিকগণ দলপতি ও ফৌজদারদের জন্য

দুই-তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবির-সন্নিবেশ করিল। অতঃপর সাময়িক শ্রান্তি-অপনোদনের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া সকলে শুইয়া বসিয়া বা কথাবার্তায় সময় কাটাইতে লাগিল। পাঁচ দণ্ড বেলা হইলে তাহারা রন্ধন-কার্যে ব্যাপৃত হইল।

* * * *

মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে। আহারাদি সমাপন পূর্বক সৈন্যগণ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে। অশ্বসকল বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ আছে। কিন্তু ওস্‌মান ভোজনান্তে শিবির-মধ্যে এক লঘুখট্বায় অর্ধশায়িত অবস্থায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব তাঁহার মুখের রেখায় রেখায় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার স্থিরবিশ্বাসের ভিত্তি-কম্প হইতে লাগিল।

তাঁহার বিচারবুদ্ধি বলিল: "আমি কি তস্করের ন্যায় রসাতলগামী হীনপথ অবলম্বন করিয়াছি? ইহা তো অপৌরুষের নিন্দিত পথ!"

অন্যায়বুদ্ধি পরমুহূর্তেই বলিল: "আমি নিন্দা-প্রশংসার ঊর্ধ্বে। ক্ষেত্র বুঝিয়া কর্ম, নহিলে স্বার্থ-সিদ্ধির অনেক অন্তরায়। সাম্রাজ্য-ভাঙাগড়ার নূতন ইতিহাস রচনা করিবে এই ওস্‌মান। তাই আমার মূল-উদ্দেশ্য—ভূরসিট্টরাজ্য পদানত করা—শক্তি-ক্ষয় করিয়া নয়, কৌশলে। আর সেই সঙ্গে লাভ করিব শ্রেষ্ঠ নারীরত্ন—খোদার সওগাত। আজ সুযোগ মিলিয়াছে, তাহা তুচ্ছ করা যায় না।"

বিচারবুদ্ধি। কিন্তু খোদার কি মর্জি—তাহা তো বুঝিতে

পারিতেছি না। কি-রূপে রাণীর দেখা পাইব? রাণী বীর-রমণী, তাঁহার নারীবাহিনী বিশেষ ভয়ের কারণ। রাণীর রূপের বহ্নিতে আমার অন্তর পুড়িতেছে; সম্মোহ এমনি জিনিস যে, অসি কোষমুক্ত করিতে গিয়া আমার চঞ্চলহস্ত যদি অর্ধপথে থামিয়া যায়···তখন সেই কোমল-হস্ত যে কঠিন হইয়া বাজিবে। আর যদিই-বা আমি তাহাকে নিরস্ত করি, তথাপি সিংহীকে জীবন্ত বন্দিনী করা কি সহজসাধ্য?

অন্যায়বুদ্ধি। না—না, দুর্বলের তর্ক। কিসের সংশয়? একটা নারীর ভয়ে ভীত হইবে নির্ভীক ওস্‌মান? বঙ্গ-জয়ের পূর্বে ভুরসিট্টই আমার প্রধান লক্ষ্য। এখানে সৈন্যের ছাউনি গাড়িতে পারিলে আমার সর্বদিকেই সুবিধা। এই অবস্থা-বিবেচনায় যেরূপেই হউক্ রাণীকে হস্তগত করা রাজনীতির দিক্ হইতে নিতান্তই আবশ্যক। আর রাণী বাঙ্গালার সেরা সুন্দরী। আমি বীর, রুদ্রনারায়ণের তুলনায় কোন অংশেই হীন নহি, বরং বীরত্বে অনেক বড়। এই নারীরত্ন আজ অরক্ষিত, তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা কি আমার পক্ষে অন্যায়? বীর্য-মূল্যে আমি তাহাকে অধিকার করিব।

বিচারবুদ্ধি। কিন্তু যদি হার হয়, তবে কি অবস্থা হইবে? বাঙ্গালীর বিক্রম তো মুঘল-পাঠান সৈন্য অপেক্ষা কিছুতেই অল্প নহে।

ওস্‌মান আর চিন্তা করিতে পারিলেন না, প্রধান ফৌজ-দারকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার সহিত আসন্ন আক্রমণ ও ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা-শেষে বলিলেন: "আমার

এই অভিযানের সার্থকতা কোথায়, তাহা তুমি অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছ। ভূরসিটে খাদ্য-শস্যের অভাব নাই, মুঘলের সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের রসদের জন্য ভাবিতে হইবে না, তদুপরি এই জনপদের সৈন্য-শক্তি আমাদের অধীনে আসিবে। এই স্থানে কোন প্রকারে ঘাটি করিতে পারিলে সারা বাঙ্গালাকে খেলার পুতুলের মত লুফিয়া লইব। কিন্তু দণ্ডনায়ক চতুর্ভুজ রাণীর ভয়ে দুমনা-ভাব দূর করিতে পারে নাই। তাহাকে অনেক আশার লোভ দেখাইয়া হস্তগত করিয়াছি। পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া আমি যে কৌশল-জাল বিস্তার করিতে সংকল্প লইয়াছি, তাহা নিষ্ফল হইবার নহে। বাঙ্গালীর বিশ্বাসঘাতকতাই আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির উপায়। চতুর্ভুজের ন্যায় স্বদেশদ্রোহী স্বার্থান্ধ ঘৃণ্যরাই বিপক্ষদিগকে অপথের মধ্যে পথ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, রাজা হইবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া শত্রুর কবলে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা মহীয়সী নারীকে ঠেলিয়া দিতে চতুর্ভুজের কুণ্ঠা জাগে নাই। ধিক্ তাহার মনুষ্যত্বে! তবে আমার কার্যসিদ্ধি হইলেই আমি সন্তুষ্ট। আর সমস্তই অতলে তলাইয়া যাউক্। রাণী যদি আমার বশ্যতা স্বীকার একান্ত না করে, তাহা হইলে রক্ত বহাইবার প্রণালী আমার জানা আছে।"

এইভাবে ওস্‌মান সয়তানী অভিসন্ধি-রচনায় ও ভবিষ্য কর্মপন্থা নির্ধারণে সানন্দে নিবিষ্ট রহিলেন। এমন সময়ে 'কালু চাঁড়াল' নামক এক ব্যাধ পক্ষী ধরিবার জন্য ঐ বন-মধ্যে প্রবেশ করিল। বনের অভ্যন্তরে গমন করিতে করিতে ব্যাধ অরণ্য-মধ্যস্থলে সরস মৃত্তিকোপরি বহুসংখ্যক অশ্বের ক্ষুরচিহ্ন, তৃণ-

গুল্মাদি পদদলিত ও বহু বৃক্ষশাখা ভগ্ন দেখিতে পাইল। অনন্তর সে অত্যন্ত কৌতূহল-পরবশ হইয়া ধীরপদবিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে সেই বনচর দেখিতে পাইল—অনতি-দূরে নানাগণিত অশ্ব বৃক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং বৃক্ষতলে অনেক সশস্ত্র মুসলমান যোদ্ধা উপবেশন ও শয়ন করিয়া আছে। ব্যাধ ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল এবং ভাবিতে লাগিল যে, ব্রাহ্মণরাজার রাজ্য-মধ্যে এত মুসলমান যোদ্ধা বনের ভিতর লুক্কায়িত কেন? নিশ্চয়ই ইহাদের কোন দুরভিসন্ধি আছে। রাত্রিকালে, বোধ হয়, ইহারা দেশ-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইবে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্যাধ ধীরে ধীরে অরণ্য হইতে বহির্গত হইল এবং খানাকুলের কোতোয়ালের নিকট গমন করিয়া সমস্ত ব্যাপার আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। কোতোয়াল ব্যাধের বাক্য-শ্রবণে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কাকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ একজন অশ্বারোহীকে ভবানীপুরে রাণী কিংবা রাজনগরী-রক্ষক প্রধান রাজপুরুষ বা অধস্তন সেনানায়কের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নিজে চৌকিদার, পাইক ও বরকন্দাজ লইয়া অতি সতর্কতার সহিত খানাকুল, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগরগুলি রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কোতোয়াল-প্রেরিত অশ্বারোহী বার্তাবহ রাজধানীতে রাণী অনুপস্থিত অবগত হইয়া মন্ত্রণা-সচিব ও সেনাধিনেতার সন্ধান করিল, কিন্তু তিনিও সেই সময়ে পেঁড়োর গড়ে অবস্থান করিতে-ছিলেন, পরবর্তী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এক চতুর্ভুজই রাজধানীতে

বর্তমান। অতঃপর গত্যন্তর নাই দেখিয়া চতুর্ভুজের হস্তেই তাহাকে পত্রখানি তুলিয়া দিতে হইল। সেনাপতি চতুর্ভুজ কোতোয়ালের পত্র পাইয়া তাহার উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন: "একজন নিরক্ষর কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাধের কথায় একেবারে অস্থির হইয়া পড়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। তোমার যদি কিছু সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি তোমার অধিকারভুক্ত স্থানগুলি রক্ষা কর। আমি সত্বর এ-বিষয়ের প্রকৃত তথ্য অবগত হইয়া যাহা কর্তব্য হয়—করিতেছি। ইহার জন্য তোমাকে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না।"

কোতোয়াল চতুর্ভুজের সেই অসংগত উত্তর পাইয়া আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তিনি অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসী রাজকর্মচারী, সেজন্য গুরুতর ব্যাপারে এই প্রকার লঘুজ্ঞান করা দায়িত্বপূর্ণ পদাধিষ্ঠিত দণ্ডনায়কের পক্ষে অবৈধ বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিল। সংঘবদ্ধ বিধর্মিগণের অবাঞ্ছিত সমাগমের সংবাদ পাইয়াও যিনি অনুদ্‌বিগ্ন মনের পরিচয় দিতে অকাতর, সে-ক্ষেত্রে তাঁহার সুমতি ও সদুদ্দেশ্য এই কার্য-দ্বারা প্রমাণিত হয় না। সেই বিষয়টি চতুর্ভুজের আশ্বাস-বচনের উপর নির্ভর করিয়া উপেক্ষার যোগ্য নহে—ভাবিয়া, কোতোয়াল অনতিবিলম্বে পেঁড়োর গড়ে মন্ত্রী ও অধিনায়ক ভূপতিকৃষ্ণের নিকট বর্তমান অবস্থা-বোধক পত্র-সহ দুইজন দ্রুতগতি দূত প্রেরণ করিলেন।

এদিকে কোতোয়ালকে সেই পত্র লিখিয়া চতুর্ভুজ সংশয়পূর্ণ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন: "বোধ হয়, সব ব্যর্থ হয়। এই কথা লইয়া যদি একটা গোলযোগ হয়, তাহা হইলে আক্রমণের

পূর্বেই রাণী সমস্ত ব্যাপার অবগত হইবেন। যাহা হউক্, এক্ষণে আমাকে সসৈন্যে খানাকুল অভিমুখে গমন করিতে হইল।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেনানী চতুর্ভুজ সদলবলে খানাকুল যাত্রা করিলেন। একপ্রহর অতীত হইতে না হইতেই তিনি খানাকুলে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও কোতোয়াল আসিয়া চতুর্ভুজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা সেনানীর নিকট ব্যাধ-কথিত সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, সেনাপতি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন : "আশু ভয়ের কোন কারণ নাই। ব্যাধ-বাক্য সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। সে বন-মধ্যে কোন দস্যুদল দেখিয়া থাকিবে। অবস্থা যাহাই হউক্, আমি সসৈন্যে অদ্য রজনীতে এই স্থানে অবস্থান করিতেছি। কল্য প্রভাতে বন অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইবে। নগরবাসী ও নিকটবর্তী গ্রাম-বাসী ব্যক্তিগণ নির্ভয়ে অবস্থান করুন।"

সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে খানাকুলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া এবং তাঁহার ভরসা পাইয়া সকলেরই মন হইতে অনেকখানি আতঙ্ক বিদূরিত হইল। কোনরূপ সন্দেহ মনে পোষণ না করিয়া সকলেই নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখে রাত্রিযাপন করিতে লাগিল। কিন্তু চতুর্ভুজের অভয়-দান কোতোয়ালের মনঃপূত হইল না। চতুর্ভুজ তাঁহার ঊর্ধ্বতন রাজপুরুষ, সেই কারণে তিনি সহসা আপত্তি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। তবুও মৃদু প্রতিবাদের সুর তুলিয়া তিনি সেই রাত্রেই বনদেশ বেষ্টন করিবার প্রস্তাব জানাইলেন। চতুর্ভুজ সামান্য বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া নানা যুক্তির পাকে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। পরন্তু, কোতোয়াল

পাকচক্র কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি অনুচরগণের সহিত নগরের প্রান্তভাগ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন।

চতুর্ভুজ রজনীর অন্ধকারে গুপ্তভাবে অরণ্য মধ্যে ওস্‌মানের নিকট তাঁহার পূর্বপরিচিত একজন চর প্রেরণ করিলেন। চর ওস্‌মানের নিকট সাক্ষাৎ করিয়া বলিল: "সেনানীমহাশয় আপনাকে এই দণ্ডেই বাশুড়ী অভিমুখে অগ্রসর হইতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনি মাঠে মাঠে গমন করিবেন। পথ-নির্দেশ দিবার লোক গোপনে অপেক্ষা করিতেছে। আর এক প্রহর অতীত হইলে তিনিও সসৈন্যে আপনার অনুসরণ করিবেন, এই তাঁহার অভিপ্রায়।"

এতক্ষণ পূর্বকথামত ওস্‌মান বন-মধ্যে চতুর্ভুজ-প্রেরিত চরের জন্য অতি উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সন্ধ্যা-কালেই চরের আসিবার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব দেখিয়া ওস্‌মানের মন নানাপ্রকার সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান হইতে লাগিল।

তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন: বুঝি-বা চতুর্ভুজ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে সসৈন্যে নিধন করে। রাত্রি এত অধিক হইল, এখনও তাহার নিকট হইতে পূর্বকথামত কোন সংবাদ আসিল না কেন? স্ত্রীলোকের ভয়ে যে মরিয়া রহিয়াছে, তাহার উপর দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করা অবুদ্ধির কার্য। চতুর্ভুজ কি কথার মান রাখিবে? অতঃপর সন্দিহান হইয়া, তিনি অগ্রসর হইবেন কি উড়িষ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিবেন, এই চিন্তায় অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আশা ছলনাময়ী।

পুনরায় তিনি ভাবিলেন : এতদূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ পরাবর্তন স্বদলের নিকট অসম্মানের বিষয়। রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে যদি রাণীর বাসস্থান অবরোধ করা যায়, তাহা হইলে রাণী নিরুপায় অবস্থা-বিবেচনায় আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।... এইরূপ চিন্তাকুল অবস্থায় তিনি কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না, এমন সময়ে চতুর্ভুজের নিকট হইতে প্রার্থিত সংবাদ আসিল। চতুর্ভুজের উপর ওস্‌মানের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি চরকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন এবং মহোল্লাসে সদলবলে বাশুড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুশিক্ষিত অশ্বসকল প্রান্তরের উপর দিয়া যথাসম্ভব নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। যামিনীর শেষ-যামে তিনি পুড়্‌শুড়া গ্রামের নিকট দামোদর পার হইলেন।

তখন বৈশাখ মাস, দামোদরের উভয়তীরে বহুদূর পর্যন্ত বালুকারাশি ধু ধু করিতেছিল। একটি সংকীর্ণ ক্ষীণ অগভীর জলস্রোত সৈকতভূমির উপর দিয়া মন্দগতিতে প্রবাহিত হইতে-ছিল। অতএব দামোদর পার হইতে ওস্‌মান ও তাঁহার সৈন্যগণের কোন অসুবিধাই হইল না। দামোদর পার হইয়া ওস্‌মান সসৈন্যে বাশুড়ীর দিকে ধাবিত হইলেন।

সর্ববিধানদাতার অমোঘ বিধানে যে-অগ্নিচক্র ঘূর্ণমান, সেই প্রত্যাসন্ন চক্রাবর্তে পতিত হইয়া কোন্ পক্ষের ভাগ্য দগ্ধ হইবে এবং কাহারই-বা ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে—তাহা ভাবী ঘটনার গর্ভাঙ্কে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। পররাজ্যলোলুপ কামার্ত শত্রু ও মহীয়সী বঙ্গনারীর মধ্যে জয়-পরাজয়ের চরম পরীক্ষার সূত্রপাত হইল।

১১

পূর্ণ অভিষেক

আজ অমাবস্যা। ঘোরা কালনিশীথিনী নিবিড় অন্ধকারে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। রজনীর প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়। বাশুড়ী গ্রাম সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, যেন জনমানবশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। সকলেই স্ব স্ব গৃহমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কেবল একটি ব্রাহ্মণ-পরিবারের লোকজন গ্রামপ্রান্ত-স্থিত ভবানীদেবীর মন্দিরে যাতায়াত করিতেছে।

এই ব্রাহ্মণ-বংশে গোলোক চট্টোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ অতি-উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন। তিনি রাণীর অভিষেক-কার্য পরিদর্শন করিবার জন্য মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারই লোকজন নিতান্ত প্রয়োজন-হেতু মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতেছিল। মন্দিরের নিকটেই মহাশ্মশান এবং দিগন্ত-বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে রাণীর সমরকুশলা অনুচরীগণ উলঙ্গ কৃপাণ-হস্তে কালভৈরবীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। আর শঙ্করীর অংশভূতা রাণী ভবশঙ্করী ভবানীদেবীর সম্মুখে ব্যাঘ্রচর্মে উপবিষ্ট হইয়া কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রবুদ্ধ করিতে তৎপরা। দক্ষিণপার্শ্বে সাক্ষাৎ রুদ্রাবতার হরিদেব ভট্টাচার্য মহাশক্তির উদ্বোধনে রাণীকে সাহায্য করিতেছেন। এইরূপে অভিষেক-কার্য সম্পন্ন হইল। রাণী তদ্গতচিত্তে দেবী-চরণে প্রণতা হইলেন।

জগজ্জননী মহাশক্তি দেবী-মূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া সহাস্য-বদনে যেন রাণীকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেনঃ "বৎসে! তুই আজ কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিস্। তোর ক্ষুদ্রশক্তি মহাশক্তির সহিত মিলিত হইয়াছে। তুই আজ মহাশক্তিরূপিণী। বিশ্বের অশান্তি ও অমঙ্গল নাশ করিবার জন্য আমি যেমন মধ্যে মধ্যে দৈত্যদলন-ছলে রণরঙ্গে নৃত্য করিয়া থাকি, তুইও আমার শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া নরলোকের অমঙ্গল-নাশ ও শান্তি-বিধানের জন্য দুষ্ট দমন কর্। সুরাসুর, নর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতির শক্তিতে শক্তিমান্ হইলেও সকলেই মহাহবে তোর শক্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করিবে। পূর্বেই আমি তোর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোকে যে অসি দান করিয়াছি, সেই অসি-হস্তে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলে অনন্তশক্তি তোর শরীরে আবির্ভূত হইবে। ত্রিশূলপাণি পিনাকধৃক্ স্বয়ং পশুপতি, কিংবা চক্রগদাধারী গরুড়ধ্বজ নারায়ণও যদি তোর প্রতি বিমুখ হন, তথাপি দেবসহায়-পুষ্ট অমিত শক্তিশালী একাধিক বীরপুঙ্গব শত্রুরূপে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে, তাহারাও তোর শক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে। তুই জগদ্ধাত্রীরূপে জগৎ পরিপালন কর্।"

স্বপ্নঘোরে রাণী যেন এই দৈববাণী শুনিতেছিলেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল। দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার জন্য তিনি যেরূপভাবে ভূমির উপর শয়ান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অবস্থায় প্রায় এক দণ্ডকাল অতীত হইল।

গুরুদেব তারস্বরে দেবীর স্তব-পাঠ করিতে লাগিলেন।

ভবানীদেবীর প্রতিমূর্তি (ভবশঙ্করী-প্রতিষ্ঠিত)

[রায়বাঘিনী : পৃঃ ২৯৮]

ক্রমে ক্রমে রাণীর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসনে উপবিষ্টা হইলেন। তাঁহার দেহ হইতে এক অপূর্ব দিব্যজ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। পদ্মায়ত নয়নযুগল হইতে সুধারসসিক্ত অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার সুগম্ভীর সহাস বদনমণ্ডল এক অভাবনীয় স্বর্গীয় শ্রীতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

হরিদেব দেবী ভবশঙ্করীর এই অপূর্ব দিব্যমূর্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "মা গো! আমি আজ ধন্য হইলাম। তোর দেহ-মধ্যে মহাশক্তির ক্রীড়া দেখিয়া চক্ষু সার্থক হইল। আজ মহাশক্তি তোর দেহে আবির্ভূতা হইয়াছেন।"

ভবশঙ্করী ভক্তিভরে গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিলেন, পরক্ষণেই প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া তিনি মহাপ্রেম-প্রসন্ন অন্তরে ভাব-গভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন: "দেবী ভবানী—তুমিই পরমা গতি, পরমা নির্বৃতি! তুমিই আমাকে পরম কল্যাণ ও শান্তির পথে চলিত কর। তোমার জয়মন্ত্রের গুণে আমাকে কর সবলা।"

ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কিয়দ্দূরে বেগবান্ অশ্বের দ্রুতক্ষুরক্ষেপ-ধ্বনি উত্থিত হইল। অশ্ব নিমেষ-মধ্যে মন্দির-সন্নিকটে উপস্থিত হইল। মহিষীর অনুচরীগণ নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে অশ্বকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। অশ্বারোহী স্বীয় করস্থিত তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অশ্ব হইতে অবতরণ

করিল এবং 'রাণীমাতার জয় হউক্'—বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

দেবী ভবশঙ্করী এই শব্দে মন্দিরদ্বারে আসিয়া দেখিলেন—এক যোদ্ধৃ-বেশধারী যুবক তাঁহার অনুচরীগণের সহিত মন্দিরাভিমুখে আগমন করিতেছে। যুবক রাজমহিষীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মস্তক অবনত করিল। রাজ্ঞী প্রিয়সম্ভাষণপূর্বক ঘর্মাক্ত কলেবর পরিশ্রান্ত যুবককে আসন পরিগ্রহ করিতে বলিয়া ঘোর নিশাকালে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দূত অতি ব্যস্তভাবে নিবেদন করিল : "মহাপাত্র মহনীয় ভূপতি রায় আমাকে অনিবার্য কারণে আপনার নিকট অতি সত্বর পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আপনাকে একটি পত্র দিয়াছেন।" ...এই কথা বলিবামাত্রই দূত কোমরবন্ধে সযত্ন-রক্ষিত পত্রখানি বাহির করিয়া রাণীর পদপ্রান্তে অর্পণ করিল। রাণী পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হাস্য-কুটিল হইয়া উঠিল।

এই মর্মে পত্রখানি লিখিত হইয়াছে : "অদ্য মধ্যাহ্নকালে কালু চাঁড়াল নামক এক ব্যাধ পক্ষিশিকারের আশায় খানাকুলের নিকটস্থ অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সে বনপ্রবেশ-পথে বহু-অশ্বক্ষুর-চিহ্ন দেখিয়া কৌতুকাবিষ্ট চিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে থাকে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ব্যাধ দেখিতে পায় যে, বনমধ্যস্থ এক পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে বহুসংখ্যক সশস্ত্র মুসলমান যোদ্ধা বিশ্রাম করিতেছে এবং অশ্বগুলি বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যাধ দূর হইতে ইহা দেখিবামাত্র ধীরে

ধীরে পশ্চাৎপদ হইয়া বন হইতে বহির্দেশে আসে এবং সশঙ্কচিত্তে খানাকুলের কোতোয়ালের নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করে।

কোতোয়াল কালবিলম্ব না করিয়া নিকটবর্তী নগর ও গ্রাম সকল রক্ষা করিবার জন্য চৌকিদার ও পাইক নিযুক্ত করে এবং অধস্তন সেনানী চতুর্ভুজের নিকট এই অভাবনীয় সংবাদ প্রেরণ করে। তৎসত্ত্বেও চতুর্ভুজ আগত আততায়ীর এই সমাযোগের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না করিয়া, তাহাকে অযুক্তির কার্য-ধারা অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছে, এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই চতুর্ভুজ সসৈন্যে খানাকুল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। কিন্তু কোতোয়াল সেনানীর আশ্বাসে আস্থা-স্থাপন করিতে না পারিয়া আমাকে আসন্ন বিপদের আভাস দিয়া পেঁড়োর গড়ে দূত পাঠাইতে আলস্য করে নাই। আমিও তদ্দণ্ডে কয়েকজন রক্ষিসেনা লইয়া রাজধানীতে যথাসম্ভব শীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হই। আমি আসিবামাত্র প্রতিরক্ষিতা মন্ত্রীর নিকট শুনিলাম—রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় সেনানায়ক তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়াছে এইমত: 'অনুসন্ধানে জানিলাম ব্যাধের বার্তা ভিত্তিশূন্য, আশঙ্কার বিশেষ কোন কারণ নাই। রাণীমাতাকে এই সামান্য বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করি না। আমি আজ সসৈন্যে খানাকুলে রহিলাম। যদি ব্যাধের কথা সত্যই হয়, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস—শত্রুসংখ্যা নিশ্চয়ই অল্প হইবে, নহিলে তাহারা প্রকাশ্যভাবে আগমন করিতে সাহসী না হইয়া

বনমধ্যে লুক্কায়িত থাকিবে কেন? এই অল্পসংখ্যক শত্রু রজনী-যোগে যদিই-বা বাহির হইয়া রাজ্যের কোন অনিষ্ট করিতে প্রয়াসী হয়, তবে তাহাদের দুর্ভাগ্য কেহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না। আমার সৈন্যগণের অসি-প্রহারে নিশ্চয়ই তাহারা শমন-সদনে গমন করিবে, ইহাতে সন্দেহের কোন হেতু নাই। অতএব এই অনায়াসসাধ্য ক্ষুদ্র ব্যাপারে অযথা গুরুভার অর্পণ করিয়া রাজ্ঞীকে জানাইবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। বিশেষতঃ, অদ্য নিশাকালে তিনি অভিষিক্তা হইবেন । এই পুণ্যলগ্নে তাঁহাকে অকারণ উৎকণ্ঠিত না করাই যুক্তিসিদ্ধ। যদি জানাইবার একান্ত প্রয়োজন বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে কল্য প্রাতে তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠালেই চলিবে।'...

সেনানায়কের এই পত্রে স্থানিক-মন্ত্রী অত্যন্ত ভীত-চিত্তে কর্তব্য-নিরূপণে অক্ষম হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

আমি অপ্রত্যাশিতভাবে উপনীত হইতে তাঁহার মনে সাহস-সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত অবধারণে ইহাই জ্ঞানগম্য হয় যে, চতুর্ভুর্জ এক হেয় চক্রান্তে লিপ্ত আছে। ঘটনাটি এমনই অতর্কিত এবং পূর্বসংকল্পিত, ইহার প্রতিরোধ করিবার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত নহি। কিন্তু দেশরক্ষার পুণ্যকর্মে আমাদিগকে প্রাণ পণ করিতে হইবে। ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা থাকে, আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া শত্রুকে প্রতিহত করিতে খুব সম্ভব সমর্থ হইব। চতুর্ভুর্জ রাজধানীর প্রায় সমস্ত সৈন্য লইয়া খানাকুলে গমন করিয়াছে। নগর-দুর্গে মুষ্টিমেয় কয়েকজন রক্ষিসেনা রহিয়াছে মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে অন্ত রজনীতে রাজধানী-রক্ষার সম্পূর্ণ ভার কোতোয়াল ও প্রজাবৃন্দের উপর।

বিপদের আশঙ্কায় হতজ্ঞান হইবারই কথা, কিন্তু তাহাতে কোনরূপ ফলোদয়ের আশা নাই। আমি যথাযোগ্য রাজধানী-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি, এবং সুকৌশলে চতুর্ভুজকে আয়ত্তে আনিবার মন্ত্রণায় ব্যস্ত আছি। আমাদের প্রাণ থাকিতে এই রাজ-নগরের পতন হইবে না। আপনিও মন্দিরে একাকিনী আছেন। আপনি বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। কি জানি—যদি কাটশাঁকড়ার শিবমন্দিরে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহারই পুনরভিনয় হয়!

আমাদের সংশয়: বিধর্মী শত্রুর কেবল রাজ্যের দিকে লক্ষ্য, না—রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরীর উপরে লোলুপদৃষ্টি! এই কুটিলদৃষ্টি অবনমিত করিতে আমাদের সর্বজনের দৃঢ়সংকল্প হওয়া উচিত। পরস্বাপহারী আততায়ী পাঠানকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, তাহার মনুষ্যত্বঘাতী হীন কার্যকলাপের কঠিন প্রত্যুত্তর দিতে বাঙ্গালীর বুদ্ধিবল ও বাহুবলের অভাব ঘটে নাই।"

রাণী ভবশঙ্করী পত্রার্থ অবগত হইয়া অতিশয় চিন্তান্বিতা হইলেন এবং কর্তব্য অবধারণ করিবার জন্য গুরুদেবের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেবও অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন হইয়া ছাউনাপুর দুর্গ হইতে অবিলম্বে সৈন্য আনাইবার জন্য রাণীকে অনুরোধ করিলেন। রাণী ভবশঙ্করী গুরুবাক্য শিরোধার্য করিয়া দুর্গাধিপতির নিকট রাজধানী হইতে আগত দূতকেই প্রেরণ করিলেন। দূত দ্রুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া প্রভঞ্জন-বেগে ছাউনাপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

দেবী ভবশঙ্করী এই অলক্ষিত দুর্যোগ পুনর্বার ঘোরতররূপে ঘনায়মান দেখিয়া তাঁহার অনুভবগোচর হইল যে,তাঁহারই আত্ম-কৃত অপরাধের জন্য মহাসংকট আজ দ্বারে সমাগত; ছদ্মবেশী গৃহশত্রুর পরোক্ষ পরিচয় পাইয়াও—তিনি তাহার উচ্ছেদ না করিয়া, পক্ষান্তরে তাহাকে বৃদ্ধির সুযোগই দিয়াছেন। এ-স্থলে ক্ষমা দুর্বলতা, এ-বোধ তাঁহার কেন জাগিল না? আজ আর অনুতাপের সময় নাই, কর্মবিপাকে পড়িয়া এক্ষণে জীবনমরণ-সমস্যার সহিত সাক্ষাৎ হইতে চলিয়াছে, বীরদর্পে ইহার সমাধান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

তিনি বিক্ষুব্ধ মনে গুরু হরিদেবকে প্রশ্ন করিলেন: "ভগবন্, আমাকে বলিয়া দিন্—আমার তান্ত্রিক অভিষেকের দিনেই কেন কালবৈশাখী ঝঞ্ঝার মত এই দুর্লক্ষণ জাগিয়া উঠিল? তবে কি আমার সাধনায় ত্রুটি আছে, কিংবা ইহা জগজ্জননী মহাশক্তির পরীক্ষা?"

হরিদেব সুগভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন: "পরীক্ষাই বটে, অগ্নি-পরীক্ষা। আজ জগন্মাতা তোমার নিষ্ঠাভক্তির পরিচয় লইবেন। মূলে তুমি যে প্রমাদ করিয়াছ, তোমাকে সেই কৃতকর্মের প্রায়-শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এখন সংকল্প দৃঢ় কর, শত্রু-ক্ষয় করিবার জন্য নিশিত খড়্গ তোমার ভুজ-বদ্ধ হউক্। তোমার সম্মুখে এখন কঠিন কর্তব্য—আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা।"

ভবশঙ্করী অবিচলিত স্বরে কহিলেন: "গুরুদেব, আমি স্থির-সংকল্প। আশীর্বাদ করুন, আমি যেন এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি।"

হরিদেব আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন : "অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শুভদাত্রী বিশ্বেশ্বরীর কৃপা-প্রসাদ-বরে তুমি বিজয়িনী হও।"

কিন্তু সেই কঠোর-কোমল বরবর্ণিনীর মধ্যে যাহা অন্তরতম, তপস্যার যজ্ঞবেদীতে পূজ্যরূপে আসীন এবং স্নেহরসমূর্তিতে নির্মল অনির্বচনীয়, তাঁহারই কল্যাণতম প্রকাশ যেন রক্তমেঘে আবৃত হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে তাঁহার চিত্ত সংশয়-দোলায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। গুরু হরিদেব রাজ্ঞীর সেই ভাবান্তর নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে নানা তর্কে নানা যুক্তি-দানে অবশেষে সেই দুরূহ কার্য-সাধনে প্রবৃত্ত করিলেন। এই বৃত্তান্ত বারান্তরে উদ্‌ঘাটিত হইবে।

তদনন্তর ভবশঙ্করীর চিত্ত ভয়শূন্য হইল, তাঁহার অজ্ঞান-জনিত সমস্ত মোহ হইল ধ্বংস। তিনি দেবী- ও গুরু-প্রসাদে শক্তি ও স্মৃতি লাভ করিয়া সত্য আদেশ-পালনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার সকল সংশয় তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তিনি নূতন পণ গ্রহণ করিলেন দেবাদেশ-রূপে। প্রবল অন্যায়কে উচ্ছেদ করাই পরম ধর্ম। দেবতা আজ সংকট-মুহূর্তে দেখাইয়া দিয়াছেন ধর্মপথ। নির্ভীক উন্নতশির ঊর্ধ্বে তুলিয়া শত্রু-বধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এই মহাকার্যে মরণও যদি আসে— সেই মরণ দেখা দিবে গৌরব-মাল্য-হাতে। জীবনের রাজপথে দর্পের ধ্বজা উড়াইয়া রথ ছুটিবে জয়যাত্রায়। রাজলক্ষ্মী, উন্নতি ও বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে—এই চরম বিশ্বাস দৈববলে অনু-প্রাণিত বীরাঙ্গনার অন্তরে যেন বদ্ধমূল হইল। তাঁহার ধারণা জন্মিল—তিনি যেন পূর্ণতেজে জাগরিতা বৈরিঘাতিনী মহাশক্তি।

১২

কর্মসূত্র

রাণী ভবশঙ্করী অসীম তেজে জাগিয়া উঠিলেন। প্রত্যাসন্ন সংগ্রামের জন্য তিনি স্বল্প অবসরের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি তত্রত্য বাসডিঙ্গা-গড়ের রক্ষিসেনা এবং তাঁহার বলদৃপ্তা নারীবাহিনীকে সুসজ্জিত হইয়া সত্বর সে-স্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত নির্দেশ পাঠাইলেন।

বিপদে-স্থির অপূর্ব ধী-শক্তিসম্পন্ন গুরু হরিদেব তৎকালে এক নিভৃত কোণে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র-জপে নিরত ছিলেন না। তাঁহার অন্তর্যামী চক্রপাণি ভাবী ঘটনার যে-দৃশ্য নয়ন-সমক্ষে বিভাসিত করিলেন, তাহা তাঁহাকে আবেগ-চঞ্চল করিয়া তুলিল। আজি কুহুনিশীথিনীতে শেষ নিষ্পত্তি করিতে আসিতেছে বক্র-গমনা নিয়তি। ইহার এক হাতে ধ্বংস, অন্য হাতে প্রতিষ্ঠা। এই অবাধ্য নিয়তিকে বাধ্য করিতে হইবে। শত্রুকে বিনাশ করিবার যত কৌশল আছে, তাহা প্রয়োগ করিতে না পারিলে সর্বনাশ অনিবার্য। এইরূপ চিন্তার পর তিনি দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া শত্রুর গুপ্ত অভিযানের প্রকৃত সন্ধান আনিবার জন্য রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার এক সেবকের সহিত প্রত্যন্তে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থান মহাশ্মশানের সন্নিকট চণ্ডাল ও বাগদী প্রভৃতি জাতির বাসভূমি। ইহাদের বসতি দুই ভিন্ন পাড়ায় হইলেও, পাশাপাশি অবস্থান। হরিদেব চণ্ডাল-সর্দারকে

ডাক দিয়া—সেবককে পাঠাইলেন বাগদী-সর্দারকে সত্বর সংবাদ জানাইবার জন্য। কয়েক মূহূর্তের মধ্যে দুই সর্দার সংশয়াকুল-চিত্তে পরমারাধ্য গুরুদেবের নিকট উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ করিয়া দাঁড়াইল। গুরু হরিদেব তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন: "তোমরা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছ, কিন্তু শিয়রে যে শমন আসিয়া পড়িতে বিলম্ব নাই, তাহা কি ঘুনাক্ষরে জানিয়াছ?"

সর্দারদ্বয় সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল: "সে-কি—বড়ঠাকুর, আমরা কি দোষ করিলাম?"

হরিদেব বলিলেন: "দোষ ভাগ্যের...ইহার বিষময় ফল দেশের সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ভাগ্য-লেখা নিশ্চেষ্ট হইয়া মানিয়া লইলে—সেই কাপুরুষতা আমাদিগকে মৃত্যুর অন্ধকূপে লইয়া গিয়া ফেলিবে। মৃত্যু তো একদিন আসিবেই—তাহার সাধ্য-সাধনা করিতে হয় না, কিন্তু মানুষকে চিরদিন জীবন-রক্ষার জন্য পৌরুষের সাধনা করিতে হয়। বিরুদ্ধ ললাট-লিপি কুলিশ-ঘর্ষণে নিশ্চিহ্ন করিবার মত সাহসের দীক্ষা কি তোমাদের নাই? দুঃসাহসের খেলাই তো তোমাদের আনন্দ। তোমরা বনের বাঘ শিকার কর, হিংস্র বরাহকে বাণবিদ্ধ করিয়া স্বহস্তে তাহার দন্ত উৎপাটন কর, কিন্তু মানুষ-ব্যাঘ্র মানুষ-শূকর নিধন করিবার নিমিত্ত ধনুঃশর ধারণ করিতে কি তোমরা অক্ষম?"

উভয় সর্দার গর্বোদ্ধত কণ্ঠে উত্তর দিল: "আমাদের পরিচয় কি আপনার জানা নাই—প্রভু? মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতেও

আমরা ডরাই না। আজ্ঞা করুন—আমাদের কি করিতে হইবে? কি হইয়াছে আমাদের খুলিয়া বলুন।”

হরিদেব সঙ্কুচিত স্বরে জ্ঞাপন করিলেন: “আজ তোমাদেরই দেশের লোক মহাবিপদকে স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে…সে আর কেহ নহে—ভদ্রবেশী বর্বর দুর্মতি চতুর্ভুজ চক্রবর্তী। তাহার বিশ্বাসঘাতকতার সহায়তায় মুসলমান পাঠান পুনর্বার আমাদের দেশে হানা দিয়াছে। রাজধানী হইতে রাজা ভূপতি রায় এই দুঃসংবাদ পাঠাইয়াছেন। পূর্বের অভিজ্ঞতা অনুসারে আসন্ন ঘটনা সম্বন্ধে আমি বিচলিত হইয়াছি। আমার পূর্বদৃষ্টি প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে যে, পাঠান-শত্রু সদলবলে তোমাদের রাণী-মাতাকে বন্দিনী করিয়া এই দেশ কবলিত করিবার উৎসাহে পথে-প্রান্তরে অগ্রসর হইতেছে। তোমরা কি তাহাদের অগ্রগমনে বাধা সৃষ্টি করিতে অসমর্থ?”

দুই সর্দারই চঞ্চল হইয়া উঠিল, উভয়ে সামান্যক্ষণ পরামর্শ করিয়া বলিল: “আমাদের কি কাজ—এখন আজ্ঞা করুন। শত্রু প্রবল, কি উপায়ে তাহাদের বাধা দিব? মা ভবানীর নামে—আমাদের রাণী-মার নামে শপথ করিতেছি, জীবন তুচ্ছ, যদি মরি—বীরের ন্যায় মরিব।”

হরিদেব তাহাদের সস্নেহ তিরস্কার করিয়া বলিলেন: “তোমরা কি পথ দেখিতে পাইতেছ না? তোমরাও কি ভয়ে বিমূঢ় হইলে? যে ভয় করে—ভয় তাহাকেই পাইয়া বসে। স্বল্প সময়, ইহার মধ্যেই আমাদের আত্মরক্ষার জন্য যথাসম্ভব সমরায়োজন করিতে হইতেছে। দুর্গ হইতে সৈন্য আসিতেছে,

আরও সাহায্য যাহাতে আসে—তাহারও চেষ্টা চলিতেছে। এক্ষণে তোমাদের কর্তব্য—শত্রুদের অগ্রগতিতে বিলম্ব ঘটাইতে হইবে, তাহা হইলে আমরা প্রস্তুত হইবার অবসর পাইব। তোমরা কয়েকজন অব্যর্থসন্ধানী তীরন্দাজ অদৃশ্যভাবে শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবে, এবং সুযোগ বুঝিয়া পাঠান-সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগে অতর্কিতে বিষাক্ত বাণ হানিবে। পথের নির্দেশ যে তোমাদের দিতে হইবে না—তাহা আমার জানা আছে। নিঃসন্দেহই এই কার্য-দ্বারা আমাদের অশেষ উপকার হইবে। অবশ্য যুদ্ধ নিবারণ করা অসম্ভব, এই বিবেচনায় যুদ্ধক্ষেত্র আমাদের অনুকূল করিয়া তোলা প্রয়োজন। ভবানী-মন্দির-প্রাঙ্গণের অনতিদূরে যে বিস্তৃত প্রান্তর—ঐ স্থানেই শত্রুসেনার সম্মুখীন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কিন্তু প্রান্তরের তিনদিক্ প্রাণপণে পরিখাকৃত করিতে পারিলে শত্রুগণকে প্রতিরোধ করা কষ্টসাধ্য হইবে না। অগভীর গড়-খাত খনন করিলেই উপস্থিত-ক্ষেত্রে কার্যোদ্ধারের সমূহ আশা আছে, কেননা তিনদিক্ বেষ্টন-পূর্বক খাত দাহ্যপদার্থে পূর্ণ করিয়া উপযুক্ত সময়ে আগুনকে কাজে লাগাইতে হইবে। দেশের সন্তান তোমরা—এই দেশের মাটি তোমাদের স্বর্গ—এই জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার মহান্ কর্তব্য তোমাদের আহ্বান করিতেছে, আজিকে অসাধ্য-সাধন করিতে হইবে। তোমরা বাল-বৃদ্ধ-যুবাকে ডাক দাও, তাহারা সকলে দৃঢ়-ক্ষিপ্র হস্তে ধারণ করুক্ খনিত্র। দৈব সহায় হইবে। শত্রুর গতি-পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া যতদূর সম্ভবপর বিলম্ব ঘটাইবার কঠিন সংকল্প

তোমাদের হউক্, সেই অবসর-কালে আততায়ীর মৃত্যু-ফাঁদ-রচনা সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। যাও তোমরা—নির্ভীক চিত্তে মায়ের কর্ম সাধনে তৎপর হও। তোমাদের উপর আমার অটুট বিশ্বাস আছে, তোমাদের মা আজ বিপন্ন, তোমরা তাঁহাকে বাঁচাইবে না তো কে বাঁচাইবে? তোমাদের জয় হউক্।”—

হরিদেব তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া দুই সর্দারের ললাটে ভবানীদেবীর মন্ত্রপূত সিন্দূর-তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন, উভয়ের হস্তে দিলেন নির্মাল্য ও সিন্দূরপত্র। তাহাদের পুনর্বার উৎসাহিত করিয়া বলিলেনঃ “এই চরম মুহূর্তে জননীর প্রত্যাদেশ সকলকে জানাইয়া দাও, প্রতিজনের ভালদেশে ঐ পবিত্র সিন্দূর পরাইয়া দাও, পূজার ফুল দিয়া মহাশক্তির আশিস্ জ্ঞাপন করো, বলো— এই সন্তানের অক্ষয়কবচ।”

হরিদেব সে-স্থান হইতে ভবানী-মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চণ্ডাল-ও বাগদী-সর্দার নিজ নিজ পল্লীর স্ত্রী-পুরুষকে জাগাইয়া তুলিয়া প্রস্তাবিত সকল কার্যে সামর্থ্য-অনুসারে নিযুক্ত করিল। একদল তীর, লাঠি, ভল্ল প্রভৃতি চালনে সুদক্ষ চণ্ডাল ও বাগদী শত্রুর পথে বাধা সৃষ্টি করিতে ছুটিল, এবং বহু শ্রমশীল সবল লোক ক্ষিপ্রহস্তে পরিখা-খননে ব্যাপৃত হইল।

গুরু হরিদেব একদিকে যেমন স্থানীয় চণ্ডাল ও বাগদী এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর জনগণকে শত্রুদিগের বাধা-সৃষ্টির দুরূহ কার্যে প্রবর্তন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মৃত্যু-জাল পাতিবার ব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদিকে রাণী ভবশঙ্করী রাজধানীতে ভূপতিকৃষ্ণের নিকট এক গোপন সংবাদ-প্রেরণের

সুনিপুণ কার্য-প্রণালী স্থির করিতেছিলেন। রাজ্ঞী তাঁহার তন্বঙ্গী পার্শ্বচারিণী সুচতুরা বগলার হাতে একটি অভিজ্ঞান-চিহ্নিত আদেশ-লিপি দিয়া রাজধানীতে পাঠাইলেন, তাহার সঙ্গে গেল দুইজন বিশ্বাসী দেহরক্ষী। মহাপাত্রকে উদ্দিষ্ট সেই অনুজ্ঞা-পত্রে ছিল: "দেশদ্রোহী কৃতঘ্ন চতুর্ভুজকে অতর্কিতে সুকৌশলে বন্দী কর, এবং রাজনগরী-রক্ষার যথাবিধি আয়োজন সম্পূর্ণ করার সমস্ত দায়িত্ব তোমার উপর। এদিকে শত্রুর আক্রমণ আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাইতেছি। এখানে প্রতিরোধের সুব্যবস্থা করিতে আমরা ব্রতী আছি। সাগ্নিকের হোমাগ্নি-রক্ষার ন্যায় গুরুদেব রহিয়াছেন আমার পার্শ্বে। আশা হয়—দৈবানুকূল্যে শত্রু পুনরায় অপ্রত্যাশিত মৃত্যুজালে আবদ্ধ হইবে।"

অতঃপর শত্রুদলের সম্ভাবিত অভিযানে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল দেখিয়া—রাজ্ঞী অনেকখানি আশ্বস্ত হইলেন।

রাজ্ঞী-প্রেরিত পূর্বোক্ত দূত অর্ধ-ঘণ্টার মধ্যে ছাউনাপুর দুর্গ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীর মোহরাঙ্কিত লিপি প্রতিহারীর হস্তে অর্পণ করিয়া শীঘ্র উহা দুর্গাধিপতির নিকট প্রেরণ করিতে বলিল। দুর্গাধ্যক্ষ রাজ্ঞীর স্বহস্ত-লিখিত পত্র পাঠ করিবামাত্র দূতকে দুর্গাভ্যন্তর-কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে নিদ্রিত সৈন্যগণকে জাগরিত করাইয়া অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইবার আদেশ দিলেন।

দুর্গ-মধ্যে মহাহুলস্থুল পড়িয়া গেল ; সৈন্যগণ সুপ্তোত্থিত হইয়া রণবেশে সুসজ্জিত হইতে লাগিল। যুদ্ধাশ্ব ও রণহস্তী-সকলের সমর-সজ্জা পূর্ণোদ্যমে চলিল। অশ্বগণের হ্রেষারবে ও বারণের বৃংহিতধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল শব্দায়মান হইয়া উঠিল। অল্পকালের মধ্যে একশত রণহস্তী এবং পঞ্চশত অশ্ব যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল।

দুর্গাধিপ দুর্গরক্ষার্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য দুর্গমধ্যে রক্ষা করিয়া অধিকাংশ যোদ্ধা নিজের সঙ্গে লইয়া রাজ্ঞীর সাহায্যকল্পে ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক শত হস্তী-পৃষ্ঠে এক শত রণকুশল বীর অগ্ন্যস্ত্র, বারুদপূর্ণ গোলক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইল ; তৎপরে পঞ্চশত পদাতিক সৈন্য অসি-চর্ম লইয়া বীর-পদ-ভরে মেদিনী কম্পিত করিতে করিতে কুঞ্জরগণের অনুসরণ করিতে লাগিল। সর্বশেষে পঞ্চশত যোদ্ধা পঞ্চশত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া চলিল। তাহাদের কটিবন্ধে তরবারি, বামস্কন্ধনিম্নে পৃষ্ঠদেশে ঢাল, দক্ষিণ হস্তে ভীষণ বর্শা শোভা পাইতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সৈন্যগণ সুশৃঙ্খলভাবে ভবানীদেবীর মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হইল এবং বীরকণ্ঠে দিগন্ত কম্পিত করিয়া রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর জয়-ঘোষণা করিল।

হরিদেব লক্ষ্য করিলেন—একে একে দৈব-কৃপায় সমস্তই অনুকূল হইয়া উঠিতেছে। তিনি আশান্বিত হইয়া রাজ্ঞী ভবশঙ্করীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : "মা, আমার এতক্ষণে দৃঢ়বিশ্বাস জাগিয়াছে—দেবতার অমোঘ বিধান তুমি শীঘ্রই

প্রত্যক্ষ করিবে। শত্রুরা তাহাদের নিদারুণ অন্যায়ের প্রথম উত্তর পাইবে পথিমধ্যে মারণাস্ত্রের প্রহারে, দ্বিতীয় উত্তর যুদ্ধস্থলে। আগুনের বেড় দিয়া শত্রুদিগকে পুড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও—বীরাঙ্গনা!"

রাজ্ঞী গুরুদেবের আশ্বাস-বচনে উল্লসিতা হইলেন। তিনি আর কালক্ষেপ করিলেন না। রাজ্ঞী স্বয়ং রণবেশে সজ্জিতা হইয়া মন্দির-দ্বারে দণ্ডায়মানা হইলেন এবং সমাগত সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিবার জন্য সুমধুর গম্ভীরস্বরে কহিলেন: "বীরগণ! অদ্য রজনীতে মহাপাত্রের নিকট হইতে আমি সংবাদ পাইলাম যে, খানাকুলের নিকটস্থ নিবিড় অরণ্যে বহুসংখ্যক মুসলমান যোদ্ধা দিবাভাগে লুক্কায়িত ছিল। সন্ধ্যার সময় সেনানী চতুর্ভুজ সসৈন্যে খানাকুলে উপস্থিত হইয়াছে। চতুর্ভুজের উপর আমার বিশ্বাস অতি-অল্প। আমার মন যেন আমাকে বলিতেছে যে, তাহারই ষড়যন্ত্রে অদ্য রজনীতে রাজ্য-মধ্যে এক মহা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস—চতুর্ভুজ আমাকে রাজধানীতে অনুপস্থিত দেখিয়া, শত্রুগণকে সাহায্য করিবার জন্য সসৈন্যে খানাকুলে উপস্থিত হইয়াছে এবং এই সংবাদ আমাকে না জানাইবার জন্য স্থানিক মন্ত্রীকে অনুরোধ করিয়াছে। পাপিষ্ঠের মনোভিলাষ যাহাতে পূর্ণ না হয়, তোমরা তদ্বিষয়ে মনোযোগী হও।"

রাজ্ঞীর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই দুর্গাধিপ ক্রোধে অধীর হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে ভীষণ গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন: "মাতা! আজ্ঞা করুন, এই মুহূর্তেই সদলবলে

রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করি। দেখি, কোন্ শক্তিবলে পাপাত্মা চতুর্ভুজ রাজ্যের অনিষ্ট-সাধনে কৃতকার্য হয়! আমাদের মধ্যে একজনেরও ধমনীতে যতক্ষণ রক্ত প্রবাহিত হইবে,ততক্ষণ শত্রুগণ রাজধানী হস্তগত করিতে সমর্থ হইবে না। আর আপনি অবিলম্বে রাজবলহাটের দুর্গাধিপের নিকট দূত প্রেরণ করুন, তিনিও যেন লশকরডাঙ্গা হইতে সমস্ত সৈন্য লইয়া আমার সহিত রাজধানী-রক্ষায় নিযুক্ত হন। আমরা দুইজনে সসৈন্যে মিলিত হইলে, চতুর্ভুজ পাঠানগণের সহিত মিলিত হইয়াও রাজ্যের কোন অনিষ্ট-সাধন করিতে পারিবে না। অধিকন্তু চতুর্ভুজ-চালিত সৈন্যগণ তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, চতুর্ভুজের উপর কোন সৈন্যই আন্তরিক সন্তুষ্ট নহে।"

রাজ্ঞী দুর্গাধিপের একনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া প্রীত মনে কহিলেন: "রাজধানী-রক্ষার ভার যোগ্য ব্যক্তিই গ্রহণ করিয়াছেন। অবস্থা গুরুতর বুঝিলেও তিনি হতবুদ্ধি না হইয়া, বরং যথাযথ ব্যবস্থা করিতে যত্নবান্ হইবেন। ইতোমধ্যে তিনি নিশ্চয়ই পেঁড়ো-ও দোগাছিয়া-গড় হইতে সত্বর যোধগণকে আনাইয়া সৈন্যসমাবেশ করিয়াছেন। তিনি মহাপাত্র ভূপতিকৃষ্ণ। তাঁহার প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি।"

তথাপি দুর্গাধিপ সপ্রশ্নদৃষ্টিতে রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া বলিলেন: "শত্রু দুর্মদ এবং সমর-কুশল, বিপক্ষ সৈন্য-সংখ্যা অধিক হইলে বিপদ্ নিবারণ করা একপ্রকার চিন্তাতীত। তদুপরি দুশ্চরিত চতুর্ভুজের সাহায্য শত্রুদলকে আরও পুষ্ট

করিবে। পূর্বেই হীনচেতা চতুর্ভুজকে নিরাকৃত করিয়া, তাহাকে নিরস্ত্র-অবস্থায় বন্দী করাই উচিত।"

রাজ্ঞী কহিলেন: "তোমার এই সংশয় অচলা দেশভক্তিরই প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু বীর, দুশ্চিন্তা স্বাভাবিক বটে—তত্রাপি ত্যাগ করিতে বলিতেছি। কারণ, কার্য-পরম্পরা বিশ্লেষণ করিয়া গুরুদেব এবং আমার ইহাই ধারণা হইয়াছে যে, পাঠান-সর্দার কূটকৌশলে দক্ষ—সে চতুর্ভুজের উপদিষ্ট প্রণালী-মতে আপাততঃ রাজধানী আক্রমণ করিবে না। সে আসিতেছে তস্করের ন্যায় সঙ্গোপনে। তাহার দুরভিসন্ধি—এই রাজ্যের শীর্ষে যে রাজমহিষী বিরাজ করিতেছে, তাহাকে অতর্কিতে নিরুপায় অবস্থায় করায়ত্ত করা। তাহা হইলেই সে জানে—এই ভূরিশ্রেষ্ঠপুর সহজেই তাহার পদানত হইবে, রাজধানী তো চতুর্ভুজ তাহার হস্তে স্বচ্ছন্দে তুলিয়া দিবে।"

দুর্গাধিপ সংশয়াকুলচিত্তে পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন: "কিন্তু মাতঃ, চতুর্ভুজের অধীনে সৈন্য-শক্তি রহিয়াছে, সে যে সুযোগ ধরিয়া রাজধানী অধিকার করিয়া বসিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি? এ অভিযান যে দ্বিমুখী বোধ হইতেছে। আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না।"

রাজ্ঞী দুর্গাধিপের বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন: "হে রাজভক্ত বীরচূড়ামণি! তোমার বীরত্ব সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি, তোমার বীর্যবহ্নি শত্রুকুলকে ভস্মীভূত করিতে পারে। কিন্তু বীরবর! ইহা স্থির জানিয়ো, আমি সুস্থ শরীরে স্বাধীনভাবে রাজ্য-মধ্যে বর্তমান থাকিতে

চতুর্ভুজ পাঠানগণের সাহায্যে কখনও রাজধানী আক্রমণ কিংবা রাজ্যের অন্য কোন প্রত্যক্ষ অনিষ্ট-সাধন করিবে না। আমি যেন দিব্যচক্ষে দর্শন করিতেছি—চতুর্ভুজ আমাকে করায়ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে পাঠান বীরগণকে আহ্বান করিয়াছে। তাহার ধারণা—আমি আজ ভবানীদেবীর মন্দিরে একরূপ অসহায় অবস্থায় সাধনায় নিযুক্ত থাকিব। এই অবসরে, পাপিষ্ঠ লুক্কায়িত পাঠানগণকে রজনীর অন্ধকারে মন্দির-মধ্যে আমাকে আক্রমণ করিবার পরামর্শ দিয়াছে। পাপাত্মা চতুর্ভুজ পাঠানদিগকে এইরূপে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবে না। এমন-কি, সৈন্যগণকেও তাহার এই দুরভিসন্ধির কথা সে অণুমাত্র জানিতে দিবে না, কারণ—তাহারা ইহা জানিতে পারিলে কখনও আমার বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইবে না। আমি অনুমান করিতেছি—শীঘ্রই পাঠানগণ রাত্রির অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া মন্দির আক্রমণ করিবে। আমি ইচ্ছা করি না যে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যবনপদস্পর্শে পবিত্র স্থান কলুষিত হইতে দেওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে। গুরুদেবেরও অভিপ্রেত—যুদ্ধক্ষেত্র হইবে অন্যস্থানে, নাটমন্দিরে নহে। আর উনি সে-স্থানে শত্রুর মৃত্যুগহ্বর প্রস্তুত করিতে বহুশত চণ্ডাল ও বাগদী কর্মীকে নিযুক্ত করিয়াছেন। হয়তো কার্য সমাপ্তপ্রায়। অতএব, হে বীর! মন্দিরের অনতিদূরে উন্মুক্ত প্রান্তরে সৈন্যসজ্জা কর, বিলম্ব করিয়ো না। শত্রুগণ শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে। মহাবিপদের করালছায়া এইখানেই ঘনাইয়া

আসিতেছে। ভীমতেজে ইহার মরণ আনিয়া দিয়া আলোকের জয়-ঘোষণা করিতে হইবে।"

অনন্তর দুর্গাধিপ যথাবিধি সৈন্য-সংস্থানে মনোনিবেশ করিলেন।

সেই সময়ে গুরু হরিদেব কোন বিশেষ সংবাদের জন্য প্রতীক্ষা-চঞ্চল হইয়া নিমেষের পর নিমেষ গনিতেছিলেন। অত্যল্পকাল পরে তৎপ্রেরিত গুপ্তচর আশার বার্তা বহন করিয়া আসিল: লস্করডাঙ্গার গড়নায়ক প্রস্তুত হইতেছেন, যথাসম্ভব শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবেন।

হরিদেব কৃতজ্ঞ অন্তরে অদৃশ্য মহাশক্তির উদ্দেশে উচ্চারণ করিলেন: "নম নম নম জয়ন্তী মঙ্গলা কালী, জয় দাও—শত্রু বধ কর!"

১৩

সংগ্রাম ও ভাগ্যনির্ণয়

পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত যে অচিন্তিতপূর্ব ঘটনাচক্রের দক্ষিণাবর্ত-গতি বাধাপ্রাপ্ত হইয়া বিপরীত দিকে পাক খাইতে লাগিল, সেই প্রবৃত্তিসঞ্চারের মূলে ছিল এক অকুতোভয় ভূয়োদর্শী প্রবলপ্রাণ। যখন রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর সমস্ত মনপ্রাণ ভক্তিরস-সিক্ত, তাঁহার অখিলসত্তা শান্তি-দান-সাম-প্রাকাম্য-মহিমার জন্য নিবেদিত, যখন তাঁহার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে করুণাধারা-বর্ষিণী জগৎপালিনীর অনুধ্যানে, সেই শুদ্ধ শান্ত পরিবেষ্টনে মঙ্গল-পূত মুহূর্তে পুণ্যব্রতা প্রেমময়ী নারী গদ্‌গদচিত্তে বিরাজ করিতেছেন, সেই সময়ে আকস্মিক বেগে কোন্ মন্ত্রবলে ইচ্ছা-বিরুদ্ধ আসুরিক কাণ্ডে তিনি রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতে সম্মত হইলেন, সেই নেপথ্য-সংবাদ পূর্বেই আভাসে বলা হইলেও এ-স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।—

ভবশঙ্করী সহসা দুর্লক্ষ্য মহাদুর্যোগ ভয়ঙ্কর দস্যুর ন্যায় তাঁহাকে গ্রাস করিবার ছলে নির্মম মূর্তিতে আগতপ্রায় শুনিয়া, তাঁহার স্বামীর চিরবাঞ্ছিত একমাত্র বংশধরের কল্যাণের জন্য এবং স্বামীর রাজ্য-নাশের আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার জীবনের মায়া নিমেষের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিতে পারে নাই। মাতৃহৃদয়ের আকুলতা এবং দেশপ্রেমী-প্রাণের অসহ্য বেদনা মিলিত হইয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি পঙ্গু করিয়া দিল। বিপদের অবধি নির্ণয় করিতে

অক্ষমতা-হেতু তাঁহার দিশাহারা প্রাণ অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহ-মমতা-ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তাঁহার বোধ হইল যে, কোন অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ড-বিধান করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেশমাতৃকা-রূপিণী মহাদেবী, দেবতার অভিশাপে সমস্তই দগ্ধ হইবে। ভবিতব্য কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। জগদীশ্বরীর ইচ্ছা আজ অন্যরূপ, নহিলে একই ঘটনার অনুবৃত্তি হইবে কেন? বারংবার হানাহানি রক্তপাতে দেশের মঙ্গল নাই। ভবশঙ্করী মহাগুরু হরিদেবের নিকট করজোড়ে মিনতি করিয়া বলিলেন: "প্রভু, আমাকে মুক্তি দিন্! এই রাজসিক আচার আমার নহে। আমি চাহি না মান, চাহি না প্রতিষ্ঠা, রাজ্য-ধন কিছুতেই আমার আকর্ষণ নাই, রক্তস্নানের বীভৎস লীলায় মত্ত হইতে আমার মন আর সম্মত নহে। কেবল যুদ্ধ করিবার জন্যই কি আমার নারী-জন্ম? অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে কি আমাকে চিরজীবন বাস করিতে হইবে? আমি কি কখনও স্বপ্নে ভাবিয়াছিলাম—অদৃষ্টদেবতা আমার জীবনযাত্রার মধ্যে অচিরসুখের বসন্ত ফুটাইয়া জীবনব্যাপী দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিলেন? এখন সেই দুঃখের কণ্টকতরু সদর্পে মাথা তুলিয়া উঠিয়া আমাকে পদে পদে ক্লিষ্ট করিতেছে। যে দুঃখ পায়, তাহাকেই বারংবার দুঃখ দেওয়াই কি বিধির বিধান? অনুমতি করুন, আমার একমাত্র সম্বল প্রাণাধিক সন্তানকে বক্ষে লইয়া চলিয়া যাইব সুদূর শান্তির আশ্রমে—যেখানে হিংসা-দ্বেষ-লালসা-দুষ্ট মানুষের বিষ-নিঃশ্বাস বহে না।"

কিন্তু মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণের অনুপ্রাণনায় রাজ্ঞীর ক্ষণেক-লুপ্ত মনোবল পূর্ণতেজে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল। তথাপি তাঁহার মনে সন্দেহের প্রশ্ন জাগিয়া রহিল। গুরু হরিদেব তাহা বুঝিলেন। রাণিকে ঈষৎ ভৎর্সনা করিয়া তিনি কহিলেন: "রাজরাজেশ্বরী ভবশঙ্করী, তোমার আচরণ আমার নিকট অনাত্মজ্ঞের ন্যায় বোধ হইতেছে। তুমি কি আপনাকে জানো না, আপনার প্রকৃত অবস্থা বা নিজপ্রকৃতি সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান নাই? তুমি মহাশক্তি মঙ্গলরূপিণীর অর্চনা করিলে, শুধু কি আত্মতৃপ্তির জন্য, নারীজাতির যুগ-যুগ-আচরিত ধর্মাচার-পালনের আজন্ম সংস্কার-মাত্র? আবার তুমি প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছ। নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছ, সর্বকল্যাণদাত্রী ভগবতীর উপর তোমার সরল-বিশ্বাস নাই। আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়ো না, জড়বুদ্ধি দূর করো, প্রবুদ্ধ হও—আত্মবিস্মৃতা মহীয়সী, তাহা হইলে জগদীশ্বরীর কি ইচ্ছা—তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে অধিক বিলম্ব হইবে না।"

তথাপি ভবশঙ্করীর প্রত্যুত্তরে তর্কের সুর তাঁহার বিমুখ-অন্তরকে ধ্বনিত করিয়া তুলিল। তিনি কহিলেন: "গুরুদেব, আমার বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া উঠিয়াছে। যখন আমি প্রশান্ত চিত্তে আপনার নিঃসঙ্গ জীবনের সমস্ত গ্লানি, ভোগ-স্পৃহা, মোহ-অহঙ্কার বিসর্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছি, তখন কি আমার এই অত্যন্ত দুরূহ ব্রতে বাধা-সৃষ্টি করা নিষ্ঠুরতা নহে? আজিকে আমি ধৃত-স্পৃষ্ট হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পাইতেছি না। যুদ্ধকাণ্ডের

ভাবী পর্বাধ্যায়গুলি আমার কল্পনা-পটে জ্বলজ্বল করিতেছে। সেই মনুষ্যত্ব-ঘাতী অকরুণ দৃশ্য যে আমার পক্ষে অসহ্য। এই নারী-প্রাণ আর কতদিন তাহার স্নেহ-করুণার রাজ্য হইতে নির্বাসন ভোগ করিয়া সংহার-কার্যে মৃতস্তূপ স্বহস্তে রচনা করিতে থাকিবে! আমার কি পরিত্রাণ মিলিবে না?"

দেশের প্রাণময়ী সর্বজনের তপস্যার কেন্দ্রাভিসারী শক্তি যে বারাঙ্গনা—সেই মহাদুর্দিনে তাঁহার চিত্ত-বিকার লক্ষ্য করিয়া রাজ্যের সদাহিতাকাঙ্ক্ষী ধীগুণসম্পন্ন নিঃশঙ্ক রাজকুলগুরুও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার স্থিরবিশ্বাস ছিল যে, বরাভয়দাত্রী সৃষ্টিস্থিতি-রক্ষিত্রী ভগবতী ইষ্টসিদ্ধির বর-দান করিয়া দত্তাপহরণ করেন না। তিনি তো বিশ্বাসহন্ত্রী নহেন। সেই আশ্বাস-বাণী রাজ্ঞীর অবচেতন-লোকে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। জগদীশ্বরী এই মহিমময়ী নারীর মর্মস্থলে পূর্ণমাত্রায় সজাগ আছেন। রাজ্ঞীর অবসাদ যে সাময়িক, তাহা যে স্বাভাবিক অবস্থা নহে, সৃষ্টির অবমাননাকারী মানুষের প্রতি যে তাঁহার নিরুদ্ধ অভিমান আজ হঠাৎ একটা ছিদ্র পাইয়া ধরা-গর্ভে বন্দী উৎসের মুক্তধারার ন্যায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে, এই ভাবটুকু বুঝিতে তাঁহার বাকি রহিল না। রাজ্ঞীর সেই বিহ্বলতা দূর করিবার দৃঢ়সংকল্পে গুরুদেব ভাবগভীর-কণ্ঠে কহিলেন: "দেবী, কাহার উপর অভিমান তোমার? কিসের জন্য অভিমান করিয়া আপনাকে, পুত্র-পরিজনকে, দেশ ও দেশবাসীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতেছ? নিশ্চিত জানিয়ো —তোমার সৃষ্টিকর্তা তোমার এই অভিমানের প্রতিশোধ

লইবেন। যে পুণ্য দেশে ন্যায় ও ধর্মের অধিষ্ঠান, সেখানে অন্যায় ও অধর্মের জয় হইতে পারে না, অন্যথায় এই জগৎসৃষ্টি হইতে সত্য-ধর্মের অপঘাত ঘটিবে, সৃষ্টি যাইবে রসাতলে। মানব-জীবনের স্বর্গ হরণ করিবে দৈত্যকুল। অহংকার, মদমত্ততা, পররাজ্যলোলুপতা, একাধিপত্যের গর্বোন্মাদ, পদদাপে মানুষের স্বাধীনতা-হরণ-বৃত্তি যাহাদের, তাহারাই মানুষ-দৈত্য। ইহারাই জগতের সুখ-শান্তি লুণ্ঠন করিয়া মূর্তিমান্ অস্বাস্থ্য-রূপে চাপিয়া বসিয়া থাকে. ইহারাই ভীতির কারণ। ইহারা অহরহ দুর্দান্ত স্বভাব উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিয়া নিজদের সীমা লঙ্ঘন করে, নিজদের বাহুল্য দ্বারা সকল দেশকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। ইহাদের উৎপাত সর্বদিকে সর্বক্ষেত্রে অস্বাভাবিক। ইহারা স্পর্ধিত বিশহস্ত দশাননের মত দম্ভ-অত্যাচারের পালা পাশবগর্জনে জাগাইয়া তোলে। ইহাদের প্রতি অমনোযোগী হইয়া অবস্থান করা কত বড় অসম্ভব, এই মানুষ-বিদ্বেষীদের অস্বাভাবিক বাহুল্য খর্ব করা সত্যনিষ্ঠ মানুষের পক্ষে যে কত প্রয়োজন, তাহা বিবেক-বুদ্ধির অগোচর নহে। তুমি জীবনের সমস্ত কর্তব্য, সমস্ত দায়িত্ব ছিন্ন-বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত ধর্মস্থানে একান্তবাসিনী থাকিয়া যে শান্তির আকিঞ্চন করিতেছ, সে তোমার ভ্রান্তিমূলক দুরাশা মাত্র। ইহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য। তোমার মন হইতে শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় লইবে, অনুশোচনা ও ধিক্কার তোমার প্রতিমুহূর্তকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে, তোমার মর্মে-মর্মে পীড়িত স্নেহ-ধর্ম এবং দেশপ্রেমের অন্তর্গূঢ় ব্যাকুলতা

পুঞ্জপুঞ্জরূপে নির্লিপ্ততা ও নিস্তব্ধতার অন্তরালে আলোড়িত হইয়া উঠিবে। ধর্ম-কর্মের দোহাই দিয়া তোমার এ আত্মগোপন করিবার অভিলাষ আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। তোমার সৃষ্টিকর্তাকে অপমান করিয়া আপনার ভীরু অভিমান সাধিতেছ, ইহা কি তোমার যোগ্য? ধর্ম-সাধনার দ্বারা তোমার মন কি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হইয়াছে, তুমি কি মায়ামুক্ত হইয়াছ? তবে প্রাণের এত মায়া কেন—পুত্রকে বাঁচাইবার জন্য মাতৃপ্রাণের এই আকুলতা কেন? এখনও তুমি ধর্মতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছ বলিয়া মনে হয় না। সত্যই ধর্ম, এ-বোধ তোমার কোন্ শুভক্ষণে জাগিবে?"

ভবশঙ্করী আবেগ-কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন: "গুরুদেব, প্রাণধর্ম অপেক্ষা কি কোন বড় ধর্ম আছে? এই সংসারে আমাকে প্রতিনিয়ত দুঃখ-ভোগ করিতে হইতেছে বেদনার পৃথিবী বহন করিয়া, আমার এই পৃথিবী নব নব আঘাতে সংঘাতে এমনি কঠিনরূপে গড়িয়া উঠিতেছে যে, আমি বাস করিতেছি যেন দুঃখের চিতাগ্নিশিখার মধ্যে। আমার অন্তরের কথা অন্তর্যামী ভিন্ন কে বুঝিবে? এই পরম দুঃখই আমার অন্তর্যামীর আসন। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে যদি কোন দৈববাণী আমার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমার ধরণী নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। নতুবা পাঠানের অন্যায় সাম্রাজ্য-লালসা যদি বিধিলিপি-দ্বারা সমর্থিত হয়, তবে ধ্বংসেরই ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।"

সেই আগতপ্রায় মহাসংকটে দেশ ও দেশবাসীর আশা-

ভরসা-স্থল দীপ্তিমতী রাজ্যপালিকার অব্যবস্থ-চিত্তের অনুচিত ঔদাসীন্য হরিদেবকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তথাপি তিনি বিপদে ধৈর্য হারাইলেন না, রাজ্ঞীকে ঈষৎ ধিক্‌কৃত করিয়া পূর্ণতেজে কহিলেন: "তুমি আজ দুষ্টদলনী শিষ্টপালনকারিণী মহেশ্বরী সনাতনার পবিত্র আদেশ অবমাননা করিতেছ। তুমি কি-মহাপাতকের মধ্যে স্বীয় সত্তাকে টানিয়া লইয়া গিয়া ফেলিতেছ, তাহা তোমার মনে একবারও উদয় হইতেছে না। তোমার জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। যদি মনে কর—তোমার বিধাতা দুঃখের অগ্নিশয্যা পাতিয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে তোমার জীবন হইবে অগ্নিশুদ্ধ। যাঁহারা এই জগতে জগদীশ্বরের প্রতিভূ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মানব-কল্যাণে আপনাদের উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য-ভোগ করিতে আসেন নাই, তাঁহাদের দুঃখের আসন গৌরবের আসন হইয়া উঠিয়াছে। শাশ্বত ভারতের সে-আদর্শ কি তোমার নয়ন-সমক্ষে নাই? এই দুঃখ-গৌরব হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিবে, ইহা যে মহা বিড়ম্বনা! তুমি মহাশক্তি মঙ্গলরূপিণীর অর্চনা করিলে কেবল আত্মতৃপ্তির জন্য, আত্মোন্নতির জন্য নহে? তবে কি তোমার ইষ্টদেবী ভবানীর আরাধনা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র? ভগবতীকে সরল বিশ্বাসে যদি প্রার্থনা কর—জ্ঞান-দারিদ্র্য, শক্তি-দারিদ্র্য ও বস্তু-দারিদ্র্য বিদূরিত হইবেই। ঈশ্বরী বিশ্বমাতা অভীষ্ট-বরদাত্রী। সাধনার মধ্য দিয়াই, আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়াই শক্তির আবির্ভাব, এই তপস্যাই মহাদেবীর যথার্থ আরাধনা। প্রকাম, মাহাত্ম্য, সৌন্দর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য, বীর্য—ভগবতীর এই

ষড়ৈশ্বর্য অনন্ত। সেই ঐশ্বর্যময়ীর কৃপায় তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্যের অণুমাত্রও যদি নিষ্ঠা-ভক্তির বলে লাভ করিতে সমর্থ হও, তবেই তোমার অন্তর হইতে ভয় দূরে সরিয়া যাইবে। এই ঐশ্বর্য-লাভের সাধনাই শক্তি-সাধনা। এরূপ শক্তি সাধনায় মানব প্রবুদ্ধ হইলে, তাহার চিত্ত-মন্দিরে মহাশক্তির দিব্য আবির্ভাব হয়, তখন মহাদেবীর অচিন্ত্যরূপের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে সাধক-সাধিকা। পূর্ণ-অভিষেকের পরেও তোমার এই দুর্বলতা, এই বিকল্প-ভাব কেন জাগিল? তবে কি তোমার সকল সাধনাই নিষ্ফল?"

ভবশঙ্করী মস্তক নত করিয়া ধীর-সংযত স্বরে উত্তর দিলেন: "গুরুদেব, বিপদ্ যদি আসে—সেজন্য আমি শঙ্কিত নই। আমার চিত্ত সর্বদাই ভয়-মুক্ত। কিন্তু আমি এই বিপদ্-সমুদ্র ভুজভেলায় কিরূপে উত্তীর্ণ হইব? শক্তিশালী শত্রু-পক্ষের সহিত এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করা উন্মত্তের প্রয়াস ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? কেবল যাদুমন্ত্র বা ইন্দ্রজালের প্রয়োগে শত্রুকুলকে স্তব্ধ-করার সুখ-কল্পনা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? আমার দেশের শ্যামল মাটি শুধু রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে। উপস্থিতক্ষেত্রে, আমার লোকবল ও অস্ত্রবল না থাকিলে কোন্ শক্তিতে এই অসাধ্য সাধন করিব? আমার এই বাহু নিশ্চেষ্ট থাকিতে চায় না···আমি প্রাণদানেও প্রস্তুত, সে-কার্যে কি দেশ রক্ষা পাইবে? বস্তুতঃ যাহা একপ্রকার অসম্ভব, তাহার জন্য বৃথা ঘাত-প্রতিঘাতের আসুরী লীলা করিয়া কি-সুফল ফলিবে? পূর্ণ-অভিষেকের লগ্নে দেবী আমার

সম্পূর্ণ পরাজয়ের ক্ষণ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। দেবতা আমার পূজা গ্রহণ করিলেন না। অতএব দেবতার কৃপা-সাধনায় এবং একমাত্র সন্তানের মুখ চাহিয়া আমার এই দুর্বহ জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। ইহাতেও কি আমার অধিকার নাই?”

হরিদেব বৃথা-তর্কে কালাতিবাহনে চঞ্চল হইয়া মেঘমন্দ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন: “না—না, সে অধিকার তুমি পাইবে না। আমি চাই—প্রত্যাসন্ন মৃত্যু-সংগীতের মধ্য দিয়া মহাজীবনের মহাগীতি মুখরিত হইয়া উঠিবে। আমার কামনা—রুদ্র-ছন্দের ভিতর দিয়া সমস্ত জগতের কাছে তুমি প্রতিষ্ঠিত হও। কোথায় তুমি তীর্থের সন্ধানে ফিরিবে? তোমার সে-সংকল্প মিথ্যা হইবে। এই মাটি—এই দেশের পবিত্র মাটি তোমার তীর্থ। ত্যাগে সুখ, ত্যাগে মুক্তি, ভোগে নয়। এই কি তোমার লোক-হিতৈষণা ব্রত? যে-কোন ত্যাগের ক্ষেত্রে তুমি আত্মদান করিতে সমর্থ হইবে, সেইখানেই তোমার অন্তর্যামী দেবতা আপনি আসিয়া সেই উৎসর্গ গ্রহণ করিবেন। তোমার প্রকৃতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিবে। ধিক্ সংশয়-বিমূঢ় মন! ধিক্ অকারণ দুর্বলতা! এখনও তুমি মনে সন্দেহ পোষণ কর? কে বলিল—দেবতার কৃপা তুমি পাও নাই? এ তোমার ক্ষণেক মোহ। দৈববলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই, অসম্ভবও বাস্তবে পরিণত হয়। আমি তো নিরাশার বিশেষ হেতু দেখিতে পাইতেছি না। তোমার দৃষ্টি কি এমনি রুদ্ধ হইয়াছে যে, সম্ভাব্য পথের সন্ধান মিলিতেছে না?

এই বিপন্ন মুহূর্তে সমস্ত মোহ বিসর্জন দিয়া আবার তুমি জাগ্রত হও—শক্তিময়ি। মহাশক্তির প্রসাদ লাভ করিয়াছ, তাহা অপ্রমাণ করিয়ো না। অক্লান্ত উদ্যমে কর্ম-ব্যবস্থা কর, দেখিবে কি অলৌকিক উপায়ে সমস্তই সুসম্পূর্ণ হইয়াছে। জনবল ও অস্ত্রবল—সমস্তই আছে। বৃথা আর কালহরণ করিয়ো না, দৃষ্টি প্রসার কর। অদূর-দুর্গে সত্বর তোমার আহ্বান জানাইয়া দাও, তোমার দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হউক্। চিন্তার দ্বারা চিন্তাকে দূর করা যায় না, ফলাফল-আশা বর্জন করিয়া বিহিতকর্মে আত্মনিয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। আমিও আততায়িগণের উপযুক্ত সৎকারের জন্য যূপকাষ্ঠ-স্থাপনের উদ্‌যোগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছি, এই কার্যে আমি সহায় করিব সমাজের সেই নিম্নস্তরের প্রজাবর্গকে—যাহারা বিশ্বাসের মূল্য রাখে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, যাহাদের শিরায় শিরায় অনাবিল গাঢ় রক্ত প্রবাহিত। এই অল্প সময়ের মধ্যে আত্মরক্ষার অস্ত্র শাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। মতি স্থির কর, মহৎকার্যে অগ্রসর হও। এই মাতৃ-আজ্ঞা—তোমাকে পালন করিতেই হইবে ”

রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর ক্ষণ-লুপ্ত আত্মসংবিৎ পরিপূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিল। তিনি অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন : “দেব, আমার এই নির্বেদ ক্ষমা করুন। নারী আমি, আমার বিচারবুদ্ধি নিপুণা নহে, সৃষ্টিকর্তা আমার ভাল-মন্দ বিবেচনার শক্তি সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।”

হরিদেব বলিয়া উঠিলেন : “তুমি স্বয়ং তোমার সৃষ্টিকর্তার পরম বিস্ময়ের মহারত্ন, আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি, সেইজন্য

সেই অনির্বচনীয় তোমাকে এই জীবন্মৃত্যুর ভয়জাল ছিন্ন করিতে ডাক দিয়াছি মাত্র। বিপদের ছদ্মবেশে আজিকে আসিয়াছে সেই পরম-লগ্ন, যখন তোমার কর্মদ্যোতনায় দেশবাসীর দৃষ্টির উপর হইতে ভ্রান্তি ও জড়-নিদ্রার স্থূল আবরণ অপসারিত হইবে, তখনই তাহারা দেখিতে পাইবে বিধাতার কৃপার দান-রূপে তোমাকে, তাহারা প্রাণের মূল্যে তোমার সুপ্রতিষ্ঠার আসন বিছাইয়া দিবে।—যাহারা শক্তি-দর্পে দানবের ন্যায় শান্তির স্বর্গভূমি দেশের শ্যাম-শোভা বিনষ্ট করিতে উদ্যত, তাহাদের অস্বাভাবিক অতিরেক পৃথিবীতে উৎপাতের কারণ, তাহাদের প্রধান লক্ষণ অপরিমিতি। এই মানবশত্রুকুলের নিকট শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবন তৃপ্ত দেশের পরিমাণ-সুষমা চক্ষুশূল। এই প্রকার ক্ষমতাভিমানী পররাজ্য-লোলুপ দানবকে নিরস্ত করিতে না পারিলে, অবিচারে অত্যাচারে আমাদের জননী জন্মভূমি ক্লিষ্ট হইয়া উঠিবে।"

ভবশঙ্করী কহিলেন: "ভগবন্! আজ যদি দৈবও প্রতিকূল হয়, পৃথিবীর খর্বমানুষরা আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়, আমি মহাশক্তির প্রেরণায় স্বর্গ-মর্ত্যের সমস্ত শাসন ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া রক্ষা করিব আমার জন্মভূমিকে। কিন্তু গুরুদেব, এইখানেই আমার কঠিন পরীক্ষা। প্রকৃতপক্ষে, আশার শেষতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া আমার প্রচেষ্টা।"

"আশীর্বাদ করি, তুমি বিজয়িনী হও"—এই বলিয়া হরিদেব প্রস্থান করিলেন।…এইরূপে মহাতেজস্বী পরমেষ্ঠী ব্রাহ্মণের অনুপ্রাণনায় রাজ্ঞীর মনোবল পূর্ণতেজে উজ্জীবিত হইয়া

উঠিল। ইহার পর সন্দেহ-মুক্ত মনে রাজ্ঞী ত্বরিত-আয়োজনে মত্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বিরুদ্ধ-অবস্থা অনুকূল ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হইতে লাগিল। তখন প্রজ্ঞাচক্ষু গুরুদেবের উদ্দেশে তিনি প্রণাম করিলেন। রণস্থল সজ্জিত হইতে লাগিল, লোকবল ও অস্ত্রবলের আর দুর্ভাবনা রহিল না। অমিত-সাহসে তাঁহার সমস্ত অন্তর এক্ষণে সমর-প্রয়াসী হইয়া উঠিল। এই বৃত্তান্ত পূর্বাধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।···

ছাউনাপুর-দুর্গাধিপকে সৈন্য-সজ্জার আদেশ দিয়া ভবশঙ্করী প্রসন্নচিত্তে দেবতার নিকট শেষপ্রার্থনা নিবেদন করিতে মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার বদনমণ্ডলে সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাব ফুটিয়া উঠিল, তিনি ভাব-গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন : "হে অসুরজয়ী অমৃতের পুত্র, আমার দুর্বলতা ক্ষমা কর :

—'তে অস্মভ্যং শর্ম্ম যং সন্নমৃতা মর্ত্ত্যেভ্যঃ।
বাধমানা অপ দ্বিষঃ' ॥—

···আমরা মৃত্যুর অধীন, কিন্তু তোমরা মরণজয়ী, তাই তোমাদের কাছে ভিক্ষা করিতেছি মৃত্যুজয়ের আশীর্বাদ। তোমরা শত্রু-গণকে বাধা-দান করিয়া আমাদিগকে দান কর সুখ।"

দেবী ভবানীর সম্মুখে প্রণতশির হইয়া তিনি পুনরায় প্রার্থনা করিলেন : "হে পরমার্তিহন্ত্রী, আমার সকল ভ্রান্তি—সকল ক্লান্তি নাশ কর, 'দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ'।—বিপদে পতিত হইয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, সকল প্রাণীর তুমি ভয়-নাশ কর।······

'দেবি প্রসীদ পরমা ভবতী ভবায়
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি'—

দেবি, তুমি প্রসন্না হইলে নির্বিঘ্নে সৃষ্টি রক্ষা পায়, তোমার কোপে পড়িলে রিপুকুল সদ্য নির্মূল হইয়া থাকে।—তোমার অসীম শক্তির কৃপা-প্রসাদে আমি অরিকুলের যেন বিনাশ আনিতে পারি।"

ভবশঙ্করী দেবী-পদতলে শির লুটাইয়া দিয়া সর্বান্তঃকরণে অজেয় শক্তি ও রণ-জয়ের কামনা নিবেদন করিলেন। উত্থিত হইয়াই তিনি শঙ্খে দিলেন ফুংকার, ক্ষণপরেই বহিঃপ্রাঙ্গণে তূরী-নিনাদ হইল। রাজ্ঞী আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার অসম্পূর্ণ রণসজ্জা সুসম্পূর্ণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি 'জয়দুর্গা' অসি-হস্তে সকলের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তৎক্ষণাৎ গুরু হরিদেব রাজ্ঞীর নিকটে আসিয়া কহিলেন: "মা, আমি গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলাম শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করিবার জন্য। সে এইমাত্র সংবাদ আনিয়াছে যে, শত্রুপক্ষ ন্যূনাধিক একদণ্ডকালের মধ্যে খুব সম্ভব এ-স্থলে পৌঁছাইয়া যাইতে পারে। চণ্ডাল ও বাগদী বীরগণ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমার নির্দেশমত শত্রুসেনাকে বিষাক্ত তীর ও 'পাবড়া' নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের গতিপথ বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিল, নহিলে শত্রুরা আরও পূর্বে উপস্থিত হইতে পারিত। আর-এক কথা, আমি ইতঃপূর্বে আবশ্যক-বিবেচনায় তোমার অনুজ্ঞার অপেক্ষা না রাখিয়াই লশকরডাঙ্গার গড়নায়কের নিকট চর-মুখে প্রত্যাসন্ন শত্রু-আক্রমণের সংবাদ পাঠাইয়াছি।

এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। সম্মিলিত কর্মশক্তির প্রভাবে আমাদের পক্ষে সাহায্যের অভাব হইবে না। মুহূর্তের জন্য তোমার কোন পরিতাপের কারণ ঘটিবে না।”

রাজ্ঞী ভবশঙ্করী গুরুদেবের আশ্বাস-বাক্যে সুগভীর পরিত্রাণের নিঃশ্বাস ফেলিলেন। শুভ্রশঙ্খের নিঃশঙ্ক নির্ঘোষে এবং ঘণ্টার গম্ভীর-রোলে সমস্ত বনবীথি ও নৈশপ্রকৃতি ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উঠিয়া শত্রু-কর্ণে গিয়া মন্দ আঘাত করিল। কিন্তু তাহারা নিশ্চিন্তবিশ্বাসে মনে করিল—রাজ্ঞী নিঃসন্দেহে মন্দিরে ধর্মোৎসবে নিমগ্ন হইয়া আছেন। একটা হিংস্র প্রলোভনে পাঠান-সর্দারের মন নাচিয়া উঠিল। তিনি পরমোৎসাহে আপন বাহিনীকে গতিবেগ আরও বর্ধিত করিতে বলিলেন।

এদিকে নাটমন্দিরে চলিয়াছে শক্তির আবাহন। গুরুদেব সতেজে উচ্চারণ করিলেন: “হে বঙ্গবীরাঙ্গনা, হে দেশমাতৃকার বীরসন্তান, চিত্ত ভয়শূন্য কর। তোমাদের প্রাণের স্তবমন্ত্র:

‘বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি—
বলমসি বলং ময়ি ধেহি’।—

—হে প্রবলপ্রাণ, বীর্য ও বলের আধার তুমি—আমাকে বীর্য দাও, বল দাও।”

শতশত নির্ভীক কণ্ঠ মহাশব্দে মুখরিত হইয়া উঠিল। পুনর্বার গুরু উচ্চস্বরে কহিলেন: “বন্দেঽরবিন্দশ্রিয়ম্।”

তমস্বিনী রাত্রিকে সচকিত করিয়া সকলে সেই দিব্যমন্ত্রের কলনাদ তুলিল।

*　　*　　*　　*

অপরত্র রাজধানী গড়-ভবানীপুরে যে প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাবলীর যোগাযোগ হইতেছিল, এক্ষণে সেই পট উত্তোলিত হইল।...

বিচক্ষণ মহাপাত্র ভূপতিকৃষ্ণ সর্বাগ্রেই রাজধানী-রক্ষার যথাসম্ভব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিলেন...তৎপরে চতুর্ভুজকে কিরূপে আয়ত্তে আনিতে পারেন, তদ্‌বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন ঃ অচিরে সুব্যবস্থিত কৌশল-জাল বিস্তার করিতে না পারিলে, সসৈন্য-চতুর্ভুজ নাগালের বাহিরে চলিয়া যাইবে। তিনি আর মুহূর্তেক নষ্ট না করিয়া পেঁড়োর গড়ের এক বিশ্বস্ত দুঃসাহসী সর্দারকে উপযুক্ত নির্দেশ দিয়া খানাকুলের কোতায়ালের সহিত সংযোগ-স্থাপনের জন্য প্রেরণ করিলেন। সর্দারের অধীনে কয়েকজন সুনির্বাচিত রক্ষিসেনাও চলিল। ইতোমধ্যে কোতোয়াল চতুর্ভুজের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে ভুলেন নাই। সর্দার তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইবার পর, উভয়ে উপস্থিতকর্তব্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। অতঃপর সর্দার তৎপরিচালিত সৈন্যদল সমভিব্যাহারে কয়েকজন পথ-প্রদর্শকের সহায়তায় বিপরীতপথগামী চতুর্ভুজের গতি-রোধ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সম্ভাবনা চতুর্ভুজের অচিন্তিত ছিল, কেননা তাঁহার চিন্তা ঘুরিতেছিল অন্যরাজ্যে। সর্দার মনোগত ভাব গোপন করিয়া সসম্মানে চতুর্ভুজকে জ্ঞাপন করিলেন অধিনেতা মহাপাত্রের ইচ্ছা এবং ইহাও জানাইলেন যে, তিনি যেন সমস্ত বিষয়টিকে মহাপাত্রের সনির্বন্ধ অনুরোধ বলিয়াই

গ্রহণ করেন। শত্রু যে-বেশেই আসুক্, রাজধানী অরক্ষিত রাখা বিধিসম্মত নহে। তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবার নিমিত্ত মহাপাত্র সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছেন। চতুর্ভুজ বহুতর তর্ক-দ্বারা যুক্তি-অযুক্তি দিশাইয়া—সে-ক্ষেত্রে তাঁহার পরাবর্তন যে গুপ্ত দস্যুদলকে পীড়ন-লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ আনিয়া দিবে, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সর্দার অতিবিনয়ের ভান করিয়া কহিলেন যে, বৃহৎক্ষতি নিবারণের জন্য মহাপাত্রের এই সাবধানতা, এরূপ বিবেচনায় আংশিক ক্ষয়-ক্ষতি নিরোধ করিবার প্রয়াস সামরিক- বা দেশ-রক্ষণ-নীতির প্রকৃষ্ট নিদর্শন নহে, ইহা তাঁহার ন্যায় সুবিজ্ঞ সেনানীর নিকট বলাই বাহুল্য মাত্র; এবং এক মুহূর্ত অবসর না দিয়া সৈন্যগণকে সম্বোধন করিয়া সর্দার বলিয়া উঠিলেন: "তোমরাই বলো, সাধারণ ন্যায়বুদ্ধি কি সেই কথা সমর্থন করে না?"

চতুর্ভুজ মহা-সমস্যায় পড়িলেন, তথাপি তাঁহার প্রতিবাদের স্বর আরও তীব্র হইয়া উঠিল। কিন্তু অধিকাংশ সৈন্য সর্দারের প্রস্তাবে সায় দিল এবং তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে ফিরিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহারা একবাক্যে বলিয়া উঠিল: "মহাপাত্রের প্রস্তাব যথার্থ বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে। রাজধানীকে নিরাপদ্ রাখাই প্রথম কর্তব্য, রাজধানী সুরক্ষিত থাকিলে সমস্তই রক্ষা পাইবে।"

চতুর্ভুজের এবার বোধগম্য হইল যে, অবস্থা বঙ্কিমগতি লইয়াছে, পুনর্বার সামান্য প্রতিবাদও বৃহদাংশিকের মন গ্রহণ

করিতে প্রস্তুত হইবে না, বরঞ্চ সৈন্যগণ তৎপ্রতি বিমুখ হইবে। অগত্যা রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করা ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কোন উপায় রহিল না। কিন্তু আশা-পিশাচিকা তাঁহার কানে কানে গুঞ্জন তুলিতে লাগিল : তিনি সসৈন্যে পাঠান সর্দারের সহিত যথাসময়ে যোগদান করিতে যদিও না পারেন, তথাপি কার্য-সিদ্ধির পথে বৃহৎ বাধা জাগিবে না, হয়তো তিনি রাজধানীতে বর্তমান থাকিলে অভীষ্ট-পূরণের পথ প্রশস্ত হইবে। চতুর্ভুজ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলের সন্দেহ দূর করিবার ছলে বলিলেন : "আমি উত্তেজনার বশে ভুল করিতেছিলাম, মহাপাত্রের প্রস্তাব সমীচীন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এ-ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়ঃ।"

সেই মুহূর্তে সুকৌশলে পেঁড়োর গড়-সর্দার পূর্বেই মহাপাত্রকে এই সংবাদ দিবার জন্য এক রক্ষী-সৈন্যকে রওনা করাইয়া দিলেন। মহাপাত্র সমস্ত ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়া চতুর্ভুজের আগমন-প্রতীক্ষায় চঞ্চল-চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। যথাকালে প্রত্যাগত সৈন্যের মুখে সংবাদ শুনিয়া তাঁহার সন্দেহাকুল মন কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। উৎসুকচিত্তে তিনি চতুর্ভুজের অপেক্ষায় প্রতি পল গনিতে লাগিলেন। চতুর্ভুজ সর্দার ও অগ্র-পশ্চাতে সৈন্যদল কর্তৃক পরিবৃত হইয়া গড়-ভবানীপুর, দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি দুর্গে পৌঁছিবামাত্র ভূপতিকৃষ্ণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রদর্শন-পূর্বক চতুর্ভুজকে সাদর সম্ভাষণে প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য একটি দুর্গ-কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। ভূপতিকৃষ্ণের নির্দেশ ও পূর্বব্যবস্থামত

কথাবার্তার সময় কয়েকজন সশস্ত্র সৈন্য কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত রহিল। মহাপাত্রের নানা কূট প্রশ্নে চতুর্ভুজ মনে মনে যেমন সংশয়িত হইয়া উঠিতেছিলেন, তেমনি তাঁহার বিরক্তিও বর্ধিত হইতেছিল। হঠাৎ এক উগ্র বিতর্ক-কালে মহাপাত্র তরবারি উত্তোলন-পূর্বক একটি সংকেত দিয়া চতুর্ভুজকে রাজ্ঞীর আদেশ-পত্র দেখাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন: "রাজ্যেশ্বরী ভবশঙ্করী সর্বময়ী কর্ত্রী, তাঁহার আদেশ পালন কর। তোমার হীন দুরাকাঙ্ক্ষাই তোমাকে দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য করিয়া একেবারে পাপের পঙ্ককুণ্ডে লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে, স্বহস্তেই তুমি আপন পঙ্ক-সমাধির ব্যবস্থা করিয়াছ। তোমার প্রকৃত স্বরূপ দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আর তোমার নিস্তার নাই।"

চতুর্ভুজ এই আকস্মিক বিপৎপাতে শিহরিয়া উঠিলেন, সেই নিদারুণ মুহূর্তে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল---যেন তাঁহাকে মৃত্যুবাণ আসিয়া আঘাত করিয়াছে। নিজের স্থাপিত দুরভিসন্ধি-জালে তিনি নিজেই আবদ্ধ হইয়াছেন বুঝিয়া উন্মত্তের ন্যায় যে-আচরণ করিলেন, তাহা নিরুপায়ের শেষ নিষ্ফল চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। চতুর্ভুজ আস্ফালন প্রবল করিয়া তুলিয়া ক্ষিপ্ত বৃক-তুল্য মহাপাত্রকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু মহাপাত্র সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকজন রক্ষিসেনা আসিয়া চতুর্ভুজকে যে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা তাঁহার লক্ষ্যে পড়ে নাই। মহাপাত্রের আদেশে চতুর্ভুজকে নিরস্ত্র করা হইল, এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ-অবস্থায় দুর্গকারার একটি

অন্ধকার-কক্ষে তিনি প্রেরিত হইলেন। এরূপ কঠিন ব্যবস্থা করা হইল—যাহাতে চতুর্ভুজের আত্মহত্যা করিবারও পথ উন্মুক্ত রহিল না।

রাজ্ঞীর অভিপ্রায়-অনুসারে মহাপাত্র ভূপতিকৃষ্ণ যে বিধর্মী মহাশত্রুর দোসর বিশ্বাসহন্তা চতুর্ভুজকে অল্পায়াসে পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়া বন্দী করিতে সমর্থ হইলেন, ইহাতে দেশভক্ত সকলেই সন্তোষ-লাভ করিল, এবং দৈব যে অনুকূল—তাহা বিশ্বাস করিতে কাহারও দ্বিধা জাগিল না॥

উক্ত ঘটনার 'পরে আবরণ টানিয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য পুনরুদ্‌ঘাটিত করা হইল।

শত্রুর আসন্ন অভিগ্রহ সর্বসামর্থ্যে প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর আদেশক্রমে সৈন্যদল প্রস্তুত হইয়া উদ্দীপিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই অল্প সময়ের মধ্যেই বহুজনের মিলিত কার্যশক্তি-দ্বারা সমস্ত সমর-ব্যবস্থা একপ্রকার সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বীর্যবতী রাজ্ঞী প্রীতমনে সন্দর্শন করিলেন: যাহা অপ্রত্যাশিত ছিল, সকলের দেশপ্রেম ও আন্তরিক একতার বলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। তখন তিনি মহা-উৎসাহে ভীষণ শঙ্খধ্বনি করিলেন। বীর-হুহুঙ্কারে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইল। অসি-চর্ম, অগ্ন্যস্ত্র ও বিরাট্‌ শূল-হস্তে রাজ্ঞী এক মহাকায় গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। তাঁহার রণবেশ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল—যেন জগজ্জননী দুর্গা মহিষাসুর-বধ করিবার জন্য সুতীক্ষ্ণ শূল ও উজ্জ্বল অগ্ন্যস্ত্র

সবল অথচ মৃণালসদৃশ ভুজে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ আবির্ভূতা হইয়াছেন। রাজ্ঞীর আগ্নেয় অস্ত্রটি অভিনবরূপে গঠিত ছিল... 'রুদ্রাগ্নিশক্তি' নামে পরিচিত এই অস্ত্র ছিল দুই অবয়ব-যুক্ত, কোষমুক্ত হইলে ক্ষুরধার অসি এবং কোষবদ্ধ হইলে অনলবর্ষী। প্রয়োজনানুসারে দুইভাবে এই আশ্চর্য মারণাস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

রাজ্ঞী স্বয়ং সৈন্য-চালনা করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ যেন কোন্ এক দিব্যশক্তির প্রভাবে শক্তিদীপ্ত হইয়া মহোৎসাহে রাজ্ঞীর আদেশ-পালনে তৎপর হইল। রাজ্ঞী নিকটবর্তী যুদ্ধ-প্রান্তরে এক অপূর্ব অভেদ্য ব্যূহ-রচনা করিলেন। ত্রিভুজের দুই পার্শ্ববাহু-আকারে গজানীক সংস্থাপিত হইল, সম্মুখবাহু-রূপে অশ্বারোহী সেনা ও পশ্চাদ্ভূমিতে পদাতিক। অতঃপর তিনি নিজে সৈন্যশ্রেণী-মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদিগকে শত্রু-নিপাতে বিক্রমী হইবার জন্য নানা উপদেশ-দানে সবিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন অগ্নি-পরিবেষ্টনে শত্রুপক্ষকে অতর্কিতে অবরুদ্ধ করিবার কার্যে লড়ায়ে বাগদী-চণ্ডালাদি মরিয়া পুরুষগণ চিহ্নিত স্থানসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে গুল্মাকারে-দলবদ্ধ হইয়া চরম মুহূর্তের জন্য সতর্ক রহিল।

অল্পক্ষণ অতীত হইয়াছে কি-না সন্দেহ, এমন সময়ে অদূরে বহু বেগবান্ অশ্বের ক্ষুরক্ষেপধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমশঃই শব্দ নিকটবর্তী হইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্ঞীর আদেশ পাইবামাত্র সমস্ত মশাল যেন একটি ফুৎকারে নির্বাপিত হইল। সুদূরবিস্তৃত প্রান্তর ঘন অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। রাজ্ঞী গম্ভীরনাদে শঙ্খ ধ্বনিত করিয়া তুলিলেন। সৈন্যগণের

কলরোলে রণস্থল যেন অধীর-আগ্রহে রক্ত-লালসায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

সেই শব্দ ওসমানের কর্ণে গিয়া আঘাত করিল, কিন্তু পাঠান-সর্দারের অতি-আশাবাদী চিত্ত বিচলিত না হইয়া মিত্র চতুর্ভুজের আহ্বান-সংকেত বলিয়া ভ্রম করিল। ইহার প্রত্যুত্তরে পাঠানসৈন্যদল সোল্লাসে চিৎকার করিয়া উঠিল। পাঠানপক্ষ নব উৎসাহ-বেগে নিজদের মশালের আলোকে দিশা পাইয়া প্রান্তরের মধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও পাঠান-সর্দার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই, সেনানী চতুর্ভুজের অভ্যর্থনার প্রত্যাশায় তূর্যনাদ করিলেন। কিন্তু বৃথা আশা, অশ্বারোহী-পাঠানবাহিনী স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। অদৃষ্ট যে কঠিন পরিহাস করিয়া পাঠানদলকে একেবারে বাঘিনীর কবলের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিয়াছে, পরক্ষণেই পাঠানসর্দার কয়েকটি প্রাণের মূল্য দিয়া তাহা বিলক্ষণ বুঝিলেন।

সম্মুখে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী-সেনা দৃষ্ট হইবামাত্র রাজ্ঞী ভবশঙ্করী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সর্বাগ্রে অগ্ন্যস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় বিস্ফোরক মারণাস্ত্রের বজ্র-নির্ঘোষে পাঠানসৈন্যগণ ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কয়েকজন মুসলমান বীর হতাহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

পাঠান-দলপতি ওস্‌মান মনে করিলেন: চতুর্ভুজ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে। সে আমাকে এই পথে অগ্রসর হইতে পরামর্শ দিয়া, নিজে সসৈন্যে অন্যপথে আগমন-পূর্বক

অতর্কিতভাবে আমার সৈন্যগণকে আক্রমণ করিয়াছে। যাহা হউক্, বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডকে সমুচিত দণ্ডবিধান না করিয়া আমি কিছুতেই নিবৃত্ত হইব না। এ-ক্ষেত্রে রাণীকে হস্তগত করিতে পারি আর না-পারি, চতুর্ভুজকে বন্দী করিতেই হইবে।

কিন্তু স্বধর্ম- ও দেশ-দ্রোহী চতুর্ভুজ যে তাঁহারই প্রতি বিশ্বস্ত হইবার প্রয়াসে সেইক্ষণে ভীষণ কারাকক্ষে শৃঙ্খলিত হইয়া নিজের দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিতেছেন, তাহা জানিলে ওসমানের এই অকারণ আক্রোশ জাগিত না, বরং দুষ্টসঙ্গী বন্ধুর নিগ্রহে তিনি অশান্ত ও সমব্যথী হইয়া পড়িতেন।

অতঃপর পাঠানসর্দার সিংহবিক্রমে অচিন্তিত বিপরীত-অবস্থার সম্মুখীন হইলেন, ভীমবেগে সদলবলে রাজ্ঞীর সৈন্যগণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ঘোর সমর বাধিয়া উঠিল। রাজ্ঞীর আজ্ঞাক্রমে মশালধারিগণ মশাল প্রজ্বলিত করিল। প্রায়ান্ধকার রণস্থল দীপ্ত আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইল। রাজ্ঞী ভবশঙ্করী বিশাল শূলহস্তে পর্বতাকৃতি মহাগজকে শত্রুসৈন্যমধ্যে চালিত করিলেন। তাঁহার পার্শ্বদেশে ও পশ্চাদ্‌ভাগে অবস্থিত বহু রণহস্তী বিশাল শুণ্ড আস্ফালন করিতে করিতে বিপক্ষ-সৈন্য আক্রমণ করিল।

পাঠান-সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এক নারীবাহিনীকে নির্ভীক যোদ্ধৃবৃন্দের সমানতেজে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল, তাহাদের কঠিন মুষ্টি যেন শিথিল হইয়া পড়িল। তাহারা পূর্বে শিবমন্দিরে ঘটিত সংঘাতে একদল যুধ্যমানা বঙ্গনারী সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যায় রচিত সংবাদ শুনিয়া, তখন ইহাদের প্রতি

ডাকিনী ভিন্ন অন্য কিছু গুরুত্ব আরোপ করে নাই। কিন্তু সম্মুখ-সমরে তাহারা কঠিন বাস্তবের পরিচয় পাইল। তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, সেই সমরনিপুণা বঙ্গনারীগণ উপেক্ষা করিবার নহে। কিন্তু পাঠানসেনার মনোমধ্যে যুদ্ধ-নিরতা রমণীদিগকে আহত বা নিহত করিবার পরিবর্তে অধিকার করিবার আদিম-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সেই উদগ্র কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, তাহারা তদনুযায়ী বিপক্ষ পুরুষযোদ্ধাদিগকে নির্মমভাবে প্রত্যাঘাত করিতে লাগিল, এবং নারীকুল হইতে আগত অস্ত্রাঘাত তাহারা যতদূর সম্ভবপর প্রযত্নভাবে খণ্ডন করিয়া চলিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রণদৃপ্তা বাঙ্গালার অবলাগণ অতিসবলা-মূর্তিতে তীক্ষ্ণ প্রক্ষেপণ ও বিস্ফোরক নিক্ষেপ-করতঃ পাঠানপক্ষের ধারণা ও অভিলষিত সংকল্প ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়া দিল। পাঠানসৈন্যগণ নিদারুণ আঘাতে কিঞ্চিৎ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। সেই মুহূর্তে তাহারা অধিনায়িকা বীরবালার অপার সৌন্দর্যময়ী রোষদীপ্তা রণরঙ্গিণীমূর্তি ও তাহার দেহরক্ষিণী অসি-চর্ম-ধারিণী রণোন্মত্তা বীরাঙ্গনাগণকে নিরীক্ষণ করিয়া মহাত্রাস-জড়িত বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে-ভাব স্বল্প সময়ের মধ্যে কাটিয়া গেল। ওসমান গর্বিত উৎসাহ-বাক্যে সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। পাঠানপক্ষ রণ-চিৎকার তুলিয়া বিপক্ষ সৈন্যগণকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিল।

রাজ্ঞী ভীষণ তীক্ষ্ণাগ্র শূল-দ্বারা কাহারও বক্ষঃ, কাহারও মস্তক, কাহারও স্কন্ধ বা গ্রীবা বিদীর্ণ করিতে করিতে রণাঙ্গনে

রণচণ্ডীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। গজানীক ও অশ্বসাদী-সেনা মধ্য- ও পার্শ্ব-দেশে চাপিয়া পড়িয়া শত্রু-নিধনে দুর্মদ হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষের সৈন্যগণের রণহুঙ্কারে এবং অস্ত্রে-অস্ত্রে আঘাতে-সংঘাতে উত্থিত এক উন্মাদ-রাগিণীর সহিত মিশিয়া যুগপৎ ক্রন্দন ও উল্লাস-গর্জন নৈশ প্রকৃতিকে ভীত-চঞ্চল করিয়া তুলিল। শতাধিক শীর্ষস্থানীয় পাঠানবীর সমরশয্যায় শায়িত হইল দেখিয়া ওসমান অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। অবস্থা যে এরূপ আয়ত্তি বা কৌশলের বাহিরে চলিয়া যাইবে—ইহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। পাঠানরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ সৈন্যদিগকে হত্যা করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অল্প, পাঠানপক্ষকে ঘিরিয়াই ধ্বংসের তাণ্ডব চলিতে লাগিল। কারণ, পাঠানদলকে আত্মরক্ষার কার্যেই অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল॥ ওসমান বুঝিলেন—যুদ্ধের গতি ঘুরাইতে না পারিলে, পাঠানপক্ষ শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাইবে কি-না সন্দেহ। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া মহাতেজে সৈন্যদিগকে প্রোৎসাহিত করিতে করিতে অব্যর্থ অস্ত্র-চালনায় বিপক্ষসৈন্যকে নিরাকৃত করিতে লাগিলেন। পাঠান যোদ্ধৃবর্গ এক্ষণে যেন নববলে উদ্দাম হইয়া হিন্দুসৈন্যদিগকে বিপর্যস্ত করিতে উদ্যত হইল। রাজ্ঞী লক্ষ্য করিলেন—তাঁহার সৈন্যগণ পিছু হটিতেছে। আশু বিপর্যয় রোধ করিবার জন্য রাজ্ঞী শঙ্খনাদ করিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে শত্রু-আক্রমণে প্ররোচিত করিলেন। সেইক্ষণে তিনি হস্তে তুলিয়া লইলেন তাঁহার রুদ্রাগ্নি-অস্ত্র, সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র অনল উদ্‌গীরণ করিয়া পুরোবর্তী কয়েকজন দুর্ধর্ষ পাঠান-যোদ্ধাকে

ধরাশায়ী করিল। তাঁহার সৈন্যগণও মহা-উদ্যমে শত্রুপক্ষকে পুনরাক্রমণে মাতিয়া উঠিল।

উভয়তঃ সেই উত্তেজনার মুহূর্তে ওসমান রাজ্ঞীর দিকে কখন্ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন, সেদিকে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। রাজ্ঞীর প্রতি হঠাৎ লক্ষ্য পড়িতে ওসমান চমকিয়া উঠিলেন। যে অলোকসামান্যা প্রাণময়ী নারী-প্রতিমাকে, একবার মাত্র দেখিয়া, লাভ করিবার দুরাপ আশায় বিপদের সর্বপ্রকার সম্ভাবনাকে তিনি বিবেচনার যোগ্য বলিয়া গণ্য করেন নাই, সেই আকাঙ্ক্ষিত অপরূপশ্রীমণ্ডিতা বরনারী কোন্ মন্ত্রে শূন্যে লোপ পাইল! সেস্থলে বিরাজ করিতেছে যেন এক অপরিচিতা শত্রুদলনী প্রচণ্ডমূর্তি। এই মূর্তি তো সেই অমৃতময়ী মূর্তি নহে। নিরুপমমধুর সৌন্দর্যের অন্তরালে এ-কি উগ্র রুদ্রানী-রূপ! এ-মূর্তি যে মায়া-মমতা-লেশহীন ভয়ঙ্করী সংহারিকা-মূর্তি! এ-মূর্তি যে তাঁহার কল্পনা-লালিত জীবনময়ী না হইয়া তাঁহার জীবন সংহার করিবে। সহসা বক্ষের নিকট হইতে একটা ধূমকৃষ্ণ বজ্র উদ্যত হইয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন তীব্র আঘাত করিল। মুহূর্তে রণস্থলের সমস্ত মশালের আলো যেন অন্ধকার হইয়া গেল, এবং সেই অন্ধকার-প্লাবনে রাজ্ঞীর মুখখানিকেও রুদ্র-ভয়ঙ্কর করিয়া দিল। ইহার জন্যই কি তাঁহার এত উদ্বেগ, এত অপমানিত প্রয়াস? তাঁহার সমস্ত অন্তর যেন পরাভবের গ্লানিতে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল: "আমার প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া চূর্ণ-চূর্ণ করিয়া

দিবে? কত যুদ্ধ—কত বীরের সঙ্গে আস্ফালন, কিন্তু আমার জয়পত্র কোনদিন হীনতার কলঙ্ক-স্পর্শে লাঞ্ছিত হয় নাই, আর আজিকে এক অখ্যাত বঙ্গরমণীর কাছে এত বড় বিড়ম্বনা?”

দুর্মনায়মান পাঠানসর্দারের চিন্তা-স্রোত হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইল। তিনি সভয়ে লক্ষ্য করিলেন, তাঁহারই এক পার্শ্বরক্ষী তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য রাজ্ঞীর নিক্ষিপ্ত এক ভীষণ বিস্ফোরক অস্ত্র নিজে বুকে পাতিয়া লইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ওসমানের সমস্ত কল্পনা ছুটিয়া গেল। হিংস্র উন্মত্ত শার্দুলের ন্যায় নখ-দন্ত বিস্তারপূর্বক সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এক মহাবিভীষিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন। পাঠানপক্ষ যেন রণ-দুর্মদ হইয়া উঠিল। সমর-হুতাশন দীপ্যমান তেজে জ্বলিতে লাগিল। শত্রুপক্ষের সেই বর্ধিত বিক্রমে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত হইল। রাজ্ঞীর অশ্বারোহী সৈন্যগণ আপ্রাণ চেষ্টায় পাঠানবাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে লাগিল, এবং গজারোহীসেনা প্রভঞ্জনবেগে পাঠানসৈন্যদিগকে দলিত-পিষ্ট করিয়া সবিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অন্যদিকে রাজ্ঞীর পদাতিক সৈন্যগণ অরাতি-সেনার পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিল। তুমুল সংগ্রামে সমস্ত যুদ্ধস্থল আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে ঝনঝন-ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল ঘন্টা-সংকেত। অনতিকাল পরেই সমর-প্রান্তরের তিন দিকে লেলিহান অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতে লাগিল। এই ভয়াবহ দৃশ্যে পাঠানপক্ষের অনেকে প্রাণ-ভয়ে পলায়নপর হইল, রাজ্ঞীর অশ্বসাদী-সেনা পলায়মান মুসলমান যোদ্ধাগণের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

ক্রমে ক্রমে যুদ্ধের গতি পাঠানপক্ষের প্রতিকূল হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজ্ঞীর পক্ষ হইতে আক্রমণকারী শত্রুগণকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত কিরূপে সম্ভবপর হইল, তাহা ভাবিয়া ওসমানের আশ্চর্যের সীমা রহিল না। বিদ্যুৎচমকের ন্যায় তাঁহার মনে চতুর্ভুজের উপর প্রবঞ্চনার সন্দেহ ঝলসিয়া উঠিল। কিন্তু সেই বেইমান এখন তাহার নাগালের বাহিরে। যাহাই হউক্, যে কৌশল-জাল বিস্তার করা হইয়াছে, তাহা ভেদ করিয়া আততায়ী পাঠানদলের পক্ষে নিষ্ক্রান্ত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু ওসমান দুঃসাহসী বীর, তাঁহার বীর্যবহ্নিতে শত্রুপক্ষও দগ্ধ হইবে, তিনিও ধ্বংস হইবেন। তিনি পরাজয় একপ্রকার নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াও, শেষ আশা ত্যাগ করিতে তাঁহার মন চাহিল না, কয়েকজন বিশ্বস্ত যোধ-অনুচরের সহিত অদ্ভুত বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন-পূর্বক রাজ্ঞীর সৈন্যগণকে অবলীলাক্রমে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। পলায়নোদ্যত পাঠানসৈন্যগণ অনন্যোপায় হইয়া আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

জীবন-মৃত্যু লইয়া খেলা চলিতে লাগিল। আশাহত ওসমান প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মহারোষভরে, রাজ্ঞী ভবশঙ্করী যে-স্থলে সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, সেই দিকে ভীম-বেগে অগ্রসর হইলেন। রাজ্ঞীর দেহরক্ষিণী বীরাঙ্গনাগণ নিষ্কোষিত তরবারি ও শূল উত্তোলন করিয়া পাঠানবীর ওসমানের দিকে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে কতিপয় রক্ষিসেনা

দ্রুতগমনে পাঠানসর্দারের গতি-রোধ করিবার চেষ্টায় প্রাণপণে যুঝিতে লাগিল, বীরনারী-বাহিনীও দ্রুত আসিয়া নির্ভয়ে যোগ দিল। ওসমান ও তাঁহার অনুচরগণের সহিত ইহাদের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষেই বহু হতাহত হইতে লাগিল। এই সময়ে রাজ্ঞীর আরও সাহায্য আসিয়া পড়িল। লশকরডাঙ্গার গড়নায়ক-পরিচালিত সৈন্যদল উপস্থিত হইয়া উল্কাপাতের ন্যায় পঠানবাহিনীর উপর নিপতিত হইল। সেই আকস্মিক সংঘটনে বিপক্ষ যোদ্ধৃগণের মন হইতে জীবনের ক্ষীণমাত্র আশা-ভরসা অবলুপ্ত হইয়া গেল। সম্মুখে ও পশ্চাতে অবরুদ্ধ হইয়া পাঠান-শত্রুরা নির্মূল হইবার উপক্রম হইল।

রাজ্ঞী তাঁহার কয়েকজন অনুচরীকে সমরশায়িনী হইতে দেখিয়া ক্রোধারুণলোচনে ভীষণ শঙ্খনাদ করিতে করিতে অরিকুলের ভীতি উৎপাদন-পূর্বক শত্রুসৈন্য-মধ্যে এক ভয়ানক আগ্নেয়গোলক নিক্ষেপ করিলেন। উহা ভূমিতে পতিত হইয়া মহাশব্দে বিদীর্ণ হইল, কয়েকজন শত্রুসেনার বক্ষে মৃত্যুশেলের মত বাজিল, এবং ওসমানের অশ্ব সাংঘাতিক আঘাতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

দুর্দম বীর ওসমান সেই পতন হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া পদব্রজে রুধির-স্নাত নগ্ন অসি-হস্তে অসমসাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী ওসমানকে লক্ষ্য করিয়া রুদ্রাগ্নি-অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হইলেন। পাঠান-দলপতির দেহরক্ষী যোদ্ধাগণ সম্মুখবর্তী হইয়া রাজ্ঞীর মারণাস্ত্রের অমোঘ আঘাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। কতিপয় রক্ষী-সৈন্য প্রাণদান

করিয়া প্রভুর ঋণ-পরিশোধ করিল। রাজ্ঞী শত্রুদিগকে অণুমাত্র অবসর না দিয়া সংহারকারী মহাশূল-প্রহারে একে একে ধরাশায়ী করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, প্রধান শত্রু ওসমানের উপর মারাত্মক আঘাত হানিবার সংকল্পে তিনি রণোন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। রক্ষী-সৈন্যরা অতি-দক্ষতার সহিত রাজ্ঞীকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার শরীর রক্ষা করিতেছিল।

ওসমান লক্ষ্য করিল—প্রায় সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে, আর নিষ্ফল প্রয়াসে স্বীয় প্রাণ-বিসর্জন করা নির্বুদ্ধিতা। সেই অন্তিমগতি অনিবার্য জানিয়া পাঠানসর্দার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া ওসমান সম্মুখস্থ মৃতযোদ্ধার অশ্বে সত্বর আরোহণ-পূর্বক উলঙ্গ কৃপাণ আস্ফালন করিতে করিতে রাজ্ঞীর পদাতি-সৈন্যগণের দিকে তীব্রবেগে ধাবিত হইলেন, এবং পুরোবর্তী যোদ্ধাগণকে অসির আঘাতে জর্জরিত করিয়া শত্রু-ব্যূহ ভেদকরতঃ রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। এই যুদ্ধে পাঠানদের সম্পূর্ণ ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিল।

পাঠানদলপতি একদিকে সয়তানি-প্রণালী অবলম্বনে সাম্রাজ্য-বিস্তার-লালসায় অপরের রাজ্য-গ্রাস করিবার অদম্য উৎসাহে অতর্কিতভাবে রক্ত বহাইবার রীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে আদিম পশু-প্রবৃত্তি তাঁহার স্কন্ধে সওয়ার হইয়া বসিয়া তাঁহাকে এই তস্করের ন্যায় মনুষ্যত্বহীন অভিযানে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কিন্তু ওসমানের এই অবিমৃষ্যকারিতা এবং অন্ধলালসা তাঁহার শোচনীয় পতনের মূল কারণ হইয়া

উঠিল। তিনি অতি-বিশ্বাসে নিষ্ঠুর উল্লাসে আসিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ যুদ্ধকুশলী পাঠানবীরগণকে সঙ্গে লইয়া, ভাবিয়াছিলেন—তাঁহার সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। তাঁহার স্পর্ধা এমনি চরমে উঠিয়াছিল যে, তিনি ধারণাই করিতে পারেন নাই : অজেয় হিমালয়-চূড়াকে জয়-করা হয়তো সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু দেবী ভবশঙ্করীকে জীবিতাবস্থায় বন্দিনী করা কল্পনার অতীত। যে-দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া পাঠান-দলপতি নিদারুণ অন্যায়ের ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে সর্বহারা করিয়া তাঁহার পৌরুষে চিরদিনের জন্য দুরপনেয় কলঙ্ক-লেপন করিয়া দিল। যাহারা বীরত্বে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সহায় ও গর্ব ছিল, সেই বীর যোদ্ধৃগণকে বিসর্জন দিয়া তাঁহাকে ফিরিতে হইল, বাঙ্গালার বাঘিনীকে জালবদ্ধ করিতে আসিয়া ফেরুর ন্যায় কোনমতে ধিক্কৃত প্রাণটুকু লইয়া পলাইতে হইল। পাঠানপতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল, পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

ওসমান পথ অতিক্রম করিয়া চলিতেছিলেন অচেতন পাষাণমূর্তির মত। কিয়দ্দূর অশ্বারোহণে গমন করিয়া পাঠানসর্দার ফকিরের বেশ ধারণ করিলেন, এবং ভিক্ষা-বৃত্তি গ্রহণ-পূর্বক কিছুদিন পরে অতিকষ্টে উড়িষ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

*   *   *   *

এদিকে ভবানীদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে যুদ্ধের জয়ভেরী সুগভীর নিস্বনে বাজিতে লাগিল। জয়ধ্বজা উড়িল মহা-অম্বরে। সকলের কণ্ঠ উচ্চরোলে ধ্বনিত হইল : "বন্দেঽরবিন্দশ্রিয়ম্।"

কিন্তু রাজ্ঞী ভবশঙ্করী রণজয় করিয়াও মৃত বীর ও বীরাঙ্গনাগণের জন্য শোকে-দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। পরমেষ্ঠী হরিদেব রাজ্ঞীর হৃদয় সান্ত্বনা-দানে শান্ত করিতে লাগিলেন।

সকলের দৃষ্টি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত হইল, সেখানে মৃত্যু যেন তাহার আধিপত্য বিস্তার করিয়া দিয়াছে। তখন যামিনীর শেষ তারাগুলি আকাশে যেন অর্ধনিমীলিত নেত্রে মৌনব্রতের ন্যায় রঙ্গভূমির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, এবং বিলীয়মান শ্রান্ত রাত্রির স্তব্ধ গগন-চত্বরের অন্ধকার দিক্‌চক্রবালে স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে।

১৪

হোমাগ্নিশিখা

রাজ্ঞী ভবশঙ্করী প্রদীপ্ত হোমাগ্নিশিখার ন্যায় অনিবারণীয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা কিছু অশুচি, যাহারা সৃষ্টির অবমাননাকারী হিংস্রস্বভাব মানব-বিদ্বেষী—এই হোমানলের সংস্পর্শে আসিয়া দগ্ধ-নিঃশেষিত হইয়া গেল।...শত্রু-মারণ-যজ্ঞে যেন বিগ্রহিণী হোমাগ্নিশিখা হবিঃ ও ইন্ধন-সংযোগে প্রজ্বলিত করিলেন অমিততেজা নির্মল ব্রাহ্মণগুরু, সেই লেলিহজিহ্ব অগ্নিকুণ্ডে বলির পশুর মত দলে দলে প্রাণ-আহুতি দিয়া হিংসা-বৃত্ত আততায়ীকুল স্বেচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল।

কালরাত্রির অবসান হইল, মেঘ-নির্মুক্ত অনন্ত আকাশে প্রাতঃসূর্য উদিত হইয়া যেন নবজীবনের বার্তা বহন করিয়া আনিল। রণক্ষেত্রে উড্ডীন রাজ্ঞীর জয়পতাকা অরুণকিরণে যেন স্বর্ণবর্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানে স্থানে নিহতদের শোণিতরঞ্জিত অদূর-প্রান্তর সূর্যালোকে যেন গুচ্ছ গুচ্ছ হরিৎ-পীত ও রক্তবর্ণ বন্য-পুষ্পে আস্তীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দেশের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাহারা প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একাত্মীকৃত মৃত বীর ও বীরাঙ্গনা-গণের পারলৌকিক ক্রিয়া শোকাকুল-হৃদয়ে রাজ্ঞী ভবশঙ্করী সুসম্পন্ন করিলেন। সর্বশেষে স্নানান্তে তিনি ভবানীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীর উদ্দেশে সাশ্রুনেত্রে কহিলেন: "মাতঃ বিশ্বপালিনী, মানুষের প্রতি হিংস্রমানুষের পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি

সংসারে অশান্তির বিষবাষ্প পরিপুঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে, অকারণ হত্যালীলায় নৃশংস উন্মত্ততা বাধাবন্ধহারা হইয়া উঠিতেছে, পাশাপাশি সুখে-শান্তিতে বাস করিবার শুভবুদ্ধি লোপ পাইতে বসিয়াছে, তবে কি তোমার জগৎসৃষ্টির সত্য-বিধান এই অসঙ্গত নির্লজ্জতায় ভ্রষ্ট হইবে? যাহা পাপ, যাহা ক্রূর, যাহা ভয়ংকর, যাহা নিদারুণ অন্যায়—তাহা কি তোমার মঙ্গলদেশনায় শান্ত হইবে না? ঐ অসীম আকাশ যে অনাহত ধ্বনিতে তোমার শাশ্বত শান্তিমন্ত্র পাঠ করিতেছে। অয়ি বিধাতৃবরদে! তোমার মানসকন্যা শান্তি যে তোমার প্রসন্ন মুখে ললাটিকা-রূপে চিরশোভমানা। তবে আজ শান্তি বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে কিসের জন্য? অমৃতরসবর্ষিণী জগন্মাতা—আমাদের তপঃসাধনার ত্রুটি-বিচ্যুতির নিমিত্ত সত্যই কি পাষাণে পরিণত হইয়াছ? তাই কি নীতি-চ্যুত পৃথিবীতে কেবল স্বার্থের দ্বন্দ্ব, হরণ-পীড়নের অভিযান, শক্তিগর্বোদ্ধত প্রাধান্য-বিস্তারের বীভৎস প্রচেষ্টা? তোমার রাজ্যে এই অবিচারের আধিপত্য আর কতকাল চলিবে? পুনর্বার রুদ্রতেজে জাগরিতা হইয়া অধর্ম-অসত্যকে দগ্ধ কর, তোমার প্রলয়ের শঙ্খ-নির্ঘোষে সমস্ত অশুচির হউক্ মৃত্যু, এই পৃথিবী কলুষ-মুক্ত হউক্, পরমা শান্তির হউক্ সুপ্রতিষ্ঠা।”

ভবশঙ্করী তাঁহার মর্মবাসী বেদনা দূর করিবার জন্য দেবীকে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে শান্ত-সংযত মনে যথা-কর্তব্য পালন করিতে তাঁহার সমস্ত সময় নিয়োজিত হইল। রাজধানী গড়-ভবানীপুরে পূর্বাহ্নেই বিজয়-বার্তা প্রেরিত

হইয়াছিল, তৎসঙ্গে বিজয়োৎসবের আয়োজন করিবার জন্য মহাগুরু হরিদেবের নির্দেশ গিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই। পরদিন প্রভাতলগ্নে বিজয়ী বীরবাহিনী-সমভিব্যাহারে রাজ্ঞীর রাজধানী-যাত্রার কাল নির্দিষ্ট হইল।

রাজা ভূপতিকৃষ্ণ সেই শুভসংবাদ পাইবামাত্র বিজয়িনী রাজ্ঞী এবং বিজয়ী-সেনাগণের অভ্যর্থনার নিমিত্ত রাজপথ পত্র-পুষ্প-পতাকায় ও সুদৃশ্য তোরণে সুসজ্জিত করিয়া তুলিলেন। মহোল্লাসে সমস্ত রাজনগর প্রাণময় হইয়া উঠিল। প্রতীক্ষিত দিবসের প্রত্যূষেই চন্দনবারি-সিঞ্চনে ও নানাবর্ণের ফুলদল-বিকিরণে রাজপথ যেন অমলসুন্দর শোভা ধারণ করিল। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনগরী উৎসব-বাদ্যে মুখরিত হইতে লাগিল। দলে দলে পুরবাসী আসিয়া পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণী-বদ্ধভাবে দাঁড়াইল। আবালবৃদ্ধবণিতা তাহাদের রক্ষাকর্ত্রী জননীস্বরূপা মহামহিমময়ী রাজ্ঞীর দর্শন-প্রতীক্ষায় অধীর-আগ্রহে ক্ষণ গনিতেছিল। সর্বজনের হস্তে পুষ্পাঞ্জলি, শ্রদ্ধার স্রক্-চন্দন—দেশের মূর্তিমতী কল্যাণতমা দেবীপ্রতিমার পূজন-কল্পে কৃতজ্ঞ দেশবাসীর ভক্তি-উপায়ন।

অল্পক্ষণ পরে অগ্রদূত উপস্থিত হইয়া সংবাদ-ঘোষণা করিল : মহামহনীয়া শত্রুদলনী রাজ্ঞীদেবী এবং দেশগৌরব বীরসৈন্য-গণের সমারোহযাত্রা আগতপ্রায়। জনতা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। অনতিদূরে নিনাদিত হইল ভেরী-তূরী। অর্ধ-দণ্ডের মধ্যে তোরণদ্বারে আসিয়া সর্বপ্রথমে উপনীত হইলেন গজারোহী রাজগুরু হরিদেব, তাঁহার পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে রাজ্ঞী

ভবশঙ্করী ও তাঁহার নারীবাহিনী। তৎপরে প্রবেশ করিলেন দুর্গাধিপ ও নায়কগণ, পিছনে আসিল সৈন্যদল। মহাপাত্র সর্বাগ্রে সকলকে সংবর্ধিত করিলেন। রাজমার্গে অভিগমন-রত সমারোহযাত্রা পুরবাসিগণ মুগ্ধবিস্ময়ে সন্দর্শন করিতে লাগিল। পুরস্ত্রীগণের শঙ্খধ্বনিতে এবং কুসুমদাম- ও লাজ-বর্ষণে, আপামর জনগণের আনন্দ-কলরোলে ও নির্বিচার শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনে রাজ্ঞীর অন্তর হইতে আরম্ভ করিয়া একটা সৈনিকের অন্তর পর্যন্ত হর্ষ ও ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িল। প্রকৃতপক্ষে, মহা-বিপদ্-মুক্ত ভূরিশ্রেষ্ঠপুর যেন নূতন প্রাণশক্তি লাভ করিয়া সুচিরসঞ্চিত আশা-উৎসাহে পুনরুদ্ধৃত জীবনে-যৌবনে উল্লসিত হইয়া উঠিল।

যে প্রবল আফগান-শক্তি বঙ্গে নষ্ট-প্রভুত্ব উদ্ধার করিবার সংকল্প লইয়া সময়ে-অসময়ে সমরাভিযান-পরিচালনায় দেশ-মধ্যে অশান্তির আগুন ছড়াইতেছিল, বহু বৎসর ধরিয়া যাহাদের আক্রমণে-অত্যাচারে স্থানে স্থানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার প্রেতনৃত্য চলিতেছিল, এমন-কি বাঙ্গালা আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইলেও কয়েকটি নগর ভিন্ন সমগ্রভাবে মুঘল-শাসন প্রতিষ্ঠা-লাভ করে নাই, সেই সময় হইতে ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের উপর পাঠানের শ্যেনদৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছিল, তদুপরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বার্থান্বেষী দেশীয় লোকের বিশ্বাসঘাতকতা; যখন এই সঙ্কটে-বিপদে নিরীহ দেশ-বাসী ত্রস্ত-নির্যাতিত, সেই বিপন্ন মুহূর্তে পররাজ্যলোলুপ আফ-গান-শক্তির উদ্যতহস্ত পঙ্গু করিয়া দিল এক বীরা বঙ্গনারীর

নেতৃত্বে বাঙ্গালার কতিপয় বীরসন্তান। এই ঘটনা যেমনি আশ্চর্যজনক, সেইরূপ গৌরবপূর্ণ। রাজ্ঞী নিয়তিকে বশে আনিয়া সেই মাহেন্দ্রক্ষণের প্রবর্তন করিলেন। সেইজন্য বিজয়-যশোমালিনী দেবী ভবশঙ্করীর কীর্তি-ধ্বজা দেশের মুক্ত নীলাম্বরে সগর্বে উত্তোলিত হইল। যথাসময়ে এই গৌরব-বৈজয়ন্তী বাঙ্গালায় ও বাঙ্গালার বাহিরে গুণগ্রাহিগণের প্রশংসা-পূরিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

এই বিজয়মহোৎসব রাজনগরে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত হইল। ভুরস্যুটরাজ্যের প্রজাগণ আসিয়া যোগদান করিল, পার্শ্বস্থিত অঞ্চলসমূহের ভূস্বামিগণ এবং প্রত্যন্তবাসী দলনেতৃবর্গ আমন্ত্রিত হইলেন। সমাগত সম্মানী অতিথিবৃন্দ বীর্যবতী রাজ্ঞীকে নানাবিধ উপঢৌকন-দানে ও স্তুতিবাদে আপনাদের অকপট হৃদয়ের পরিচয় দিলেন, অবশেষে প্রতিদান-স্বরূপ সকলেই বীরাঙ্গনার মৈত্রী প্রার্থনা করিলেন। রাজ্ঞীও সকলকে মৈত্রী- ও একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া দেশের কল্যাণ- ও শান্তি-স্থাপনে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাইলেন।

উৎসব-শেষে রাজ্ঞী তাঁহার বিশ্বস্ত অক্লান্তকর্মী সমর-নায়ক এবং সৈন্যগণকে যথোপযুক্ত পুরস্কৃত করিলেন। খানাকুল নগর-রক্ষীও যথাযোগ্য পুরস্কারে সম্মানিত হইলেন। তৎপরে রাজ্ঞী ভবশঙ্করী সর্বজনকে সম্বোধন করিয়া উদ্দীপ্তকণ্ঠে কহিলেন: "আমাদের এই পুণ্যভূমিকে পদানত করিবার নিন্দিত প্রচেষ্টায় যে বিদেশী বিধর্মী শত্রু হীনদস্যুবৃত্তি-অনুসরণে অভিযান করিয়াছিল, সে কশাহত কুক্কুরের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণটুকু সম্বল করিয়া

পলায়ন করিয়াছে। এই যুদ্ধে তাহাকে দারুণ মূল্য দিতে হইয়াছে। আমার সুদক্ষ অনুসন্ধাতা চর-মুখে শুনিয়াছি এবং রণক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি যে, আফগান-সর্দার তাহার সুনির্বাচিত অতিকুশলী যুদ্ধনায়কগণকে সঙ্গে লইয়া এই ঘৃণিত কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল—এই রাজ্য শুধু জয় করা নহে, এই রাজ্যের রাণীকে—এই দেশমাতৃকার সেবিকা, প্রজাপুত্রগণের জননীকে হস্তগত করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায় নীচাশয় ওসমান অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়াছে। যে নারীকে হরণ-ব্যপদেশে সেই দুর্দান্ত পাঠান সমর-বিরুদ্ধ অনিয়ম বাছিয়া লইয়াছিল, বাঙ্গালার সেই নারীর সহিত সম্মুখ-সমরে তাহার বীর্যবহ্নি নির্বাণ-লাভ তো করিলই, উপরন্তু তাহার অধিকাংশ যোদ্ধাই চিরদিনের জন্য ভূতলশায়ী হইল। আমার বিশ্বাস, এই যুদ্ধের পর ভগ্নপ্রায় ওসমান বঙ্গের পুনরুদ্ধারে আর মুঘলশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলিবার সুযোগ পাইবে কি-না, সন্দেহ। আজিকে এই শিক্ষাই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে যে, অত্যুগ্র অন্যায়সেবী অমানুষ যখন এই বিশ্ব-নিয়মের সীমা লঙ্ঘন করে—তখনই বিশ্বনিয়ন্তার অব্যর্থ মহিমা প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অবলুপ্ত করিয়া দেয়। আজ সেই বিশ্বেশ্বরের কৃপায় আমরা শত্রুর দুষ্ট আশা নিষ্ফল করিয়াছি, জয়-লাভ করিয়া দেশমাতৃকার সম্মান রক্ষা করিয়াছি। আমরা এখন বিপদ্-মুক্ত, কিন্তু কর্ম-বিমুখ হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুখনিদ্রায় কালহরণ করিলে ভগবান্ রুষ্ট হইবেন। আপন আপন কর্ম-সাধন দ্বারা প্রাণধারণের গ্লানি দূর করিতে হইবে, দেশকে করিতে হইবে

সমুন্নত। সকলে একপ্রাণ, একমন হও, সমান সংকল্প, সমান মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সম্মিলিত হও, তোমাদের লক্ষ্য সমান হউক্, দেখিবে—বাঙ্গালীর বল-বুদ্ধি, কর্মশক্তি ও গৌরবের নিকট সর্বজাতি সর্বদেশ সসম্ভ্রমে শির অবনত করিবে।”

দেবী ভবশঙ্করীর ওজস্বিনী বাণী সকল স্তরের পৌরজন ও জানপদগণের অন্তর সমভাবেই স্পর্শ করিল। সর্বসাধারণ তাঁহার মাহাত্ম্য-কীর্তনে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। কয়েকজন বহুমানিত সমাজনেতা ও মহত্তর অগ্রণী হইয়া রাজ্ঞীর সমীপে আপনাদের সরল প্রাণের ভাষা প্রকাশ করিলেনঃ “মাতা, ভাগ্য-বিধাতার করুণার পুণ্যে আমরা তোমার ন্যায় অসাধারণ শক্তিমতী মহীয়সীকে পাইয়াছি। পরমদেবতার বর শিরে ধরিয়া মঙ্গল-দীপ-হাতে আসিয়াছ দেশধাত্রী-রূপে ··· এই দেশের সৌভাগ্য, দেশবাসীর সৌভাগ্য। তুমি আমাদের জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিয়াছ, আমাদের সর্বনাশ রোধ করিয়া প্রতিজনকে প্রাণ-দানে চিরঋণী করিয়াছ। তুমি অতুলনীয়া, তুমি পুণ্যশ্লোকা। তোমার সকল উপদেশ আমাদের নিকট অবশ্যপালনীয় মাতৃবাক্য। আমাদের জাতীয় জীবনের এই গৌরবান্বিত শুভক্ষণে সমস্ত প্রজার পক্ষ হইতে আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আপন স্বার্থকে বড় করিয়া আমরা যদি বহুজনের অহিত-অশান্তির কারণ হইয়া উঠি, তাহা হইলে যোগ্য শাস্তি-দানে তোমার ন্যায়দণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া না থাকে···আর যাহা আমাদের সাধনায়ত্ত, তদনুরূপ কর্ম-দ্বারা দেশের উন্নতি ও ইষ্টের জন্য আমরা যদি আত্মনিয়োগ করি,

সে-স্থলে তোমার অনুগ্রহ হইতে কোন দেশ-সন্তান যেন না বঞ্চিত হয়।"

রাজ্ঞী সেই সহজ সত্যভাষণে পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্বার কহিলেন: "দেশবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ, ভালবাসা ও শুভকামনা আমার জীবনের সকল দুঃখকে সুখে পরিণত করিয়াছে। তোমরা আমাকে যে অশেষ মর্যাদা দিয়াছ—তাহার তুলনা নাই। কিন্তু এই ভাগ্যোদয়ের মূলে রহিয়াছেন আমার পরমারাধ্য গুরুদেব। এই প্রমাদগ্রস্তা নারীকে তিনি বারংবার ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এই সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণগুরু আমাকে শুধু ধর্মে কর্মে নয়—রণে দীক্ষা দিয়াছেন। একমাত্র তিনিই দেশের এই মহাসমস্যা-সমাধানে পথ-নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি সর্বশক্তি-প্রয়োগে এই আত্মবিস্মৃত রাজধর্ম-পরাঙ্মুখ প্রজাপালিকাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সুকঠিন ব্রতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মর্মস্থলবাসিনী অশিবহন্ত্রী মহাশক্তিকে আমার নয়ন-সমক্ষে প্রকাশিত করিয়া ভ্রান্তি-দুর্বলতার মোহনিদ্রা হইতে আমাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারি কৃপায় আমি দেবতার নব আবির্ভাবকে বরণ করিয়া লইয়াছি। মহাশক্তি তাঁহার প্রকাশ নব নব অব্যাহত তেজে-সাহসে-কৌশলে উদ্ভাবিত করিয়া আমাকে শত্রু-ভয়-হরণের পরম গৌরবে উন্নীত করিয়া তুলিয়াছেন। "এই দেশমাতৃকার যিনি কল্যাণতম মূর্তি—সেই দেশপূজ্য গুরুদেব সারথি, আমি তাঁহারই পরিচালিত কর্মরথ।

এক্ষণে এই আপরাহ্নিক আনন্দ-সম্মেলনে একটি অতি অপ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে। যে ব্যক্তি আপন

স্বার্থের মোহঘোরে দেশজননীর অপমান-শয্যা বিছাইয়া দিবার জন্য দেশ ও জাতির মহাশত্রুর সহিত হীন ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সিদ্ধিলাভের গুপ্তপথ-প্রদর্শনে একাধিকবার উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছিল, তোমাদের শান্তির নীড়ে আগুন লাগাইতেও যাহার বিবেকে বাধে নাই, যাহার দেহ এই দেশেরই অন্ন-জলে পুষ্ট, সেই দেশদ্রোহী জনশত্রু যে কোন্ নীচাশয়—তাহা তোমাদের হয়তো অবিদিত নাই। সে এই জনপদেরই দীর্ঘকালের রাজ-কর্মচারী চতুর্ভুজ চক্রবর্তী। অখিলকল্যাণময়ী ভগবতী ভবানীর অপার করুণা ভিন্ন আমরা এই সর্বগ্রাসী বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইতাম না। দেশরক্ষার পুণ্যকার্যে আমাদিগকে কয়েকজন দেশভক্ত সন্তানের অমূল্য প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছে। মুক্তি-সংগ্রামে ইহা অনিবার্য, অতএব দুঃখ করিলে তাঁহাদের অমর আত্মার উদ্দেশে প্রকৃত শ্রদ্ধা-নিবেদন ক্ষুণ্ণ হইবে, তাঁহারা যথার্থই পুণ্যভাগী। এখন কর্তব্য—দেশদ্রোহী স্বজাতিদ্রোহীর বিচার। এই পাপিষ্ঠের দল ক্ষমারও অযোগ্য। শত্রুরা এই পাপাচারদিগকেই মারণাস্ত্র-রূপে ব্যবহার করে। এই ঘৃণ্য কাপুরুষরাই বিদেশীগণকে আমাদের শস্যশ্যামলা ফলপুষ্প-শোভিতা মাতৃভূমিকে বারংবার ক্ষতবিক্ষত করিবার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। এই সমস্ত চিন্তা করিলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকে, প্রত্যেক মুহূর্ত অসহ্য হইয়া উঠে। আমাদের দুরদৃষ্ট, নহিলে এই সুরক্ষিত নির্বিরোধ রাজ্য-মধ্যে কি ঐ নীচজাতীয় কালসর্প এরূপ ভয়াবহ সর্বনাশের খেলা আরম্ভ করিতে পারিত? এক্ষণে সেই মানুষ-নামের কলঙ্ক

স্বদেশদ্রোহী কৃতঘ্নের দণ্ডবিধানে আলস্য-করা উচিত নহে। আজিকে জনে জনে ঘোষণা করিয়া দাও যে, চতুর্ভুজের বিচার-পর্ব কল্য প্রাতে সকল প্রজার সমক্ষে নিষ্পন্ন করা হইবে।”

পরদিন প্রাতঃকালে রাজপুরীর সন্নিহিত এক সুবিস্তীর্ণ নাটমন্দিরে সভামণ্ডপ স্থাপিত হইল। প্রজাগণ সেই বিচার দেখিবার জন্য উৎসুকচিত্তে সমবেত হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে বিপুল জনতায় সেই সুবিস্তৃত চত্বরে তিলধারণের স্থান রহিল না। বেলা প্রথম প্রহর অতীত হইবার দুই দণ্ড পূর্বে মহাপাত্র, মন্ত্রণা-সচিবগণ, প্রধানপুররক্ষী, খানাকুলের কোতোয়াল, দুর্গাধিপ- ও গড়সর্দার-সকল সেই বিচারসভায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং রাজ্ঞী এবং তাঁহার অগ্রবর্তী গুরু হরিদেব উপস্থিত হইলেন। বিপুল জয়ধ্বনি উঠিয়া সেই প্রাতঃকালীন শান্ত আকাশ-বক্ষ যেন স্পন্দিত করিয়া তুলিল। রাজ্ঞীর অনুমতি পাইবামাত্র মহাপাত্র বন্দী চতুর্ভুজকে বিচার-সভায় আনিবার জন্য প্রধান রক্ষীকে যথাবিহিত নির্দেশ দিলেন। অল্পসময়ের মধ্যেই ভারপ্রাপ্ত রক্ষিগণ জনতার মধ্য দিয়া শৃঙ্খলিত চতুর্ভুজকে চালিত করিয়া আনিয়া মণ্ডপের সন্নিকট একটি অনুচ্চ কাষ্ঠমঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া দিল। জনসমুদ্রে একবার শব্দ-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস উঠিল, কিন্তু প্রহরিগণের তর্জনে তাহা স্তব্ধ হইয়া গেল।

এইবার রাজ্ঞীর সম্মতিক্রমে মহাপাত্র উঠিলেন, সর্ব-

সাধারণের সমক্ষে চতুর্ভুজের কার্যকলাপ অদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া শেষে বলিলেন: "সশস্ত্র বিদেশী শত্রুদলের গোপন আগমন-সংবাদ পাইয়াও ঐ ব্যক্তির উদাসীন-ভাব খানাকুলনগর-কোতোয়ালের মনে সংশয় জাগাইয়া তুলিয়াছিল। বস্তুতঃ, এই দুর্জনের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে তিনি ভোলেন নাই, এবং অবস্থা-বিবেচনায় বিহিত-সম্পাদনে ক্ষণমাত্র আলস্যও করেন নাই। তাঁহার অবিচলিত কর্তব্যবুদ্ধি আমাদের এই বিপদ্-উদ্ধারে প্রথম ও প্রশস্ত সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে এই একনিষ্ঠ দেশ-সেবকের মুখেই প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে।"

অতঃপর কোতোয়াল তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ দান করিলেন। সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া প্রজাগণ কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহার পর দেওয়ান, পুররক্ষী প্রভৃতি রাজপুরুষগণের বক্তব্য বিষয় চতুর্ভুজের বিরুদ্ধে স্বদেশদ্রোহিতার যুক্তি-প্রমাণ আরও অখণ্ডনীয় করিয়া তুলিল। তখন সহস্র সহস্র কণ্ঠ বজ্রনিনাদের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল: "ঐ সর্বনেশের কথা আমাদের সমস্ত দেহে-মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে···আজ্ঞা করুন—দেশের ঐ সাক্ষাৎ অলক্ষণকে আমরা এই পৃথিবী হইতে লোপ করিয়া দিই···লোষ্ট্র-বৃষ্টি করিয়া উহাকে কুকুরের মত মারিব।"

প্রহরিগণ উত্তেজিত জনতাকে অতিকষ্টে প্রশমিত করিবার পর মহাপাত্র কঠিন প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিয়া উঠিলেন: "যে

নরপশু অতিলাভ-লোভে দেশ ও দেশবাসীর বিশ্বাস পদদলিত করিয়া সমূহ অনিষ্ট-সাধনে উদ্‌যোক্তা হয়, তাহার প্রতি তোমাদের আক্রোশ ও বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক্‌ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমাদের এই অশান্তভাব আমি কোনক্রমেই সমর্থন করিতে পারি না। একক অপরাধীকে বহুজনে হত্যা-করা পৌরুষের কার্য নহে, ইহা শৃঙ্খলাহীন বর্বরযুগেই শোভা পাইত। অকাট্য প্রমাণ-দ্বারা দোষীর প্রকৃত দোষ নির্ণয় করিয়া যথার্থ বিচার সম্পাদিত হইবে। সর্বসাধারণকে শিক্ষা- ও চক্ষু-দানের জন্য এই বিচারসভা আহূত হইয়াছে। এই রাজ্যের অধীশ্বরী দেবী ভবশঙ্করী দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্রী, তিনি প্রজাগণের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিচার সাব্যস্ত করিবেন। অতএব শেষ বিচার-ফলের জন্য তোমরা কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা কর।"

তদনন্তর রাজ্ঞীর প্রশান্ত মূর্তির 'পরে নিস্তব্ধ নিশ্চল প্রজাবর্গের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। সকলে অনুভব করিল---সেই অনিন্দ্য-গম্ভীর মুখে সুপরিস্ফুট তাঁহার অন্তরগুহাবাসিনী রহস্যময়ী প্রকৃতি তাহাদের মনে এক পবিত্র মাতৃভাব জাগাইয়া তুলিতেছে।—রাজ্ঞী সেই বিরাট্‌ সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া জনগণকে সম্ভাষণ-পূর্বক মুক্তকণ্ঠে বলিলেন: "আজ তোমাদের নিশ্চিন্ত মুখগুলি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। জননী জন্মভূমির প্রতি ভক্তি-প্রীতি যাহাতে অচলা হয়, তোমাদিগকে সেই সাধনা করিতে হইবে। তোমরা সকলে জাতি-ধর্ম-নির্বিচারে এক হইয়া যদি বাস কর, তাহা হইলে বহিঃশত্রু তোমাদের কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইবে না। এই জাতির অনেকেরই

মধ্যে স্বার্থের বিষ ঢুকিয়াছে। দিনে দিনে এই অনুদারের দল ছুটিয়া চলিয়াছে অধঃপাতের দিকে ; ইহারা হীন লোভ, নীচতা, মাৎসর্য এবং হিংসার দাস হইয়া পড়িয়াছে। ইহারাই দেশের শত্রু, দেশবাসীর শত্রু। লোকসমাজে এই শ্রেণীর লোক ছদ্মপরিচয়ে বিচরণ করে এবং সুযোগ পাইলেই ইহাদের ভিতরকার মানুষ কুটিল সর্পের ন্যায় বাহির হইয়া আসিয়া দংশন করিতে ছাড়ে না।”

হঠাৎ তাঁহার বাক্যে ছেদ পড়িল, চতুর্ভুজের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া তিনি তীব্রস্বরে পুনরায় কহিলেন : “তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তোমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার দেবতুল্য স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে আমি সর্ববিষয়ভোগে বিগতস্পৃহ হইয়া উহার হস্তে অতি-বিশ্বাসে রাজ্যরক্ষার ভার ন্যস্ত করি। আমাদের সেই দুর্দিনে প্রতীক্ষিত সুদিন আগত ভাবিয়া পাঠান-শত্রুর রাজ্য-গ্রাস-লালসা উগ্র হইয়া উঠিল, এবং অবসর বুঝিয়া চতুর্ভুজকে রাজগি দিবার ছলে নানা উপায়ে প্রলুব্ধ করিয়া আপন আয়ত্তে আনিতে বিলম্ব করে নাই। উভয়ের লালসা এমনি গণ্ডি ছাড়াইয়া গেল যে, শুদ্ধ নিয়ম-রক্ষা করিবার মতও ক্ষীণতম মনুষ্যত্ব উহাদের অবশিষ্ট রহিল না। ঐ বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় এই হীন চক্রান্ত-জাল সুকৌশলে বিস্তার করিয়া আফগান-নায়ক আমাদের দেশকে কবলিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর শক্তির পরিমাণ উপলব্ধি করিতেও তাহার বাধিয়াছিল, সেইজন্য তাহাকে আপনার উপর অন্ধবিশ্বাসের নিদারুণ দণ্ড দিয়া বেত্রাহত

গোমায়ুর ন্যায় প্রাণভয়ে ফিরিতে হইয়াছে। ঐ বিশ্বাসহন্তা দেশদ্রোহীর অপকর্মের ফলে বিপদ্ সাংঘাতিক হইবা উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ঘোরতর অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করিবার সংকল্পে এই দেশেরই বীর ও বীরাঙ্গনাগণ প্রাণের মায়াকে নির্বাসিত করিয়াছিল। প্রজাপুত্রগণ ঃ আমি অঙ্গীকার করিয়াছিলাম—দেশের স্বাধীনতা, ন্যায় এবং শান্তির প্রতিষ্ঠা করিব··· এ-ক্ষেত্রে কোন অমঙ্গল যদি ঘটিত, তাহা সহ্য করাও আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। ভগবৎকৃপায় আমাদের মাতৃভূমির মান-রক্ষা হইয়াছে। এই অপ্রত্যাশিত বিপদের মূলে যেমন এক বিশ্বাসঘাতক ছিল, তেমনি ইহার সূত্র আবিষ্কার করিয়াছিল এক অরণ্যচারী ব্যাধ। দৈবের এমনি খেলা যে, এই নিরক্ষর সরলপ্রাণ বনচর সর্বপ্রথম বিপদের ইঙ্গিত পাইয়া কর্তব্য-বোধে স্থানীয় নগরনায়কের গোচরীভূত করে। তৎপরেই অক্লান্ত উদ্যমে শত্রু-প্রতিরোধের আয়োজন কৃতঘ্ন চতুর্ভুজের সমস্ত ছলনা নিষ্ফল করিয়া দেয়। বিপদ্ আসিল বটে, কিন্তু করালমূর্তিতে নহে।”

অনন্তর রাজ্ঞী সস্মিতমুখে কালুচণ্ডালকে সাদর-আহ্বান দিলেন। এক যুবাবয়স্ক বলিষ্ঠ পুরুষ অনাবৃত দেহে অগ্রসর হইয়া আসিল—যেন সুচিক্কণ কৃষ্ণশিলায় ক্ষোদিত মূর্তি। প্রথমেই সে প্রণত হইয়া রাজ্ঞীর চরণে এক-মুঠি বনফুল উপহার দিল। রাজ্ঞী কালুকে রত্ন, বসন ও অর্থ-দানে পুরস্কৃত করিলেন। পুনর্বার তাঁহার অগ্নিকল্পা বাণী মুখরিত হইয়া উঠিল : “ঐ কালুচণ্ডাল সমাজের সর্বনিম্নস্তরের হইয়াও তাহার

সুমতি ও মনুষ্যত্বের পরিচয়ে সর্বোচ্চস্তরের কোন ব্যক্তি অপেক্ষা ন্যূন নহে। একটা বনচারী মূর্খ চণ্ডালের যে দেশাত্মবোধ আছে, ঐ ভদ্র-খ্যাত ব্রাহ্মণ কুলাঙ্গারের তাহার লেশমাত্র নাই। কালু তাহার কর্মগুণে চণ্ডাল নয়—প্রকৃত মানুষ, আর ঐ ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম—সকলের অবজ্ঞার পাত্র অমানুষ। ··· এবার তোমরা বলো—এই দেশদ্রোহী মানবদ্রোহীর কিরূপ শাস্তি হওয়া উচিত ?"

সকল প্রজা সমস্বরে বলিয়া উঠিল : "প্রাণদণ্ড।"

রাজ্ঞী কহিলেন : "চতুর্ভুজ, তোমার জীবন্ত সমাধি হওয়াই উচিত। কেবল নিজের স্বার্থটাই তুমি চিনিয়াছ, জগতে অন্য মানুষের মূল্য তোমার নিকট অতি-তুচ্ছ। তুমি মানুষ নামেরও অযোগ্য। ··· কিন্তু আমার বিচার অন্যরূপ। ওই হীন কাপুরুষের ঘৃণিত দুষ্ট রক্তে এই শ্যামা জন্মভূমির পূণ্যদেহ কলুষিত করিব না। উহার শাস্তি—চিরকারাবাস। ব্রাহ্মণ হইয়াও পিশাচপ্রকৃতি, শূদ্রের অধম। ঐ দুর্মতিকে প্রতিদিন শূদ্রে পদাঘাত করিবে। এই কালু উহাকে দিনে দিনে পদাঘাত করিয়া চেতনা দিবে এই যে, দেশদ্রোহিতা মহাপাপ। আর প্রত্যেক প্রজা গিয়া একে একে নিত্য উহাকে কশাঘাত করিয়া বুঝাইয়া দিবে—কৃতঘ্নতার কি পরিণাম। ইহাই ঐ নরকুক্কুরের উপযুক্ত শাস্তি।"

•

শাস্তির কথা শুনিয়া চতুর্ভুজ শিহরিয়া উঠিল, দোষক্ষালনের জন্য বহুতর অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে লাগিল—বহু যুক্তি দেখাইল। কিন্তু সমস্ত প্রমাণই তাহার বিরুদ্ধে, তাহার বাঁচিবার

একটি মাত্র পথও মুক্ত ছিল না। অবশেষে চতুর্ভুজ শাস্তির ভয়ে হতজ্ঞান হইয়া করুণ আর্তনাদে সভাস্থল পূর্ণ করিয়া তুলিল, তথাপি সে কাহারও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না। সকলেই তাহার প্রতি বিমুখ, প্রত্যেকে কঠিনভাবে মুখ ফিরাইল। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া চতুর্ভুজ রাজ্ঞীর নিকট আকুল প্রার্থনা করিয়া বলিল : "দেবী, দুরাত্মা ওসমান আমাকে রাজ্যের লোভ দেখাইয়াছিল সত্য, আমার সাহায্য-লাভের প্রত্যাশায় অনেক উপহারও পাঠাইয়াছিল ; কিন্তু আমি তাহার সহিত কোন প্রত্যক্ষ যোগ রাখি নাই, তাহাকে একটিমাত্র সৈন্য দিয়াও সাহায্য করি নাই। আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মুক্তি ভিক্ষা করিতেছি। এই রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইব সুদূর কোন দেশে, সেখানে আমি ভিক্ষা করিয়া দিন কাটাইয়া দিব।"

রাজ্ঞী বজ্রকঠোরকণ্ঠে উত্তর দিলেন : "চতুর্ভুজ—তুমি যে চাতুরীর জাল ছড়াইয়াছিলে, তাহাতে তুমিই আজ ধরা পড়িয়াছ বলিয়াই তোমার এই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু তোমার দুরভিসন্ধি যদি সফল হইত, তাহা হইলে কি তোমার অন্যায় কার্যের জন্য বিরোধীপক্ষের কোন কাতর মিনতিতে কর্ণপাত করিতে ? তোমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলেই একাধিকবার আমাকে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শিবমন্দিরে আমি যখন একাকিনী দেবতার ধ্যানে মগ্ন ছিলাম, তখন শত্রুকে কে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল ? ভবানীমন্দিরে আমার পূর্ণাভিষেক-কালে কে প্রবল শত্রুকে পথ-নির্দেশ করিয়াছিল ? গৃহশত্রু ভিন্ন বহিঃশত্রুকে এই নিতান্ত নিভৃত ধর্মসাধনের

সংবাদ কে দিতে পারে? এ-স্থলে বিপদ্‌ অপেক্ষা গ্লানি হইয়া উঠিয়াছিল দুঃসহ। তুমি এতদূর নীচ যে, আমাকে বিধর্মী-কর্তৃক বন্দিনী লাঞ্ছিতা করিবার—এমন-কি আমার ধর্মনাশ করিবার হীনতম প্রয়াসে মত্ত হইয়াছিলে। তুমি আবার ক্ষমা প্রার্থনা কর! তোমাকে ক্ষমা করা অধর্ম। দেবতা রুষ্ট হইবেন, জনগণ অসন্তুষ্ট হইবে, দিকে দিকে ধিক্কার বাজিবে। দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী, জনসাধারণের মহাশত্রুকে মুক্তি দিবার অধিকার আমার নাই। তোমাকে কৃতকর্মের ফল-ভোগ করিতেই হইবে দেবতা, গুরু ও প্রজাগণকে সাক্ষী রাখিয়া আমি তোমার বিচার সম্পূর্ণ করিয়াছি। এই বিচার—ন্যায়বিচার।"

বিপুল জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি তুলিয়া মিলিতকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল: "জয় ধর্মের জয়! জয় সত্যের জয়। জয় দেশমাতার জয়! জয় রাজলক্ষ্মী দেবী ভবশঙ্করীর জয়!"

রায়বাঘিনী

রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর বিজয়-বার্তা লোকমুখে দূর-দূরান্তরে বিঘোষিত হইল। ক্রমে ক্রমে যোজনগন্ধা পুষ্পের ন্যায় তাঁহার যশঃসৌরভ বিভিন্ন রাজদরবারে গিয়া পৌঁছিল। রাজা ও রাজন্যক এই বঙ্গবীরাঙ্গনার অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইলেন, এবং তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন পূর্বক পরস্পর শুভাকাঙ্ক্ষা বিনিময়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে সেই যুদ্ধবিজয়-সংবাদ দিল্লীশ্বর আকবরের কর্ণ-গোচর হইল। মুঘলসম্রাট্ প্রকৃত তথ্য জানিতে কৌতূহলী হইয়া এই যুদ্ধ-সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আহরণ করিবার নিমিত্ত বঙ্গে স্থলাভিষিক্ত রাজকর্মচারীর নিকট আদেশ প্রেরণ করিলেন। যথাকালে ঘটনার প্রামাণ্যে বাদশাহ্ নিঃসন্দেহ হইয়া এক জনপদ-পালিকা বাঙ্গালী বীরনারীর অসাধারণ কৃতিত্বে সবিশেষ প্রীত হইলেন। রাজ্ঞী ভবশঙ্করার বীরত্ব তাঁহাকে অত্যন্ত বিমুগ্ধ করিল। কারণ, রাজ্ঞীর সহিত যুদ্ধে রণকুশল আফগান-সর্দার পরাস্ত এবং বিখ্যাত পাঠানবীরগণ নিহত হওয়ায় বঙ্গে পাঠানশক্তির মেরুদণ্ড ভগ্ন হইল, বিচক্ষণ বাদশাহ্ তাহা উপলব্ধি করিলেন। তিনি রাজ্ঞীর অদ্ভুত যুদ্ধকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই প্রশংসা কেবল তাঁহার বাক্যে ও মনে সীমাবদ্ধ রহিল না। বাদশাহ্ উদার-

স্বভাব, তিনি নিজে বীর, বীরত্বের মান রাখিতে অণুমাত্র কৃপণতা করিলেন না। তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি, সেই শক্তির মহত্ত্ব-ধারা দিল্লী হইতে প্রবাহিত হইল বাঙ্গালার ক্ষুদ্র নগরীর অন্তর্দেশে।

গুণগ্রাহী মহামতি আকবর রাজ্ঞী ভবশঙ্করীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বহুমূল্য উপহার-সহ অম্বররাজ মান-সিংহকে ভূরিশ্রেষ্ঠে প্রেরণ করিলেন ; শুধু তাহাই নহে বাদশাহ্ তাঁহার গুণজ্ঞতার প্রকৃত নিদর্শন-স্বরূপ একটি রত্নাধারে রক্ষিত সনদ প্রদান করিতেও বিস্মৃত হইলেন না।

মুঘলবাদশাহ্ আকবরের প্রতিভূ-রূপে মানসিংহের আগমন-সংবাদ বার্তাবহ বহন করিয়া আনিল গড়ভবানীপুরে। যে-সংবাদ সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত, যাহার অজ্ঞাত কারণ হইতে কার্য অনুমিত হয়, তাহা প্রথমমুখেই রাজ্যের প্রধানগণ সানন্দে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সকলেরই মনে সংশয় উঁকি মারিতে লাগিল—হয়তো রাজনীতিজ্ঞ আকবরের ইহা একটি কূটনৈতিক চাল। এই সংবাদ রাজ্ঞীর গোচরে আসিলে—তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু গুরু হরিদেব তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন : "মা, জগদীশ্বর অন্ধ নহেন। মহৎকর্মের কোনদিন কুফল ফলে না। দিল্লীশ্বর উদারপন্থী এ-ক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষ হইতে কোন অপকার বা রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য-হরণের আশঙ্কা নাই। তুমি অতিথির অভ্যর্থনার সবিশেষ আয়োজন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি রাখিয়ো না।

অতঃপর সম্মানিত অতিথির সংবর্ধনার নিমিত্ত যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করা হইল। নির্দিষ্ট দিনে মানসিংহ ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথিকে দেবতা-জ্ঞানে সৎকার-করা হিন্দুগণের নিকট চিরাগত সংস্কার. তদনুসারে মানসিংহ যেরূপ আন্তরিক আদর-আপ্যায়ন পাইলেন—তাহা তাঁহার জীবনে স্মরণীয় হইয়া রহিল। বিশ্রামান্তে তিনি প্রকাশ্য সংবর্ধনা-সভায় উপনীত হইবেন—ইহাই স্থির ছিল।

গড়ভবানীপুর-দুর্গ-সংলগ্ন এক বিস্তৃত চত্বরে সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ-তলে বিরাট্ সভা-মণ্ডপ সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেই সভায় আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন বিষ্ণুপুররাজ, বলগড়রাজ, বর্দ্ধমানরাজ, বাহিরগড়ের ক্ষত্ররাজ প্রমুখ রাজন্যবর্গ এবং সম্ভ্রান্ত নাগরিক ও গ্রামের মহত্তরগণ। এতদ্ভিন্ন দেশের গুণী জ্ঞানী সকলেই সাদর আহ্বান পাইয়াছিলেন এবং ঘোষণা-দ্বারা প্রজাগণকে বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছিল। সেই সুবিস্তীর্ণ সভাস্থল সর্বজনের সমাবেশে তরঙ্গায়িত সমুদ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

একটি শ্বেতবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মানসিংহ অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ অম্বরের রাজপুত-রক্ষীসেনা। মণ্ডপের সম্মুখে গড়ভবানীপুর দুর্গের প্রধান তোরণ। সে-স্থলে অল্পসংখ্যক সুসজ্জিত হস্তী ও অশ্ব লইয়া সুশৃঙ্খলভাবে আরোহিগণ অপেক্ষা করিতেছিল। মানসিংহ উপস্থিত হইবামাত্র কাড়া-নাকাড়া বাজিয়া উঠিল, এবং হস্তী ও অশ্ব তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া পশ্চাদ্ভূমিতে সরিয়া দাঁড়াইল। মানসিংহ দুর্গ-তোরণ অতিক্রম করণান্তর মণ্ডপ-তোরণের সম্মুখে

আসিয়া অবতরণ করিলেন। সেই স্থানে রাজ্যের মহাপাত্র, দেওয়ান, বিষ্ণুপুররাজ প্রমুখ প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা গরীয়ান্ রাজঅতিথিকে সসম্মানে পথ দেখাইয়া মণ্ডপে লইয়া গেলেন। তোরণের পার্শ্ব-মঞ্চে শ্রুতিমনোহর মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। মানসিংহ সুবৃহৎ সভা-প্রাঙ্গণের সজ্জা-সৌষ্ঠব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। দিকে দিকে ধ্বজপতাকা, বায়ুভরে ধ্বনিত ঘণ্টিকানিশান, এবং নানা আকারের ও বর্ণের কুসুম-মাল্যের সুমোহন সমাবেশ, সমস্ত মিলিয়া যেন এক গন্ধ-রূপের মোহিনী মায়াপুরী রচনা করিয়াছে।

মণ্ডপের উভয়পার্শ্বে সেনানায়কগণ-পরিচালিত অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা দলবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিল। মানসিংহকে দেখিবামাত্র সকলে দুই পদ হটিয়া অভিবাদন করিল। সকলকেই যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তিনি মণ্ডপ-দ্বারে প্রবেশ করিলেন। সমস্ত মণ্ডপটি কমলদলে সুসজ্জিত, ধূপাগুরু-সুরভিতে আমোদিত, এবং বিচিত্র মণ্ডপের মধ্যস্থলে পল্যঙ্ক স্থাপিত অম্বররাজ মানসিংহ সেই পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। সহস্র সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনির সঙ্গে মিলিত হইল গম্ভীর শঙ্খনাদ। সেই মণ্ডপে নিমন্ত্রিত রাজন্যমণ্ডল এবং রাজ্যের পাত্র মিত্র সভাসদ্ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মণ্ডপের একটি দর্শনীয় স্থানে রাজপুরোহিত ও বেদ-গাতা চন্দনচর্চিত সৌম্যদর্শন দ্বাদশ ব্রাহ্মণ শোভা পাইতে লাগিলেন। পর্যঙ্কের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত রাজকুলগুরু

হরিদেবের জন্য একটি আসনবেদী এবং বামপার্শ্বে রাজ্ঞী ও রাজকুমারের জন্য রক্ষিত একটি প্রমাণ ও আর-একটি ক্ষুদ্রাকার রাজাসন তখনও শূন্য ছিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেরী-তূরী নিনাদিত হইল। গুরু হরিদেবের সহিত রাজ্ঞী কুমার প্রতাপনারায়ণের কর-ধারণ করিয়া সভাস্থলে সহাস্যবদনে দর্শন-দান করিলেন। পুনরায় তুমুল হর্ষধ্বনি উঠিল। রাজ্ঞী মান্যবর অতিথি অম্বররাজকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন-পূর্বক রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং গুরুদেব আপন আসন গ্রহণ করিলেন। মানসিংহ রাজ্ঞীকে উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, প্রসাদগুণ অতুলনীয়, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব। এই বঙ্গবীরাঙ্গনা মহীয়সী নারীর প্রতি সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় তাঁহার শির আপনা হইতেই অবনত হইয়া আসিল। কিন্তু রাজ্ঞীকে দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাঁহার মনে প্রশ্ন উঠিল: যাঁহার এই অপূর্ব প্রশান্ত রূপ, এই কমনীয় মূর্তি, তাহার মধ্যে এরূপ বীর্যবত্তা কিরূপে সম্ভবপর হইল? গুরু হরিদেবের উচ্চারিত ঋঙ্‌মন্ত্রে মানসিংহের চিন্তা-সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। পরমুহূর্তেই ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত সামগাথার উদাত্ত স্বর উত্থিত হইয়া সভাস্থলে এক পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করিল। তৎপরে রাজ-পুরোহিত অতিথির উদ্দেশ্যে প্রশস্তি-পাঠ করিলেন। অম্বররাজ ভুরসুটবাসীর সেই সরলসুন্দর অকৃত্রিম সম্মাননায় ভাবাবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মানসিংহ সর্বজনসমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা

করিলেন ঃ "এই রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে প্রজাগণ পর্যন্ত মিত্র-সুলভ উদার আচরণে আমাকে পরিমুগ্ধ করিয়াছেন। আমি শাহানশাহ্ আকবরের প্রতিনিধি-রূপে তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। যে-সম্মান আমাকে প্রদর্শন করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেই মহতেরই সম্মান বলিয়া আমি গণ্য করিব। এই কার্য-দ্বারা ভুরস্টের গৌরব ক্ষুন্ন হয় নাই, বরং এই রাজ্য বিশৃঙ্খল বঙ্গদেশে একটি মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। আপনাদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি মহানুভব মুঘল-বাদশাহের অভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দৃঢ়বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করিয়া আনিতেছে। বাদশাহের সংকল্প—খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত হিন্দুস্থানকে এক রাজনীতির সূত্রে বন্ধন-করা, কিন্তু কোন দেশেরই স্বাতন্ত্র্য খর্ব করা তাঁহার মূল উদ্দেশ্য নহে, কেবল আনুগত্য ও মৈত্রী-সম্বন্ধ তাঁহার প্রার্থিত। বারো ভূঁইয়ারা অশোভন স্বার্থ-প্রভাবে ভ্রান্ত নীতিতে ছুটিয়া চলিয়া যে-অন্যথাচরণ করিতেছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের দেশপ্রেম প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা শক্তিশালী হইয়াও কল্যাণের দাবি অপেক্ষা স্বার্থের দাবিকে উচ্চে স্থান দিয়াছেন। উপরন্তু স্থানীয় জমিদারগণ ভ্রান্ত গণনার বশবর্তী হইয়া রাজদ্রোহী ফেরিঙ্গি হার্মাদ জলদস্যু ও অত্যাচারী বর্বর মগদিগের লুণ্ঠন- ও দুষ্ট-কার্যের গোপন সমর্থনেও কুণ্ঠা-বোধ করেন না। তদুপরি বিচ্ছিন্ন আফগানসেনার কয়েকটি ভ্রাম্যমাণ দল নানা স্থানে দেশবাসীকে অন্যায়-পীড়নে ব্যতিব্যস্ত

করিয়া তুলিয়াছে। এই সমস্ত কারণে মুঘল-সাম্রাজ্যের শান্তি ও সংযোজন ব্যাহত হইতেছে। ইহার ভবিষ্যৎ ফল শুভ নহে, প্রবল শক্তির সংঘাতে ঐক্যহীন স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি চূর্ণ হইয়া যাইবে, কর্মবিপাকে পতিত হইয়া ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। এই দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গ অখিলবঙ্গের মধ্যমণি, একটি দুর্গ-বিশেষ। এই বিস্তীর্ণ ভূমি সুজলা সুফলা এবং সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ। সারা বাঙ্গালায় যখন বিশৃঙ্খল অবস্থায় আধিপত্য চলিতেছে, সেই দুঃসময়ে এই দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের অধীশ্বরী অন্যায়সেবী আফগান-শক্তিকে পঙ্গু করিয়া দিয়া শুধু বঙ্গদেশের নহে—মুঘল-সরকারের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার কীর্তির সৌরভ মুঘল-দরবারে গিয়া পৌঁছিয়াছে। শাহানশাহ্ দিল্লীশ্বর আকবর তাঁহার এই অতুলনীয় অবদানে অতিরিক্ত সন্তোষ-লাভ করিয়াছেন। সেই শুভবার্তা আজিকে সর্বসমক্ষে আমি জ্ঞাপন করিতেছি। এ-ক্ষেত্রে আমি মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছি যে, বাঙ্গালার এই পরম গৌরবের দিনে এই অনুষ্ঠান রায় রাজা রুদ্রনারায়ণের মহিমময়ী মহিষীর যথার্থ অভিবন্দনা-উৎসব। এই কারণেই এই বিরাট্ উৎসব-সভা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে।"

সকলের উল্লাস-ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। মানসিংহ পুনর্বার রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন: "ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজশ্রী দেবী ভবশঙ্করী, শাহানশাহ্ মহামতি আকবর আপনার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া আপনার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

রাজ্ঞী নম্রভাবে উত্তর দিলেন : "সম্রাট্ গুণগ্রাহী, তিনি বীর, সেজন্য ন্যায়-শক্তির মর্যাদা রক্ষা করিয়া আপনারই মর্যাদা-বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

মানসিংহ স্মিতমুখে বলিলেন : "মহাদেবীর সম্মান-স্বরূপ শাহানশাহ্ বহুমূল্য মণি-রত্ন উপহার প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি গ্রহণ করুন।"

দেবী ভবশঙ্করী মুঘলসম্রাট্-প্রদত্ত উপহারগুলি সানন্দে গ্রহণ করিয়া বলিলেন : "কৃতজ্ঞ আমি। আমার ইচ্ছা—আমার স্বদেশের শান্তি ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ হউক্।"

অম্বরপতির মনে হইল—সেই বীরনারীর শান্ত-শিস্ট অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক কণ্ঠস্বরে যেন তাঁহার মধ্যে যাহা অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, তাহারই রূপ প্রকাশিত। তিনি অল্পক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তৎপরে সুস্পষ্ট ভাষণে কহিলেন : "শাহানশাহ্ আকবর এই রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করিবেন, এরূপ কল্পনাও তাঁহার মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। আপনার স্বদেশ আপনারই শাসনে-পালনে পূর্বগৌরবের উন্নত বেদীতে অধিষ্ঠিত থাকিবে, ইহা সন্দেহাতীত। আপনার পতি রাজা রুদ্রনারায়ণ মুঘলসম্রাটের অনুগত মিত্ররাজ ছিলেন। এই মৈত্রী ও আনুগত্য আরও সুদৃঢ় হউক্। তাঁহার মর্যাদা-স্বরূপ একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগ ও একখানি কম্বল রাজভাগ-রূপে প্রদান করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। আপনার দেশের স্বাধীনতায় তিনি হস্তক্ষেপ করিবেন না। মুঘলসরকারের মহাফেজখানায় আপনার এই রাজ্যের সহিত চুক্তি-পত্র সুরক্ষিত হইবে। তাঁহার

অধস্তন বাদশাহ্‌গণের আমলেও এই নির্দেশনামা বলবৎ থাকিবে।"

রাজ্ঞী কৃতজ্ঞচিত্তে আবেগ-বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেনঃ "দিল্লীশ্বরের মহাপ্রাণতা স্মরণযোগ্য। আমরা রাজাকে জগদীশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া জ্ঞান করি, তাই হিন্দুস্থানের সম্রাট্‌কে আমার সভক্তি অভিবাদন নিবেদন করিলাম।"

মানসিংহ অবশেষে কহিলেনঃ "শাহানশাহ্‌ মনে করেন—এই দক্ষিণপশ্চিমবঙ্গের অধীশ্বরী আপনি অখিলবঙ্গের শাসনকর্ত্রী হইবার যোগ্যতমা। আপনারই অপূর্ব বীর্য-বলে পাঠানশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, সেইজন্য মুঘলসম্রাট্‌ আপনার পরাক্রমের পুরস্কার-স্বরূপ 'মহারাণী রায়বাঘিনী' এই বীরত্বসূচক উপাধি-দানে আপনাকে সম্মানিত করিয়াছেন।"

ইহার পর মানসিংহ সনদটি রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। রাজ্ঞী গদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেনঃ "শাহানশাহ্‌ দিল্লীশ্বর আকবরের সম্মানিতা মহারাণী ভবশঙ্করী আজি হইতে তৎপ্রদত্ত নব পরিচয়-গৌরবে গৌরবিতা রায়বাঘিনী।"

তৎক্ষণাৎ গুরু হরিদেব প্রসন্ন-বদনে বলিয়া উঠিলেনঃ "রায়বাঘিনী-নামেই তুমি হইবে চিরপ্রসিদ্ধা (১)। তুমি শত্রুর

(১) অদ্যাবধি দক্ষিণপশ্চিম-বঙ্গের লোকে কোন নারীর নির্ভীকতা ও উগ্রপ্রকৃতি বুঝাইবার জন্য সচরাচর বলিয়া থাকে—'রমণী যেন রায়বাঘিনী'। ভবশঙ্করীর কীর্তিকলাপ আজ অবলুপ্ত বটে, কিন্তু তাঁহার নাম প্রবাদ-বাক্যের মত প্রচলিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ, এই নামের মূল সন্ধান পূর্বে কেহ করেন নাই। কোন কোন অভিধানে ইহার একটি মনগড়া অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

ঘনী এই যুদ্ধক্ষেত্রে রাজ্ঞী পাঠানসর্দ ক পরাস্ত করেন।

য়ব নী পৃঃ ৩

ভীতির কারণ, তুমি মুক্তিপ্রদা, তুমি নির্ভীকচিত্ত। আর যে-যুদ্ধক্ষেত্রে তুমি দেশের শত্রুনাশ করিয়াছ, সেই স্থান বঙ্গ-বীরাঙ্গনার কীর্তির তীর্থরূপে যুগে যুগে সাক্ষ্য দিবে (১)। জয়তু মহারাণী ভবশঙ্করী রায়বাঘিনী।"

সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র কণ্ঠে জয়নাদ উঠিল: "জয় মহারাণী ভবশঙ্করী রায়বাঘিনীর জয়।"

উৎসব-পরিসমাপ্তির পর অম্বররাজ মানসিংহ প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে গড়ভবানীপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বিদায়-কালে রাজ্ঞী শাহানশাহ্ আকবরের মর্যাদা-স্বরূপ

(১) যে-স্থানে মহাশক্তিশালিনী রাণী ভবশঙ্করী পাঠানসর্দারকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পাঠানশক্তি চিরতরে বঙ্গ হইতে বিলুপ্ত করেন, সেই সমরক্ষেত্র এখনও "রায়বাঘিনীর পড়া" নামে বিখ্যাত আছে। "রায়বাঘিনীর পড়া" তারকেশ্বরের প্রায় ৫।৬ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল ও প্রস্থে প্রায় এক মাইল। ইহার স্থানে স্থানে চাষ-আবাদ হইতে দৃষ্ট হয় কিছুকাল পূর্বে। চাষ করিতে করিতে লাঙ্গলের ফালে ভূগর্ভ-নিহিত নরকপাল ও নরকঙ্কাল তৎকালেও মধ্যে মধ্যে উত্তোলিত হয়। সেই সময়ে সংশয় জাগে যে, এই যুদ্ধক্ষেত্র অচিরেই শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবীরাঙ্গনার বীরত্বের লীলাভূমি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া চিরতরে বিস্মৃতির অতলতলে তলাইয়া যাইবে। সেই সংশয় নিবারণের কোন সুব্যবস্থা হয় নাই এবং রায়বাঘিনীর নামে স্মৃতিস্তম্ভ উত্তোলনেরও কোন প্রচেষ্টা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।—বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি গৌরবময় পৃষ্ঠা অনাদরে ধরাগর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে।

যথাযোগ্য উপঢৌকন ও প্রস্তাবিত রাজভাগ প্রেরণ-পূর্বক আপনার রাজনীতিক শ্রেয়োবুদ্ধির নিদর্শন দিলেন।

অপ্রতিমপ্রভাব সমগ্র হিন্দুস্থানের জন-বন্দিত সম্রাটের স্বতঃপ্রবৃত্ত সম্মাননায় রাজ্ঞী ভবশঙ্করী কেবল অভিভূতই হইলেন না, পরধর্মের এক বঙ্গনারীর প্রতি অপক্ষপাত প্রীতি-প্রকাশে তাঁহার প্রশস্তহৃদয়ের প্রমাণ পাইয়া মুগ্ধও হইলেন। সেই বিজয়-সংবর্ধনার দিনে ভবশঙ্করীর চোখের 'পরে ভাসিয়া উঠিল প্রথম-মিলন-লগ্নের হোমানল-দীপ্ত প্রসন্ন-গম্ভীর স্বামীর মূর্তিখানি। প্রিয়তম পতিকে কাছে পাইবার জন্য তাঁহার মনঃপ্রাণ আকুলভাবে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। যে-পতি ছিলেন স্বদেশ-আত্মার বীরমূর্তি, সেই পতির আদর্শ ও কর্মনীতি অনুসরণ করিয়া, তাঁহারই দীক্ষা-মন্ত্রের শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন, তাই আজ তাঁহার উন্নতশিরে গৌরব-মুকুট শোভা পাইতেছে, তাঁহার ভালদেশে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বিজয়-ললাটিকা। যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল।

তিনি আর ধৈর্য-ধারণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বামীর প্রতিমূর্তি, তাঁহার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা বালক-পুত্র প্রতাপকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া তিনি অবিরলধারে অশ্রু-বিসর্জন করিতে লাগিলেন। হৃদয়াবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ভবশঙ্করী হতজ্ঞানের ন্যায় বসিয়া রহিলেন, তাঁহার দৃষ্টি অচঞ্চল,

যেন কোন্ বিপুল সুদূরে প্রসারিত, এক অনির্বচনীয় বিরহ-ব্যাকুলতায় তাঁহার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ। মুক্ত বাতায়ন-পথে সূর্যালোক ও মৃদুমন্দ বাতাস কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদার বন্ধুর মত তাঁহার অশান্ত চিত্তলোকে যেন শান্তির অশ্রুত মন্ত্র পৌঁছাইয়া দিতেছিল। এইভাবে কতক্ষণ কাটিল, ভবশঙ্করী তাহা জানিতে পারিলেন না।

সহসা পুষ্প-চন্দনের সুগন্ধ ও মৃদু পদধ্বনি তাঁহাকে সচেতন করিয়া তুলিল। তিনি চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন—গুরু হরিদেব কুলদেবতার নির্মাল্য-হস্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। হরিদেব ভবশঙ্করীর অকারণ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন, বলিলেন: "এ-কি এ মা! তোমাকে এরূপ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি কেন? আজিকে কুল-দেবতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করিয়াও তুমি উপস্থিত হও নাই জানিয়া, আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াই এখানে আসিয়াছি। তোমার এই দুঃখের কি কারণ ঘটিল? প্রতাপ তো সুস্থই রহিয়াছে।"

রাজ্ঞী ভবশঙ্করী বাষ্পাকুলনেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন: "সম্রাট্-প্রদত্ত খ্যাতি, রত্ন-পুরস্কার, বিজয়-গৌরব, উপাধির কুহক —এই নিঃশব্দগভীর মুহূর্তে সমস্তই আমার নিকট শূন্য আড়ম্বর এমন-কি বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইতেছে। যাঁহার রাজ্য, এই সম্মান লোক-খ্যাতি যে-বার্যবানের ন্যায্য প্রাপ্য ছিল, তাঁহার পরিবর্তে এই মর্যাদার উপাধি-ভূষণ ধারণ করিতে আমার মর্মস্থলে বাজিতেছে, আমাকে শোভা পায় না।"

হরিদেব সুগম্ভীর মুখে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন: "বৎসে, নিজের প্রতি অবিচার করিয়ো না। পরমগৌরবের দিনে অতি প্রিয়জন স্বভাবতঃই স্মৃতিপটে উদিত হন। কিন্তু আমাদের দেশে এমন অনেক সাধ্বী বীররমণীর দৃষ্টান্ত আছে, যাঁহারা তোমার ন্যায় পতি-বিহনে বারংবার আত্মসংবিৎহারা মোহগ্রস্ত হইয়া পড়েন নাই, বরং তাঁহারা স্বামীর গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহাদের সুচিরসাধনা ছিল। অতীতের জন্য চিরদিন শোক-করা অন্যায়, পুরুষার্থ-লাভের অন্তরায়। তোমার স্বামী তাঁহার কর্তব্য পালন করিয়া বীরের মত উচ্চগতি লাভ করিয়াছেন সাধনলোকে, এবং ইহলোকে তাঁহার যশোবীর্যের ইতিহাস আজিও ম্লান হয় নাই। তাঁহার অন্তরের যাহা শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ছিল, তাহা সম্পূর্ণ করাই তোমার পরম ধর্ম—তোমার পতিভক্তির চরম সার্থকতা। তোমার পুত্রের প্রতি লক্ষ্য কর, উহার মধ্যে তোমার স্বামী নব-জীবন পাইয়াছেন। এই নূতন জীবনকে বরণ করিবার পূর্ণ সমারোহ আরম্ভ হউক্। তোমার এই অনুচিত হৃদয়াবেগ আমি সমর্থন করিতে পারি না। যিনি পরম নিত্য, যিনি শ্রেষ্ঠ চেতনা, যাঁহাকে জানিলে মৃত্যুরূপী অজ্ঞান দূর হয়, যিনি পরম জ্যোতির্ময়, তাঁহার জ্যোতিঃপ্রসাদ লাভ করিতে হইবে, তবেই তোমার সমস্ত মোহ-অন্ধকার দূরে পলায়ন করিবে। সম্মুখে তোমার মহান্ কর্তব্য, আর বিগত সুখের জন্য উদ্‌বিগ্ন হইবার সময় নাই। এখন অভ্যুত্থানের শুভলগ্ন আসিয়াছে, তুমি কি জড়বুদ্ধির বশে গিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিবে?"

ভবশঙ্করীর আকস্মিক আবেগ-বিহ্বলতা তখন শান্ত হইয়াছে, তিনি অপ্রতিভ হইয়া নতমুখে বলিলেন : "গুরুদেব, জীবনে এমন কয়েকটি মুহূর্ত আসিয়া পড়ে—যখন মানুষ অতিরিক্ত ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া যায়, তাহা আমাদের মত মায়াবন্ধনে বদ্ধ জীবের পক্ষে রোধ করা সম্ভবপর নহে। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন-মনা, সুখে বিগতস্পৃহ, অনুরাগ-ভয়-ক্রোধ-বর্জিতা এরূপ যতিনী আমি এখনও হইতে পারি নাই। পতি-চিন্তা, পতির নির্মল-সুন্দর স্মৃতিই আমাকে আজিও সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাই আমাকে সর্বকর্মে শক্তিদান করে। আর ইহাও স্বাভাবিক, আমার বীরপতির স্বহস্তে নবগঠিত রাজ্যের বিজয়-গৌরব ও প্রশংসার দিনে তাঁহার অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হইয়া থাকে। এই দুর্বলতা সকল নারী-চিত্তকেই অধিকার করে, আকুল করিয়া তোলে।"

হরিদেব কহিলেন : "কিন্তু সাধারণরমণীর মত চিত্ত-দুর্বলতায় অভিভূত হওয়া তোমার যোগ্য নহে, ইহার ফলে কর্তব্য-হানির আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। অবশ্য ক্ষণস্থায়ী চিত্ত-চাঞ্চল্য অমার্জনীয় নহে, প্রিয়পতির বিরহজনিত দুঃখাগ্নি সময়ে সময়ে গাব-কাষ্ঠের ন্যায় মুহূর্তের জন্য জ্বলিয়া উঠিয়া সাধ্বীনারীর অন্তর দগ্ধ করে. ইহা পতিপ্রাণার প্রকৃতিগত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু মা, ইহাও তোমাকে মনে রাখিতে হইবে, স্বামীর অবর্তমানে তাঁহার অননুষ্ঠিত সকল কার্য সফল করিয়া তোলাই তোমার ধর্ম। তোমার নারী-হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ-প্রেম কেবল দেশভক্তি-আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া অখিলশক্তির পদতলে সমর্পিত হউক।"

ভবশঙ্করী শান্তস্বরে কহিলেন: "আমি তো এই কর্মকাণ্ডেই আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছি, প্রভু! কিন্তু এজন্য পুরস্কার আমার অভিপ্রেত নয়, গৌরবসূচক উপাধি-সম্মানেও আমি ভূষিত হইতে চাহি না। আমি শুধু এইটুকুই জ্ঞান করিব—আমার স্বামীর পরিত্যক্ত কর্তব্য পালন করিতেছি মাত্র। পতিকুলের গৌরব-ধারা অক্ষুণ্ণ থাকুক্—ইহা ভিন্ন আমার কোন উৎকাঙ্ক্ষা নাই।"

হরিদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন: "সমস্তই মানিয়া লইতেছি, কিন্তু এস্থলে যাহা প্রত্যক্ষ সত্য—তাহার অসম্মান কে করিবে? তুমি স্বয়ংসিদ্ধা। তুমি আপনার শক্তি-সাধনায় বীর্যবতী, এই বহুবল্লভা বঙ্গভূমির ক্লিষ্ট আকাশে তুমি এক আশ্চর্য অভ্যুদয়। তুমি শরবর্ষণে অন্যায়কে ছিন্ন-ভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহংকারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছ। তুমি বিদেশী শত্রুকে পঙ্গু করিয়া দেশের উপকার করিয়াছ, স্বামীর কর্তব্য সার্থক করিয়াছ, বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছ, জননী জন্মভূমিকে লাঞ্ছনার হাত হইতে রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছ। এই কার্যের যথার্থ মূল্য-দানে দিল্লীশ্বর আকবর মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন। তুমি বঙ্গনারীর যে মহৎ মর্যাদা আনিয়া দিয়াছ, তাহার তুলনা নাই। যুগযুগান্তর তোমার বীরপ্রতিমা বন্দিত হইবে, তোমার বীরত্বব্যঞ্জক নব নামকরণ রায়বাঘিনী লোকমুখে চিরজীবিত থাকিবে।"

ভবশঙ্করী স্থিরকণ্ঠে বলিলেন: "গুরুদেব, নারীর নিভৃত মর্মদেশ বড় কোমল, রাজ্য-ঐশ্বর্য-বিভব-মান-দান—কিছুতেই

তাহার মন উঠে না। আমার যিনি সাক্ষাৎদেবতা—তনু-মন প্রাণের অর্ঘ্য পুরিয়া তাঁহাকে কিছুই দান করিতে পারি নাই, ভাগ্যদেবতা আমাকে সে-সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।"

হরিদেব বলিলেন: "এ তোমার ভ্রান্ত ধারণা। যে অমূল্য নিধির অভাবে তোমার পতির সমস্ত সুখশান্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল, তাঁহাকে সেই পুত্ররত্ন দান করিয়া তাঁহার জীবনে সুখের স্বর্গ সৃষ্টি করিয়াছ। পতির শ্রেষ্ঠ কামনা পূর্ণ করিয়া তুমি ধন্য হইয়াছ। এই পুত্রের উপর সমস্ত মনোযোগ অর্পণ করাই এখন তোমার মুখ্য কর্তব্য। পিতৃকুলের কীর্তিমান্ সন্তান যাহাতে হয়—সেইরূপ শিক্ষা-দীক্ষায় কুমারকে সুযোগ্য করিয়া তুলিবার গুরু দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। উহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু সর্ববিধ বিদ্যায় উহাকে পারদর্শী করিতে হইলে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার প্রয়োজন। কাব্য-সাহিত্য, অন্য ভাষা পাঠান্তে সাঙ্গ-বেদ-উপনিষদ্, কলাবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র, তত্ত্বশাস্ত্র, রাজনীতি, সমাজনীতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, নীতিবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা ও লোকব্যবহারে প্রশস্তজ্ঞান-সম্পন্ন হইতে না পারিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি যদি সচেতন হও, তাহা হইলে উহার বিদ্যার্জনের নিমিত্ত শ্রেয়ঃপন্থা অবলম্বন করাই উচিত।"

ভবশঙ্করী গুরুর উপদেশ-শ্রবণে পরমোৎসাহে বলিলেন: "আমার একান্ত ইচ্ছা—এখন হইতেই প্রতাপের শিক্ষা-দীক্ষার সমূহ ভার আপনি গ্রহণ করুন। প্রতাপ চরিত্রগুণে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে ও বীর্যে কুলপাবন হইয়া উঠুক্, এই মহতী আশা

আমাকে রাজকার্যে নিরলস থাকিতে শক্তি-দান করিবে। আশীর্বাদ করুন—আমি যেমন বীরপত্নী, সেইরূপ বীরজননী হইবার সৌভাগ্য যেন লাভ করিতে পারি।"

গুরু হরিদেব মুক্ত-উদারকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন: "বিশ্বনিয়ন্তা কামভরণ ভুবনেশ্বর এই রায়রাজকুলপ্রদীপ প্রতাপনারায়ণের শিরে তাঁহার আশিস্-ধারা বর্ষণ করুন। এই সর্বসুলক্ষণযুক্ত নন্দন বীর্যে জ্ঞানে সামে দানে ন্যায়-ধর্মে লোকহিতব্রতে প্রকীর্তিত হইয়া সকলের আনন্দ-বর্ধন করুক্, বিদেশে হউক্ মান্য—স্বদেশে হউক্ ধন্য।"

তদনন্তর কিশোর কুমার প্রতাপের বিদ্যানুশীলন সবিশেষ যত্ন-সহকারে পরিচালিত হইতে লাগিল। তীক্ষ্ণধী কুমার ক্রমে ক্রমে এক-একটি বিদ্যা-দ্বার অতিক্রম করিয়া স্বল্পকালের মধ্যে বিবিধ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি-লাভের দ্বারা মেধা ও একাগ্রতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিল। ··· ভবশঙ্করী প্রসন্নচিত্তে গতানুশোচন সম্পূর্ণ বর্জন করিলেন, তাঁহার সম্মুখে কেবল জাগিয়া রহিল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

রাজ্ঞীর জীবনে যেন নূতন প্রাণশক্তির বোধন বসিল, তাঁহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল নবজীবনের বার্তা। গাণ্ডীবীর একাগ্র শর-সাধনার ন্যায় তাঁহার লক্ষ্য স্থির হইল। স্রোতস্বতী ভাগীরথী যেমন আপন পীযূষধারা-দানে উভয়তীর সঞ্জীবিত করিয়া দেশকে শস্যসম্পদে সুসমৃদ্ধ করিয়া তোলে, সেইরূপ রাজ্ঞীর কর্ম-প্রবাহিণী বেগবতী হইয়া নব নব উদ্যমে একনিষ্ঠ গতিতে রাজ্যের সমধিক উৎকর্ষ-বিধানের জন্য আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

প্রথমেই তিনি জনহিতার্থ পূর্তকার্যের সম্প্রসারণে অবহিত হইলেন। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে জলাশয়-খনন, স্থানে স্থানে পথিপার্শ্বে কূপ-খনন, পথ-নির্মাণ, এবং পথের দূরত্ব বিবেচনায় এক যোজন অন্তর পান্থশালা-গঠন প্রভৃতি দ্বারা জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক বহুবিধ কর্তব্য এবং অন্তর্বর্তী ব্যবসায়-কার্য আদান-প্রদান পূর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হইয়া উঠিল, নগর ও গ্রামের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের পথ মুক্ত হইল। ইহার পর রাজ্ঞী দেশ-মধ্যে অন্নময়-ধারা প্রসারিত করিলেন। পল্লীতে পল্লীতে দারিদ্র্য-দীনতা বিদূরিত করিবার মূলগত উপায় কৃষিকার্যকে সমুন্নত ও সুবিস্তৃত করিয়া তিনি বহুসহস্র প্রজার সুদীর্ঘকালের সম্পদ্-প্রাপ্তির ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করিলেন। গ্রামের মণ্ডলগণ আহূত হইল, প্রধান প্রধান কৃষকরা আসিল। রাজ্ঞী তাহাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, দেশ ও দেশবাসীকে জীবনী-শক্তি পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে হইলে বাঁচবার নীতিগুলি অবধারণ পূর্বক দ্রুতবেগে অধিকতর উৎকর্ষ-সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন; পতিত জমির শোধন, অকর্ষিত জমির যথাযোগ্য কর্ষণ, এবং ভূমিতে উর্বরতা বৃদ্ধি—সত্য-পন্থায় সকলের কর্ম-সহযোগে সুসম্পন্ন করিতে পারিলে অন্নলক্ষ্মীর আসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠ হওয়া সম্ভবপর, ভূরিশ্রেষ্ঠ হইবে কমলার অক্ষয় ভাণ্ডার; এই পরম সত্য উপলব্ধি করিলে সকল স্তরের মানুষের সমগ্র জীবনযাত্রা যে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, মহা সিদ্ধি-লাভে যে ধন্য হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের নিকট এই বিষয়টি পরিস্ফুট করিয়া দিতে সুফল

ফলিল। রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ-সাহায্য আসিতে কৃষির উন্নতি দ্রুতগতিতে সার্থকতার দিকে চলিল, এবং অন্নক্ষেত্রের একটি বৃহৎ বাস্তব রূপ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উপরন্তু নব-রূপে ফল ও পুষ্পের উদ্যান-রচনায় সংখ্যা-বৃদ্ধি-দ্বারা যেমন আয়ের পথ সুগম হইল, তেমনি সমস্ত দেশকে শোভা-পূর্ণ করিয়া তুলিল।

রাজ্ঞী দেশের সম্পদ্ উৎপন্ন করিবার শক্তি প্রজাগণের মধ্যে যথাসম্ভব জাগরূক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি করিতে পরামর্শ দিলেন। "জীবনের যাত্রাপথে প্রত্যেক মানুষকে জড় বাধা দূর করিয়া নিজের কার্য-সামর্থ্য প্রকাশ করিতে হইবে"—এই কথাটি তিনি জনে জনে প্রচার করিলেন। একদিকে নানাবিধ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল, অন্যদিকে বিভিন্ন শিল্পকর্মশালায় প্রভূত পরিমাণে বস্তু-নির্মাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। কারুশিল্প, দারুশিল্প, তক্ষণশিল্প, ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপযোগী নিত্যব্যবহার্য পদার্থ-উৎপাদন সমধিক প্রসার-লাভ করিল। বিশেষতঃ, বস্ত্র-শিল্পের উৎকৃষ্ট উৎপাদনের জন্য ভুরস্থুট পূর্ব হইতেই বিখ্যাত ছিল, পুনরায় ক্ষৌম ও কার্পাসিক বস্ত্রের উৎপাদন অনেকগুণে বর্ধিত হইল এবং কার্পাস-বস্ত্রের প্রকৃষ্টতা সর্বদেশে উৎকীর্তিত হইল। এই প্রকার উৎপাদনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য দেশের ভাণ্ডারে ধন-বৃদ্ধির উপায়-রূপে অত্যন্ত অনুকূল হইয়া উঠিল।

রাজ্ঞী কোন দিকেই লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইলেন না, শুধু যে কর্মের

ধারা ব্যাপক করিয়া তুলিলেন—তাহা নহে, জ্ঞান-শিক্ষা ও ধর্মের ধারা প্রসারিত করার মহৎ উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি গ্রামে ও নগরে অধিষ্ঠিত বিদ্যা-অর্জনের প্রথম সোপান-স্বরূপ সুপরিচালিত সর্বজনসুলভ পাঠশালার সংখ্যা-বৃদ্ধি করিতে নির্দেশ দিলেন। তিন-চারিটি গ্রাম জুড়িয়া সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আচার্যগণের অধ্যাপনায় আরও অধিকসংখ্যক চতুষ্পাঠী বা টোল প্রবর্তিত হইল। জ্ঞানীর জ্ঞান-ভাণ্ডার সকল স্থানের বিদ্যার্থীর পক্ষে অবারিতভাবে উন্মুক্ত হইয়া বিদ্যা-আহরণের বহুতর সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিল। এতদ্ভিন্ন জনসাধারণের শিক্ষা-বিস্তারের নিমিত্ত বহুস্থানে পাঠমণ্ডপ স্থাপিত হইল, বৃত্তিভোগী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতসকল পুরাণ ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা নীতি-জ্ঞান দান করিবার ব্রত গ্রহণ করিলেন। সমাজধর্ম, পরস্পর মৈত্রী-বন্ধন, ত্যাগ ও সেবাধর্মের আবহমান আদর্শের বিশুদ্ধ ভাব-ধারা সকলের মনে সঞ্চারিত করিবার পন্থা অধিকতর সুষ্ঠু সুন্দর প্রণালীতে প্রস্তুত হইল। এইভাবে সর্বাঙ্গীন প্রাণশক্তি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। রাজ্ঞীর ব্যাপক ব্যবস্থার আনুকূল্য সকল প্রজাকে সর্বপ্রকারে মানুষ নামের যোগ্য করিয়া রাখিবার প্রয়াস চলিল। রাজ্ঞীর প্রচেষ্টায় খানাকুল কৃষ্ণনগর-আদি প্রধান কেন্দ্রস্থলে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তন সুসংস্কৃত- ও সমুন্নত-রূপে বিরাজ করিয়া প্রখ্যাত শিক্ষামন্দিরে পরিণত হইল।

এইরূপে রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর কর্মরথ অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া চলিল। তিনি স্বার্থের অধিকারকে পদদলিত করিয়া

সর্বজনের কল্যাণকেই অনেক উচ্চে স্থান দিলেন। দেশের দারিদ্র্য যাহাতে উন্নতির পথ বাধাগ্রস্ত না করে, সে-বিষয়ে তিনি সচেতন রহিলেন, সেইজন্য দেশকে সমৃদ্ধতর করিবার প্রচেষ্টায় কোন স্থান শূন্য রাখেন নাই। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, ইহা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি দেশরক্ষা ও শান্তিরক্ষার সুব্যবস্থা করিলেন; সৈন্যবল অস্ত্রবল এবং নৌবল বহু অর্থ-ব্যয়ে বর্ধিত ও সুদৃঢ় করা হইল। রাজ্ঞী যেন পণ করিলেন—যথাসময়ে তাঁহার কৃতী পুত্রের যোগ্য করে সর্বদিকে সুসমৃদ্ধ রাজ্য তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। তিনি এই অপূর্ব অভিপ্রায় সাধন-কল্পে মাতৃহৃদয়ের কামনার দুর্নিবার প্রবাহে উল্লসিত আগ্রহে ভাসিয়া চলিলেন, তাঁহার উদ্যমের অন্ত রহিল না। সুগঠিত নগর দেশের শক্তির উৎস-রূপে এবং গ্রাম প্রাণের উৎস-রূপে আপন আপন শোভা-সম্পদে অবস্থান করিতে লাগিল। দিকে-দিগন্তে রায়বাঘিনী লোকেশ্বরী ভবশঙ্করীর গৌরব-গাথা গৃহ-প্রাঙ্গণ হইতে আকাশ-বাতাস পর্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। দেশ-মধ্যে আনন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হইয়া জনচিত্তকে অভূতপূর্ব ভাবের প্লাবনে অভিষিক্ত করিল…যেন অন্নপূর্ণারূপিণী দেবী কর্মযোগে অমরাপুরী হইতে অমৃত আহরণ-পূর্বক দেশ-মাতৃকাকে নবজীবন-যৌবন-রসে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর সকল বাসনার অন্তরালে নিভৃততম মানসলোকের ধ্যান-প্রার্থিত একটি বাসনা তখনও অপূর্ণ ছিল।

যখন তাঁহার নব পরিকল্পনায় জ্ঞান ও কর্মের রথ সার্থকতার তীর্থ অভিমুখে ধাবমান হইতেছে, যখন তিনি প্রসন্নচিত্তে দেখিলেন—রাজ্যের অতি কর্মকুশল বিচক্ষণ মহাপাত্র পাঁড়ুয়া-গড়াধিপ আত্মীয় ভূপতিকৃষ্ণ তাঁহার সর্বকার্যে সহায় হইয়া দেশোন্নতির পরিচালন-ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছেন, তখন তাঁহার অন্তর্নিহিত বাসনা সিদ্ধ করিবার অবকাশ পাইলেন। তিনি গুরু হরিদেবের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আন্তরিক অভিলাষের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন: "আমার ইহকাল ও পরকালের ইষ্টদেবতা যিনি, সেই উপাস্য পতির নামধর শিবের মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সংকল্প বহুদিন হইতে আমার মনে জাগিয়া রহিয়াছে। এই ইষ্টসিদ্ধি আমাকে পরমার্থ আনিয়া দিবে। আপনি ইহার ব্যবস্থা-দান করুন।"

হরিদেব ভবশঙ্করীর আগ্রহাতিশয় লক্ষ্য করিয়া প্রীত মনে কহিলেন: "পুণ্যশ্লোকা, দেবতার পুণ্যকার্য স্বয়ং শ্রীভগবানই সম্পূর্ণ করিবেন। তুমি মহেশ্বরকে তোমার কামনা নিবেদন করিয়া প্রার্থনা জানাও—'সর্বান্তরাত্মা ভগবান্ শর্ব্বঃ সর্বপ্রদো ভবান্'! তাঁহার কৃপায় তুমি অচিরেই অভীষ্ট-লাভ করিবে। তিনি 'নানারূপেষ্বেকরূপস্বরূপঃ'। শিবশঙ্করের কোন্ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতে তোমার আকাঙ্ক্ষা?"

ভবশঙ্করী বলিলেন: "আমার ইচ্ছা—হিন্দুযুগে প্রবর্তিত ভাস্কর্যের গৌড়ীয়রীতিতে আমার স্বামীর নামানুসারে রুদ্রেশ্বর শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হউক্, এবং প্রাচীন 'রেখদেউল'-আদর্শে কারুকার্য-ভূষিত এই শিবমন্দির নির্মিত হউক্। এখন আপনি

যথাবিহিত মূর্তি-পরিকল্পনার নির্দেশ-দান করিলে, আমি এই অভীপ্সিত ধর্মানুষ্ঠানে ব্রতী হইতে পারি।"

হরিদেব কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন : "মা, পরব্রহ্মের ধ্যান-রূপ আমার মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।—

(ওঁ) একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সমস্তং
সত্যং সত্যং নেহ নানাঽস্তি কিঞ্চিৎ।
একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে
তস্মাদেকং ত্বাং প্রপদ্যে মহেশম্॥

—তোমার ইচ্ছানুরূপ মূর্তি স্থাপিত হউক্—তাহাতে কোন বাধা নাই। 'রুদ্রেশ্বরশিব' নামের সার্থকতা সম্পাদন করা কর্তব্য, কিন্তু সৌম্য ভাব-ব্যঞ্জক শিবপ্রতিমা-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মঙ্গলকর হইবে! অষ্টদলপদ্মলীন চরণযুগ, ত্রিশূল-ডমরু-পাণি ঈষৎভঙ্গিম-ঠাম, ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিত, দিব্যফণিউপবীত, ধ্যানসুন্দর আনন, ত্রিনেত্র, কিশোরচন্দ্রশোভিত জটামৌলি-দীধিতিপরিমণ্ডলিতশির, বিচিত্র কারুকার্য-অলঙ্কৃত দেবাসন, এবং শীর্ষোপরি স্ফটিকের অপরূপ সদাশিব-লিঙ্গ। এই মূর্তি স্থাপন কর, রুদ্রেশ্বর জাগরিত হউন্ তোমার অনুধ্যানে-জ্ঞানে-কর্মে-ভক্তিতে।

(ওঁ) আপাতাল-নভস্তলান্তভুবন-ব্রহ্মাণ্ডমাবিঃ-স্ফুর-
জ্জ্যোতিঃ স্ফাটিকলিঙ্গমৌলিবিলসৎ-পূর্ণেন্দুবান্তামৃতৈঃ।

—এই ধ্যান-মূর্তির সহিত সঙ্গতি-রক্ষা করিয়া প্রভামালী রুদ্রেশ্বরশিব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাপন বিধিসম্মত, তাহা হইলে তোমার নিষ্ঠা-পূত ভাবনা সিদ্ধরূপে লীলায়িত হইয়া প্রকাশমান্ হইবেন অভিনব ভাবতনুতে অন্তরদেবতা।"

স্ফাটিক লিঙ্গজ্যোতিঃ

শ্রীশ্রীরুদ্রেশ্বর শিব (রাজ্ঞী ভবশঙ্করী-প্রতিষ্ঠিত)

[রায়বাঘিনী : পৃঃ ৩৮৯]

এই অপরূপ মনোহর মূর্তি-নির্ধারণ রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর মনঃপূত হইল। তিনি সংকল্পিত পবিত্র দেউল প্রতিষ্ঠা-কার্যে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিলেন। সুনিপুণ স্থপতি ও কারুগণকে সন্ধান করিয়া আনা হইল। শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত-দিনে মন্দিরের প্রথম ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন পুণ্যকীর্তি গুরু হরিদেব। অনন্তর সুদক্ষ ভাস্কর আসিয়া গৌড়ীয়ারীতিতে আদর্শ-কল্পনায় বৈচিত্র্য-সাধনে শিলা উৎকীর্ণ করিয়া অরূপ দেবতার সার্থক রূপায়ণে মগ্ন রহিলেন। কিছুকালের মধ্যে কারুকার্য-সমলঙ্কৃত মন্দির-নির্মাণ নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল। ভাস্কর চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে উত্তোলিত বেদীশিলাতলে উর্ধ্বদেশে স্ফাটিক-লিঙ্গজ্যোতিঃ-রুদ্রেশ্বরশিব-মূর্তি স্থাপিত করিয়া সুচারুরূপে একে একে সূক্ষ্মকার্যগুলির পূর্ণতা আনিয়া দিলেন।

দেবী ভবশঙ্করীর পতি-বিরহিত জীবনের যাহা মুখ্যকল্প ছিল, শুভলগ্নে বহুবাঞ্ছিত সেই অপরূপ স্ফাটিক-লিঙ্গজ্যোতিঃ-শীর্ষ রুদ্রেশ্বরশিব-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া—তাহা সিদ্ধ করিলেন, তাঁহার পরমানন্দের স্বর্গ যেন ভূতলে নামিয়া আসিল। এই কাম্যসুন্দর শিববিগ্রহ তাঁহার নারীহৃদয়ের পতিবিচ্ছেদ-বেদনা ভুলাইয়া দিল, স্বামীর প্রতি সুচিরসঞ্চিত প্রেম ও ভক্তি রুদ্রেশ্বরের পাদমূলে নিঃশেষে নিবেদিত হইল। তাঁহার অনুভবে জাগিল—যেন পুনরায় তিনি পতি-সান্নিধ্য লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন।...প্রথম পূজার দিন তিনি একাকিনী পরমদেবতার সম্মুখে নতজানু হইয়া অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—যেন কতকালের অদর্শন-ক্ষুধার শান্তি হইল। তাঁহার বদনমণ্ডল

হাস্য বিমল হইয়া উঠিল, নয়নে বহিল অশ্রান্ত ধারা। তাঁহার চোখের 'পরে বিদ্যুৎচমকের ন্যায় প্রকাশিত হইল স্বামীর প্রেমময় মূর্তি, কানে কানে যেন স্বামীর পুনরাগমন-বার্তা ধ্বনি তুলিল। তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে পুলক-শিহরণ খেলিয়া গেল। কর্মজগৎ ও চিদানন্দলোক মিলিত হইয়া রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর জীবনে যেন এক অজ্ঞাতপূর্ব নবমধুর দর্শনের প্রবর্তন করিল। *

কিন্তু রাজ্ঞী ইহাতেই আত্মলোপ করিয়া দিলেন না। তখন মুঘল-অধিকারে বঙ্গদেশের অবস্থান্তর ঘটিতেছিল, বিদেশী ফিরিঙ্গীরা বাণিজ্য করিতে আসিয়া নদীতীরবর্তী স্থানে আপনাদের ক্ষমতা-বিস্তার ও স্থায়ী করিবার অভিসন্ধিতে পরস্বাপহরণে ও অবৈধ আচরণে মাতিয়া উঠিতেছিল। এই সকল ব্যাপারে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখিলেন। রাজ্যের প্রাণ-

* রাণী রায়বাঘিনী কর্তৃক যে "রুদ্রেশ্বরশিব"-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কীর্তির সাক্ষ্য বিশ্রুতিতে বা অধস্তন পুরুষের দানপত্রে নেপথ্যবাস করিলেও—কোন নিদর্শন আজিকে বর্তমান নাই। কয়েক বৎসর পূর্বে দৈবক্রমে পুণ্যকর্মা নৃত্যগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (হুগলী জেলার অন্তর্গত জয়রামপুর গ্রামে বাস্তভিটা) পূর্বপুরুষ-সংগৃহীত কতিপয় ধর্মগ্রন্থ ও পুরাতন পাঁজি-পুঁথির সহিত জীর্ণ তুলট-কাগজে পটুয়ার অঙ্কিত কয়েকটি দেব-দেবীর রেখাচিত্র পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে রুদ্রেশ্বরশিবের মূর্তিটিও ছিল। উল্লিখিত ছিল—রায় মহারাণীমাতা ভবঠাকুরাণী প্রদত্ত শ্রীশ্রী৺রুদ্রেশ্বর শিব (লিঙ্গচূড় দেবদেব)। রেখাচিত্রটি স্থানে স্থানে অস্পষ্ট ও কীটদষ্ট হওয়াতে, সেটিকে সংস্কার করিয়া প্রাচীন চিত্রানুসরণে পুনরঙ্কন দ্বারা তাহার আভাস দিবার চেষ্টা হইয়াছে মাত্র।

মণ্ডলটিকে তিনি এরূপ সমৃদ্ধিশালী ও সুরক্ষিত করিলেন যে, তাহা প্রবল শত্রুর পক্ষেও দুরাক্রম হইয়া উঠিল। তাঁহার সর্ববিষয়ে অনন্যতন্ত্র-প্রকৃতির চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া রাজ্যের আপামরসাধারণ শ্রদ্ধায় ও পরমবিশ্বাসে তৎপ্রতি মস্তক অবনত করিল। যশস্বিনী রাজ্ঞী ছিলেন উগ্রস্বভাবা, রাজধর্ম-পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী, রণনিপুণা, জিতেন্দ্রিয়া, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না, ধর্মপরায়ণা, করুণাময়ী, বিদুষী ও দূরদর্শিনী। এই অনন্যসুলভ গুণ ও শক্তির আধারভূতা রমণীশিরোমণিকে গুরু হরিদেব পর্যন্ত সসম্মান প্রীতি-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। তাঁহার বদান্যতারও ইয়ত্তা ছিল না। তিনি দীন-দরিদ্রের সাক্ষাৎমাতৃ-স্বরূপিণী ছিলেন...কোন শরণ-ভিখারী বিমুখ হইত না, কোন প্রার্থীই তাঁহার অনুগ্রহ-বঞ্চিত হইয়া রিক্তহস্তে ফিরিত না। অনাথা নারীগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি নিয়মিত ব্যবস্থা করেন এবং দরিদ্র-কন্যার বিবাহ-ব্যাপারেও তাঁহার ভাণ্ডার মুক্ত ছিল। কিন্তু তিনি সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ও জাত্যভিমানকে কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া জ্ঞান করিতেন, এই কারণে সমাজ-সংস্কারে তাঁহার চেষ্টার অভাব ঘটে নাই।

দেবী ভবশঙ্করী নানা ভাবে নানা পরিকল্পনায় স্বদেশকে এমন এক বিশ্বকল্যাণের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সংকল্প-গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের রাজত্ব-কালে সোনার ফসলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।... কিয়ৎকাল গত হইল। কুমার প্রতাপনারায়ণ যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি কৃতবিদ্য ধীগুণ-সম্পন্ন হইয়া জননীর আনন্দ-বর্ধন

করিতেছেন। ভবশঙ্করী প্রাণপ্রিয় পুত্রের হস্তে রাজ্যভার তুলিয়া দিতে ব্যগ্র হইলেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি প্রতাপকে মুহূর্ত-অবকাশ দিলেন না। প্রথমেই আরম্ভ হইল কুমারের বীর্য ও সাহসের দীক্ষা। রাজা ভূপতিকৃষ্ণের অধীনে তাঁহার উপর সৈন্য-পরিদর্শনের কর্তব্য ন্যস্ত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই কুমার সেই কার্যে অসামান্যতা প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর জননীর নির্দেশ-মত রাজ্য-ব্যাপারে জ্ঞান-বৃদ্ধির জন্য ঋষিকল্প সর্বশাস্ত্রজ্ঞ গুরুদেব, বিচক্ষণ পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ্ ও মহাপাত্রের সহিত প্রতিনিয়ত রাজধর্মের আলোচনায় প্রতাপকে উপস্থিত থাকিতে হইল। কালক্রমে প্রতাপ মাতার ন্যায় রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও লোকব্যবহারে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। রূপে ও গুণে প্রতাপনারায়ণ মাতা ও পিতার মূর্তিমান্ তপস্যা-কীর্তি-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

এতকাল পরে রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর বহুপ্রতীক্ষিত শুভক্ষণ সমাগত হইল। তিনি সাধনলব্ধ কুলপাবন তনয়ের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিবার আশায় আগ্রহান্বিত হইলেন। ইহসংসারে দেহধারী মানবের নিকট স্নেহ-প্রেমের বন্ধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধন আর নাই, ইহার এমনি শক্তি যে—মানুষের চিত্তকে শান্ত সংযত করে, এই প্রেমের উৎস বহুমুখী হইয়া জীবনের নানাক্ষেত্র পরিপ্লুত করিয়া দেয়। এইরূপ বিবেচনায় ভবশঙ্করী উপযুক্ত পুত্রের জন্য এক যোগ্যতমা জীবনসঙ্গিনী বরণ করিয়া আনিয়া চিরপরিচয়ের প্রাণলক্ষ্মীর শূন্য আসনটি পূর্ণ করিতে মনস্থ

করিলেন। নানা স্থানে অভিলষিত গুণাভরণা মনোজ্ঞা পাত্রীর অন্বেষণ চলিল। অবশেষে গুরুপুত্র রাঘবদেব দুর্গোৎসব-উপলক্ষে দীর্ঘবাটী গ্রামে গমন করিয়া দৈবযোগে এক সুলক্ষণা সুদর্শনা কন্যার দর্শন পাইলেন। কন্যাটি অচিরোদ্ভিন্নযৌবনা কুমারী, তাহার তনিম-তনুটিতে সদ্যপ্রস্ফুট-কমলিনীর ন্যায় পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের সমারোহ। রাঘবদেব কন্যার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিলেন যে, একমাত্র দুহিতার জন্য অনুরূপ কুলসম্পন্ন গুণবান্ রূপবান্ পাত্রের সন্ধান মিলে নাই, এবং সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত তাহা সম্ভবপর নহে, এই সমস্ত কারণে কন্যার কুমারী-বয়স সামাজিক প্রথা-মতে কিঞ্চিৎ অতিক্রম করিয়াছে; পরিণয়বন্ধন দেবতার কার্য, তাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টি যতদিন না পতিত হয়—ততদিন পর্যন্ত যোগ্য পতি-লাভের জন্য কন্যাকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। কেবল কুলাচারকে মান্য করিয়া অযোগ্যের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান-করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে।

কুলমর্যাদায় কন্যার পিতা রায়রাজবংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—তাহা বুঝিলেও রাঘবদেব কুমার প্রতাপনারায়ণের গুণাবলী কীর্তন করিয়া বিবাহের যুক্তি দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হইলেন না। কন্যার পিতা ছিলেন প্রখ্যাত বন্দ্যবংশচূড়া সম্পন্ন-গৃহস্থ, অশেষজ্ঞ পণ্ডিত অত্যুন্নতস্বভাব উদারহৃদয় এবং ধী-প্রদীপ্ত ব্রাহ্মণ্যশ্রীতে উজ্জ্বল, তাঁহার মন ছিল সংস্কার-মুক্ত স্বচ্ছ। তথাপি তিনি কুলগৌরবের মমতা সহসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি সেই অচিন্তিত অথচ লোভনীয় প্রস্তাব কুলগর্বে

প্রত্যাখ্যান করিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিলেন না, বরঞ্চ তিনি সম্মত হইয়া উত্থাপিত বিষয়-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিলেন।

গুরুপুত্র রাঘবদেব গড়ভবানীপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত রাজ্ঞীর গোচরে আনিলেন। পুত্রের বিবাহের জন্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্রীর সংবাদ পাইয়া রাজ্ঞী অত্যন্ত উৎফুল্ল হইলেন, কন্যাপক্ষের কৌলিক নিষ্ঠার প্রশ্ন তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিল না। তিনি গুরুদেবের সহিত পরামর্শ করিয়া দীর্ঘবটীতে কন্যার পিতার নিকট পুনরপি বিবাহ-প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহার অনুরোধে গুরুদেব একটি পত্র লিখিলেন: "ইহা সর্বজনবিদিত যে, ভরদ্বাজগোত্রীয় কীর্তিশালী রায়বংশাবতংস কুমার প্রতাপনারায়ণের কুলশীল সমুন্নত। কুমার কুললক্ষণে আদর্শ-রূপে বহু কুলীন-পুত্রের অনুকরণ-যোগ্য। গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয়ের কুলকন্যা-গ্রহণ যদি কুলীন-পুত্রগণের নিকট গৌরব-জনক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজ সন্তানের সহিত কুলীন-কন্যার পাণি-যুক্ত করিতে বাধা লাগিবে কোন্ শাস্ত্রীয় বিচারে! কৌলিন্য-প্রথা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি-প্রবর্তিত চিরন্তন সত্য নহে, ইহা প্রভাবশালী ব্যক্তি-বিশেষের প্রচলিত সামাজিক সংস্কার-মাত্র। একদা (পঞ্চদশ শতাব্দীতে) কুলাচার্যগণের শীর্ষস্থানীয় দেবীবর আচার- ও সংসর্গ-দোষদুষ্ট কুলীন-বংশধর-দিগকে উন্নীত করিবার নিমিত্ত তৎকালে যে সাময়িক হিতকর সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত করেন, তাহা স্থায়িত্ব লাভ করিয়া আজিকে অন্ধসংস্কাররূপে সমাজের বক্ষে প্রেত-নৃত্য আরম্ভ

করিয়াছে, ইহার নাগপাশ হইতে মুক্তি ভিন্ন ভবিষ্যৎ হিন্দু-সমাজের কল্যাণ নাই। অতএব আমার নিবেদন—কুলগর্ব মধ্যে আসিয়া যোগ্যের সহিত যোগ্যার শুভমিলনে বাধাস্বরূপ হইয়া না দাঁড়ায়।…কুলপুরোহিত এই দৌত্যকার্যে প্রেরিত হইলেন।"

এদিকে সরলোন্নত ব্রাহ্মণশিরোমণি প্রাণোপমা কন্যার সহিত কুমার প্রতাপের বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়া অবধি মহাসমস্যায় পড়িলেন। একদিন তিনি প্রতাপের রজতগিরিনিভ গৌর-সুন্দর সুবলিত বপুখানি দেখিয়া মুগ্ধ অন্তঃকরণে কন্যার জন্য ঐরূপ পতি-কামনা করিয়াছিলেন। সেই নয়নবিমোহন মূর্তিটি তাঁহার মানসনেত্রে বারংবার জ্যোতির্ময়-রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; শুধু তাহাই নহে, প্রতাপ-জননী রাজ্ঞী ভবশঙ্করীর লোক-হিতৈষণা ও পুণ্য মাহাত্ম্য অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে তাঁহার হৃদয়কে এমনি বিনম্র করিয়া দিল যে, ইহার তুলনায় তাঁহার মনে কুলাভিমান ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রশ্নের গুরুত্ব-বোধ আর তেমন রহিল না। তিনি যথার্থ শাস্ত্র-বিধি অনুসারে কর্তব্য নিরূপণ করিতে অগ্রসর হইলেন। এইরূপ যখন তাঁহার মানসিক অব[illegible], ঠিক সেই মুহূর্তে রাজ্ঞী-প্রেরিত পুনঃ বিবাহ-প্রস্তাব এবং অশেষশাস্ত্রপারংগম কুশাগ্রধী রাজকুলগুরু হরিদেব ভট্টাচার্যের যুক্তি-পূর্ণ পত্র লইয়া রাজ-পুরোহিত দর্শন দিলেন। অনন্তর সেই বন্দ্যবংশখ্যাত দ্বিজোত্তমের সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এক নিমেষে চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি সর্বান্তঃকরণে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তাঁহার [illegible] হইল—যে-কুমার রূপে-গুণে অদ্বিতীয়, যিনি

সৌভাগিনেয়, সেই সুপাত্রের সহিত তাঁহার পরমনিষ্ঠাবতী বিদুষী রূপলাবণ্যবতী দুহিতার মিলন সর্বমঙ্গলময়ের ইচ্ছা। জ্যোতিষগণনায় উভয়ের মিলন রাজযোটক হওয়াতে ব্রাহ্মণের অন্তর আনন্দোচ্ছল হইয়া উঠিল।

অতঃপর সাড়ম্বরে শুভমাসে সুতহিবুকযোগে কুমার প্রতাপনারায়ণের বিবাহ সুসম্পন্ন হইল। ভবশঙ্করী নব-দম্পতীকে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রাণ ভরিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখিয়াও তাঁহার নয়ন তৃপ্ত হইতে চাহিল না। জ্যোতিঃপুঞ্জতনু নন্দনের বামে জ্যোতিঃশিখা-সমা প্রাণসার সুতনু নন্দিনী তাঁহার সংসার পূর্ণ করিয়া তুলিল। 'বিধাতার কি অপূর্ব যোগাযোগ'—এই কথাটি যেন নব-রাগে তাঁহার চিত্তবীণার তারে অনিবার ঝঙ্কার তুলিতে লাগিল।

সেই বিবাহে উভয়পক্ষই লাভবান্ হইলেন। বিশাল ব্রহ্মত্র-লাভে কন্যার পিতৃদেবের ধন-সম্পত্তি, পদমর্যাদা ও পূজার্চনা সবিশেষ বর্ধিত হইল, এবং রাজ্ঞী লাভ করিলেন পতিগৃহ-উজ্জ্বলকারিণী অমি[illegible]লাবণ্যময়ী লক্ষ্মীস্বরূপা বধূ-রত্ন।

মহেন্দ্রের পার্শ্বে যেমন মহেন্দ্রাণী, তেমনি যুবরাজ প্রতাপনারায়ণের পার্শ্বে যুবরাজ-মহিষী মহেন্দ্রাণী শোভা পাইতে লাগিলেন। মিলনের প্রথম অভ্যুদয়ে বর-বধূ পরস্পর পরস্পরকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন প্রীতির উষারুণরাগদীপ্ত উভয়ের তারুণ্যের নবজীবন-প্রভাতে, উভয়েরই মন বলিল— 'বিধাতার সযত্নরচিত তনুরুচির বরমাল্য লইয়া আমাকে বরণ

করিলেন'। বধূর নিত্যনবোন্মেষশালিনী সেবায় শুধু স্বামীই মুগ্ধ হইলেন না, শ্বশ্রূমাতাও বধূর ভক্তি-ভালবাসার প্রতিভা লক্ষ্য করিয়া বিমোহিত হইলেন।

রাজ্ঞী ভবশঙ্করী বধূ মহেন্দ্রাণীকে সর্ববিষয়ে শিক্ষা- ও উপদেশ-দানে প্রতাপনারায়ণের আদর্শ সহধর্মিণীরূপে যোগ্যতমা করিয়া তুলিতে মনোনিবেশ করিলেন। শিক্ষা-গুণে মহেন্দ্রাণী রাজ-পরিবারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে লাগিলেন এবং কালক্রমে তিনি এরূপ শিক্ষিতা হইয়া উঠিলেন—যেন ভবশঙ্করীর সম্ভাবিত নবরূপান্তর।

দুই বৎসর কাল অতীত হইবার পর রাজ্ঞী মহাসমারোহে প্রতাপনারায়ণকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন *। তখন জহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ্। রাজ্ঞী পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু নিয়ত তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া নানা পরামর্শ ও নির্দেশ দিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিস্মৃত হইলেন না। স্বল্পকালের মধ্যে রাজ্য-পালনে পুত্রের অপরিসীম যোগ্যতার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া ভবশঙ্করী চমৎকৃত হইলেন। তখন তিনি রাজকার্য হইতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করিলেন, এবং পুনরায় ব্রহ্মচর্য-অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনায় তাঁহার মন-প্রাণ সমর্পিত হইল।

রাজমাতা ভবশঙ্করীর স্বরচিত আনন্দের সংসার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এক পরমসুন্দর পৌত্রের আগমনে। তাঁহার বোধ হইল—তাঁহার আনন্দলোকে যেন আনন্দঘন-মূর্তি

* প্রতাপনারায়ণের অভিষেক-প্রসঙ্গ পরপর্বাধ্যায়ে বর্ণিত

শিশুনারায়ণ-রূপে দর্শন দিয়াছেন। তিনি সর্বসুলক্ষণযুক্ত পৌত্রের নাম রাখিলেন নরনারায়ণ।

কিছুকাল আনন্দ-উৎসবে ধর্মে-কর্মে অতিবাহিত করিয়া দেবী ভবশঙ্করী জীবনের শেষ-অঙ্কে পুণ্য কাশীধামে গমন করিতে ইচ্ছা-প্রকাশ করেন। তাঁহার এই পবিত্র সংকল্পে কোন বাধা জাগিল না। রাজমাতা মহারাণী ভবশঙ্করী বহুকাল কাশীবাস করিয়া শান্তিময় ধর্ম-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এক শুভ মুহূর্তে সেই পবিত্র বিশ্বেশ্বরপুরীর মহাবায়ুতে তাঁহার অন্তিম নিঃশ্বাস শিবার্চনা-কালে মিলিত হইল। মহামহিমময়ী পুণ্যময়ী নারীকুল-শ্রেয়সী অমরধামে মহাপ্রস্থান করিলেন।

উত্তর
রাজ-চরিত

রুদ্রনারায়ণ ও ভবশঙ্করীর বরপুত্র কুলতিলক যুবরাজ প্রতাপনারায়ণের রাজ্যাভিষেক।

রাজ্ঞী ভবশঙ্করী পুত্রের অভিষেক-অনুষ্ঠানে যথারীতি নিয়ম-পালনের মানস করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ উৎসব। অভিষেকের পূর্বদিনে শুভক্ষণে নবীন রাজা ও রাণীর দীক্ষা-যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল। পুণ্য অভিষেক-দিবসে অরুণোদয় যেন নূতন রাগিণীতে সকলের অন্তরে পৌঁছাইয়া দিল প্রকৃতি-বর্গের মধ্যে যুবরাজের বিরাট্ বিকাশ প্রত্যক্ষ করিবার সংবাদ। বালার্কের অরুণিম রাগে পূর্বাশা রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের নবীন লোকপালের পূর্ণশক্তির উদ্‌বোধন-অনুষ্ঠানে পরম গৌরব-লাভের মাহেন্দ্রক্ষণ আসিয়াছে, সেইজন্য আজিকে প্রজা-গণের মহামহোৎসব। বহুজনের মঙ্গল-সাধন-লক্ষিত রাজশক্তির এই মহিমময় প্রকাশ অদ্যকার উৎসবকে যেন মূর্তিমান্ করিয়া তুলিয়াছে, আনন্দ-সঙ্গীতে বর্ণ-বিন্যাসে রস-উপচারে তাহার অভিব্যঞ্জনা। উৎসবের উদ্দাম উল্লাস গিরি-প্রস্রবণের ন্যায় উদ্‌বেলিত হইয়া সহস্রধারে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিল।

রাজধানীর কি সাড়ম্বর উৎসব-সজ্জা! নবনির্মিত প্রশস্ত রাজপথ অপরূপ শোভা-সম্পন্ন হইয়া আনন্দ-যজ্ঞে যেন আমন্ত্রণ জানাইতেছে। সমস্ত পথ সুগন্ধ আবীর, চন্দনচূর্ণ ও ছিন্ন-কুসুমদলে সুরভিত। পথের উভয় পার্শ্বে পুষ্পমাল্য-প্রলম্বিত

বেণুস্তম্ভ, উর্ধ্বভাগে বেণুফুল-মালা বংশদণ্ডে দোদুল্যমান। পথের মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ, তদুপরি চারিদিকে বিস্তৃত দিক্‌মালা পবন-সঞ্চারে আন্দোলিত এবং দিক্‌মালার অন্তরে অন্তরে সমীর-প্রবাহে কিঙ্কিণীমালার চঞ্চল নূপুরগুলি মধুর ধ্বনিতে রণরণিত। স্থানে স্থানে সুবৃহৎ ধ্বজা সুশোভিত, তাহার উপরিভাগে সশব্দে উড্ডীয়মান নানাগঠন-বর্ণ-বিচিত্র পতাকামালা। পথের দুই প্রান্তে চিত্রবিচিত্র বংশ-স্তম্ভ-মূলে সিন্দূর-চন্দন-হরিদ্রা-রেখাঙ্কিত পূর্ণকুম্ভ ও কদলীতরু। এই সুসজ্জিত রাজপথ অভিষেকোৎসব-মণ্ডপে গিয়া মিলিত হইয়াছে।...ভবন-শিখরে-শিখরে রাজপতাকা পবন-হিল্লোলে আনন্দভরে উড়িতেছে। রাজনগরের দ্বারে দ্বারে মঙ্গলকলস, গৃহে গৃহে পুরনারীগণের হুলু- ও শঙ্খ-ধ্বনি এবং পুষ্পমাল্যে সুবাসিত পথে পথে প্রজাবৃন্দের উল্লাস-কলনাদ। পৌরজন ও পুরাঙ্গনাগণ সুরঞ্জিত বসনে-ভূষণে সজ্জিত হইয়া দলে দলে পথে সুগন্ধ পটবাস বিকিরণ করিতে করিতে উৎসব-ক্ষেত্রে চলিয়াছে।

অভিষেকের শুভলগ্ন ঘোষিত হইল শঙ্খের ঐকতানে। অনন্তর অভিষেক-সভায় নবীন রাজ্যেশ্বরকে অভিনন্দন-জ্ঞাপন এবং শ্বেতছত্র-সমন্বিত সিংহাসনে আসন-প্রদানের শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইল। নীলাঞ্জনবর্ণ শিলা-মণ্ডিত ইষ্টকায়তনে নির্মিত বিরাট্‌ সভামণ্ডপ। নবরাজ্যেশ্বর প্রতাপনারায়ণ ও দেবী মহেন্দ্রাণী সোপান-ভঙ্গী অতিক্রম করিয়া সিংহাসন-বেদীতে আরোহণ করিলেন। মহাপাত্র সকল প্রজার পক্ষে রাজার গলদেশে শ্বেত-কুসুমমাল্য অর্পণ করিলেন, এবং বিষ্ণুপুর-রাজকন্যা নারী-

প্রকৃতির হইয়া রাজ্ঞীর কণ্ঠে রক্তকমলের মালা দুলাইয়া দিলেন। উৎসব-তোরণে মঙ্গলবাদ্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রজাগণের কণ্ঠে জয়ধ্বনি এবং পুরস্ত্রীগণের শঙ্খ- ও হুলু-ধ্বনি অভ্র-ভেদ করিয়া নির্নিমেষ জ্যোতিষ্কলোকের দিকে উত্থিত হইল।

গুরুদেব প্রতাপনারায়ণকে মাল্য-শোভিত করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন: "এই 'বৈজয়ন্তী'-মালা তরুণ রাজার কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া শ্রী-বর্ধন করুক্। আমি তোমাকে এই মাল্যে বরণ করিতেছি এই ভবিষ্যৎ ঘোষণা করিয়া যে, রাঢ়বঙ্গ-রাজ্যের রাজচিহ্ন-স্বরূপ পুত্র রাজলক্ষ্মীর হাস্য-রূপে উদ্ভাসিত হউক্…এই রাজলক্ষ্মীর আধার দিলীপ-তুল্য রাজকুলভূষণ প্রতাপনারায়ণ জনবন্ধু প্রজাপালক যশস্বী নৃপতি-রূপে দেশের মুখোজ্জ্বল করুক্। লোকহিতকর কার্য তোমার কীর্তিকে নিত্য আলিঙ্গন-বন্ধনে যেন চির-যৌবন-ধন্য করিয়া তোলে। সুনাম ও সম্পদ্ তোমার আজীবন মিত্র-রূপে স্থিরসঙ্গী হইয়া থাকুক্। এই ভারতে রাজার প্রতি ধর্মোপদেশ—প্রজার মঙ্গল-সাধনই তাঁহার কর্তব্য। প্রজাবর্গের অন্ন-বস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে, শিক্ষার দিকে, স্বাস্থ্যের দিকে এবং অন্যান্য সম্পদের দিকে লক্ষ্য অটল রাখা রাজার শুভবুদ্ধির পরিচায়ক, সেইজন্যই রাজস্বের ভার-মোচন সর্বজনের ইচ্ছাধীন হওয়া উচিত। রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির বিশেষ পরিমাণে সমতা স্থাপন করিতে না পারিলে দেশের উন্নতি সুদূরপরাহত। হে সৌম্য-দর্শন, আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি—তোমার প্রকীর্তিতে প্রখ্যাত পিতৃকুলকে তুমি ন্যায় অধ্যবসায় ও পুরুষকারের সাহায্যে যশের উচ্চতম শিখরে সমুন্নত কর। রাজন্, আমি তোমার

পিতৃদেবের বীর্য ও কীর্তির প্রত্যক্ষ সাক্ষী, তোমার বীর্যবতী অসামান্যা জননীর অপূর্বমহিমা নিরীক্ষণ করিয়াছি, এক্ষণে তাঁহাদের পুত্রবরকে রাজদণ্ড-হস্তে পবিত্র সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার সৌভাগ্য-লাভ করিলাম। এই ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের রাজ্যাকাশে নবোদিত ভাস্বর সূর্যকে আমার জীবনের অস্ত-দিগন্ত হইতে আমি আশীর্বাদ করিতেছি—তোমার রাজত্ব ধর্ম ও ন্যায়ের দুন্দুভি-ধ্বনিতে নিনাদিত হউক্, তোমার অমর কীর্তি-গাথা যুগে যুগে কবি-কণ্ঠে নন্দিত হউক্, তুমি এই প্রসিদ্ধ রাজকুলের নৃপতিশিরোমণি-রূপে চিরজীবী হও।"

প্রতাপনারায়ণ গুরু হরিদেবকে বন্দনা করিয়া প্রণতি নিবেদন করিলেন।—সর্বশেষে রাজ্ঞী ভবশঙ্করী পুত্রকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। প্রথমে তিনি পুত্রের দক্ষিণ-করে রাজদণ্ড সমর্পণ-পূর্বক আবেগকম্পিত স্বরে কহিলেন: "আজিকে আমার যথার্থ বিজয়ের দিন, আমার পরমোৎসবের অক্ষয় দিন। আমার সকল তপস্যা মূর্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছে প্রতাপনারায়ণ-রূপে। আমার গর্বের ও আনন্দের অন্ত নাই। আমি কামনা করি—মাতৃপিতৃকুলপাবন তনয়ের অপবাদ-ভীরু গুণাবলী দেশে দেশে অতিথি-রূপে ভ্রমণ করুক্, তবেই আমার জীবন সার্থক হইবে, আমার ধর্ম-কর্ম সমস্তই সিদ্ধ হইবে। সকল দেবদেবীর চরণে এই আমার প্রার্থনা, রাজকুলনিধির অমূল্য জীবন নব নব গৌরবে গৌরবান্বিত হউক্, অমৃতময় হউক্। মঙ্গলবিধাতা রাজদম্পতীকে মৃত্যুঞ্জয়ী করুন। হে নবীন রাজ্যেশ্বর—তুমি চিরায়ুঃ হও, হে

নবীনা রাজমহিষী—তুমি চিরায়ুষ্মতী হও।”···এই বলিয়া তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে দুইটি দুর্লভ মঙ্গল-রত্ন উপহার দিলেন, তৎসঙ্গে রাজা প্রতাপনারায়ণকে পরাইলেন নীলোৎপল-মণিমেরু-শোভিত পুণ্ডরীক-শিরোমালা ও অমূল্য মণিহার এবং রাজরাণী পদ্মিনী মহেন্দ্রাণীকে অলঙ্কৃত করিলেন একটি অরুণ-শতদল-মালিকায় ও বহুমূল্য হীরক-খচিত মুক্তাহারে।—রাজদম্পতী জনয়িত্রী ভবশঙ্করীর পাদ-চুম্বন করিয়া আপনাদের শির অবনত করিলেন।

প্রতাপনারায়ণের রাজ্যাভিষেক মহাসমারোহে সুসম্পূর্ণ হইল।···অতঃপর প্রতাপনারায়ণ পরমোৎসাহে রাজ্য-পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি চারিদিকে প্রসারিত হইল। জননী ভবশঙ্করী তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া নানা বিষয়ে পরামর্শ-দানে কঠিন রাজকার্যের পথ বহুগুণে সরল সুগম করিয়া দিলেন। কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রতাপের রাজ্যশাসন-প্রতিভা সর্বতোমুখী হইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। তখন ভবশঙ্করী নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ধর্ম-সাধনায় সমস্ত চিত্ত সমর্পণ করিলেন।—রুদ্রেশ্বরশিব-মন্দিরের বিস্তৃত চতুঃসীমার মধ্যে একটি ফল-পুষ্প-শোভিত উদ্যান-বাটিকা ও তৎসংলগ্ন একটি পদ্মসরসী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই শান্ত-পবিত্র দেবস্থানে তিনি অধিকাংশ সময় বাস করিতে লাগিলেন। দেবী ভবশঙ্করীর তপস্বিনী-রূপ পূর্ণ-বিকশিত হইয়া উঠিল, এবং বিশেষ বিশেষ তিথি-যোগে অহোরাত্র কৃচ্ছ্রসাধনায় তিনি আত্মনিয়োজিত হইলেন। কিন্তু দেবতা-পূজনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ-দেবতার পূজাও

তাঁহার নিকট নিত্য পুণ্যকর্ম ছিল, নিয়মিত দরিদ্র-সেবাকে তিনি অশেষ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কর্ম-জ্ঞান-ও ভক্তি-যোগে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তিনি নিষ্কাম সাধনাকে করিয়া তুলিলেন জীবনের সার। এইভাবে কিছুকাল ধর্মজীবন-যাপনের পর দেবী ভবশঙ্করী পুত্রকে বলিলেন: "প্রতাপ, এই সংসারে মানুষের যাহা কাম্য—তাহা সমস্তই আমার পরিপূর্ণ হইয়াছে। এখন আমার শেষ ইচ্ছা তোমাকে পূরণ করিতে হইবে। পুণ্য-তীর্থ বারাণসী আমাকে টানিতেছে। সেই তীর্থ-বাসে যোগক্ষেম সম্পূর্ণ করিবার উত্তম যোগের জন্য তপস্যা করিব। ভগবান্ বিশ্বেশ্বরের সাযুজ্য-লাভ ব্যতীত আমার মুক্তি নাই।"

জননীর ইচ্ছাই প্রতাপের নিকট আদেশ, তদনুসারে মাতৃদেবীর তীর্থ-গমনের সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইল। শুভদিনে শুভক্ষণে ভবশঙ্করী কাশী-যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞীমাতার বিদায়-মুহূর্তে পৌরজন ও পুরাঙ্গনাগণ অশ্রু-পূর্ণ নয়নে তাহাদের শেষ-প্রণাম নিবেদন করিল। দেবী ভবশঙ্করী বিদায়-গ্রহণের পর সারারাজ্যের উপর একটি বিষাদ-ঘন ছায়া আসিয়া পড়িল। প্রতাপও জননীর বিচ্ছেদ-দুঃখ সহসা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাণী মহেন্দ্রাণী শান্তস্নেহহাস্যময়ী প্রীতিসুধামূর্তি শ্বশ্রূমাতার বিয়োগ-দুঃখ মর্মে-মর্মে অনুভব করিলেও, স্বামীর মনোবেদনা লক্ষ্য করিয়া তাহা অন্তর্নিহিত রাখিলেন। তাঁহার মনঃপ্রকৃতি ভবশঙ্করীর সমুচ্চ স্নেহে-শিক্ষায় এবং রাজ-সংসারের উদার পারিপার্শ্বিকের সুরচিত ও অপরিহার্য সমযোগে তরুণবয়সেই বিবেক-বুদ্ধি-বিবেচনা-শক্তিতে পরিণত

হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অন্নপূর্ণা-রূপে বিরাজিত হইয়া অটল স্নিগ্ধভাবে আত্মীয় ও অনাত্মীয়কে সমান আনন্দ-সুখ দান করিতেন। প্রতাপনারায়ণ রাজ্য-সংক্রান্ত সকল কর্তব্য-কর্ম সম্পূর্ণ করিয়া যখন অন্তঃপুর-কক্ষে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহার মনোরমা ভার্যা একেশ্বরী-রূপে তাঁহার অন্তরকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেন, যাহা কিছু অবসাদ-গ্লানি—সমস্তই ঝরিয়া পড়িত। কিন্তু মাতৃ-বিরহে ক্লিষ্ট প্রিয়পতির বিষণ্ণগম্ভীরমুখ সাধ্বী সহধর্মিণীকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল, তিনি প্রকৃতিসিদ্ধ আপন হৃদয়ের সমস্ত প্রেম-অনুরাগ দিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে আবৃত করিয়া ধরিলেন। এইরূপে পত্নীর যত্নে প্রতাপনারায়ণ অল্পদিনের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইলেন, পুনরায় সংসার সহজ-গতিতেই চলিতে লাগিল। বাহিরে রহিল তাঁহার কঠিন রাজকার্য, পাত্র-মিত্র সভাসদ্, এবং অন্দরে রহিলেন তাঁহার হৃদয়-মৃণালে বিকশিত চিরমধুনিষ্যন্দ প্রেমপদ্ম-রূপা মহেন্দ্রাণী ও চিত্তপ্রসন্ন স্নেহসুন্দর কুমার নরনারায়ণ, যেন জীবন-পূর্ণিমায় উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের প্রেম ও আনন্দের জোয়ার আসিয়া তাঁহার অন্তরাত্মাকে নব-মধুর চেতনায় উচ্ছলিত করিয়া দিল।

প্রতাপনারায়ণের সুশাসনে প্রজাবর্গ সুখী হইল, দেবী ভবশঙ্করীর বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিবার আর কারণ রহিল না। তিনি পূজ্যমূর্তি-রূপে সর্বজনের অন্তর-মন্দিরে বাস করিতে লাগিলেন। তরুণ রাজ্যধর রাজনীতি-ক্ষেত্রে, ন্যায়াদর্শে, দেশের শিক্ষা-জ্ঞান ও সম্পদের উৎকর্ষ-সাধনে, প্রজা-পালনে ও সমাজ-সংস্কারে সুবিজ্ঞ লোকপালের ন্যায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার

পরিচয় দিলেন। তাঁহার সমস্ত কার্যই সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল তিনি ছিলেন মাতৃভক্ত আদর্শ সন্তান। জননীর অবর্তমানে রুদ্রেশ্বরশিব-বিগ্রহের সবিশেষ পূজা ও সেবার জন্য প্রধান রাজপুরোহিত-নির্বাচিত এক ধর্মপরায়ণ ভক্ত ব্রাহ্মণের হস্তে তিনি সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। সেই নিষ্ঠাবান্ শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিগমানন্দ চক্রবর্তী ('নিমানন্দ' অপভ্রংশ) নামে খ্যাত ছিলেন। দেবসেবা-নির্বাহের নিমিত্ত প্রতাপনারায়ণ নিগমানন্দকে একশত বিঘা পরিমিত ভূমি দেবত্র দান করেন।

প্রতাপনারায়ণ যখন ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজপদে অভিষিক্ত হন, সেই সময়ে সমগ্র রাজ্য প্রধান রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিলেও পাঁড়ুয়া এবং দোগাছিয়া রাজ্যাংশ-দ্বয় স্বতন্ত্র-ভাবে জ্ঞাতিবংশীয় দুর্গাধিপতি-দ্বারা পরিচালিত হইত। রাজনৈতিক জগতে যুগের পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া প্রতাপনারায়ণ রাজ্যকে অখণ্ড-রূপে প্রকাশ ও অধিকতর দৃঢ়সংবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে পিতৃ-আদর্শে ত্রিধা-বিভক্ত ভূরিশ্রেষ্ঠপুরকে একচ্ছত্র-তলে আনয়ন করিলেন, পাঁড়ুয়া ও দোগাছিয়ার অধিকারিগণের আভ্যন্তরিক শাসন-ক্ষমতা তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রে স্বত্বস্বামিত্বও খর্ব হইল। এই কার্যে ভূপতিকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠপুত্র সদাশিব অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিবাদের কণ্ঠ প্রবল করিয়া তুলিলেন। প্রতাপনারায়ণ তাঁহার সংকল্প-সাধনে বিচলিত হইলেন না। তিনি সদাশিব-প্রমুখ জ্ঞাতিবর্গকে রাজসভায় আহ্বান-পূর্বক সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন: "আমি ভূরিশ্রেষ্ঠের ধর্মসম্মত ও লোকসম্মত রাজা। রাজ্যের মঙ্গলই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

বৃহৎস্বার্থের তুলনায় ব্যক্তিগত বা ন্যূনাংশিকের স্বার্থ প্রাধান্য পাইতে পারে না। এক্ষণে মুঘল-শাসন এবং এই দেশের মাটিতে বৈদেশিকগণের ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বাঙ্গালার অবস্থা জটিল করিয়া তুলিতেছে। এ-স্থলে একতাবদ্ধ না হইলে কোন রাজ্যই স্থায়ী হইবে না, জলবিম্বের ন্যায় বিশাল ক্ষমতা-গর্ভে বিলীন হইয়া যাই'ব। এই সমস্ত বিবেচনায় আমি ভূরিশ্রেষ্ঠকে একসূত্রে বাঁধিয়াছি। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের 'পরে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐক্য, এবং ঐক্যের সাধনার জন্যই স্বাতন্ত্র্যের সাধনা অত্যাবশ্যক। এই সাধনার শক্তিতে দেশের অখিলমানবের মুক্তি ও শান্তি সম্ভবপর। যে-রাজ্যে মঙ্গলের স্থিতি, সেখানে শান্তি বাস করে, এবং যেখানে একতা—সেই স্থলেই মঙ্গল সুনিশ্চয়।—তোমাদের দুঃখের কোন কারণ নাই। তোমরা ভূ-সম্পত্তি ভোগে বঞ্চিত হইবে না, কেবল রাজভাণ্ডারে প্রজাকল্যাণের উদ্দেশ্যে আয়ের চতুর্থ-ভাগ দান করিতে বাধ্য থাকিবে; অতঃপর ভূ-দান করিবার ক্ষমতা তোমাদের আর রহিল না। একরাজ্য, একপ্রাণ, একই স্বার্থ—ইহাই আমার মূল রাজনীতি। স্বদেশের শুভ হইলে কোন দেশবাসীরই অশুভ ভাগ্য-বিপর্যয়ের আশঙ্কা নাই, ইহা নিঃসন্দেহ।"

এ-বিষয়ে রাজ্যের উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন বিজ্ঞ ও প্রধানগণ প্রতাপনারায়ণের কার্য-নীতির সমর্থন করিলেন। তিনি ছিলেন প্রভাববান্ নৃপতি, তাঁহার অসীম তেজের সম্মুখে সকল বাধা অবনমিত হইয়া গেল। দেশের উন্নতি-বিধানে এবং প্রজাসাধারণের হিত-সাধনে জীবন অর্পণ করাই তাঁহার প্রধান

কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। তিনি ভোগ-বিলাসে সর্বদা বিরত থাকিতেন। একদিকে তিনি ধর্মে-কর্মে আচারে-বিচারে ও গার্হস্থ জীবন-যাপনে অচল নিষ্ঠায় বাহুল্য-বর্জিত সরল ব্রাহ্মণের বিহিত রীতিনীতি মান্য করিয়া চলিতেন, অন্যদিকে রাজকার্যে ও ধর্মাসনে তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্তব্য-কঠোর মূর্তিতে প্রকাশিত হইতেন। বস্তুতঃ, তাঁহার মধ্যে ব্রাহ্মণের তপস্বি-মনোভাব এবং ক্ষত্রিয়ের রাজনীতিজ্ঞমনের অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল উদার এবং তাঁহার কর্মশক্তি সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার অব্যাহত শক্তির প্রকাশ দেখিয়া রাজ্যের সর্বস্তরের লোকের মনে অবিচলিত বিশ্বাস জাগিয়াছিল যে, তিনি রায়রাজবংশে এক অভূতপূর্ব উদ্ভব—তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষপ্রবর। প্রকৃতপক্ষে ভূরিশ্রেষ্ঠের তথা বাঙ্গালার ইতিবৃত্তে প্রতাপনারায়ণ ছিলেন একজন লক্ষণীয় বিশ্রুতকীর্তি নরদেব।

স্বভাবপাবন শ্রাবণের জলভারাক্রান্ত ঘন মেঘ মুক্তবেগে অসংখ্য ধারায় আপনাকে ঝরাইয়া দিয়া পৃথিবীকে যেমন নূতন ভাবে-রসে অভিষিক্ত ঐশ্বর্যময়ী করিয়া তোলে, তেমনি প্রতাপনারায়ণ জীবন-সঞ্জাত প্রাণ-প্রাচুর্যে আপনাকে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিলেন, ইহাতে সকল দিকে পরিপূর্ণতার চিত্র ফুটিয়া উঠিল। তিনি ছিলেন সমৃদ্ধশালী জনপদের রাজা, সুখ-শান্তির অভাব ছিল না, তথাপি তিনি সর্বদাই দেশের সর্বক্ষেত্রে ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধির জন্য কর্মে নিযুক্ত থাকিতেন।·· মুঘলবাদশাহি-আমলেই বাণিজ্যের প্রধান-কেন্দ্রস্থল সপ্তগ্রামের পতন এবং

হুগলী-বন্দরের অভ্যুত্থান হইল। বিদেশী পর্তুগীজ বণিক্‌গণ হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দিনে-দিনে এরূপ প্রবল হইয়া উঠিল যে, অধিকাংশ বাণিজ্য-ব্যাপারে ইহাদের অবৈধ প্রাধান্য দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, এই বর্বর ফিরিঙ্গী-জলদস্যুদিগের সীমাতিরিক্ত দৌরাত্ম্যে বহির্বাণিজ্য ব্যাহত হইল। রাজা প্রতাপনারায়ণ ছিলেন অনাগতবিধাতৃপ্রকৃতির ব্যক্তি, অত্যাচারী পর্তুগীজরা যাহাতে তাঁহার রাজ্য-মধ্যে লোভী-কর প্রসারিত করিতে না পারে, সর্বাগ্রে তিনি সে-বিষয়ে সতর্ক হইলেন। কিন্তু অচিরেই দিল্লীর বাদশাহ্ শাহ্‌জহান হুগলী-বন্দর অধিকারে আনিয়া পর্তুগীজ-দিগকে বিতাড়িত করিলেন। তখন সেই অঞ্চল-সমূহে ফিরিঙ্গী-ভীতি দূর হইল। দেশের বাণিজ্য পুনর্বার শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল। ভূরিশ্রেষ্ঠের বাধাপ্রাপ্ত বহির্বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা প্রসার-লাভ করিল। বাণিজ্য ও কৃষি সর্বসম্পৎস্বরূপা লক্ষ্মীর আসন চিরস্থায়ী করে, এই সত্যটি প্রতাপনারায়ণের সুদূরপ্রসারী কর্মনীতি-গুণে সবিশেষ প্রমাণিত হইল।···নানাপ্রকার সুখ-সম্ভোগের স্পৃহা ও শক্তির নেশা প্রতি-মানুষের মনে জাগিয়া থাকে, বিশেষতঃ রাজশক্তির মাদকতা বহুব্যাপক ও সুতীব্র, ইহা লোলুপ অগ্নিশিখার ন্যায় একে একে সমস্ত গ্রাস করিতে ব্যগ্র, দেবী ভবশঙ্করী বিদায়-কালে পুত্র প্রতাপনারায়ণকে এই বিষয়ে সাবধান করিয়া গিয়াছিলেন। প্রতাপনারায়ণ মাতৃ-উপদেশ বিস্মৃত হন নাই। যে ঐশ্বর্য-ভোগ, যে রাজশক্তি বিশ্বলুব্ধ আত্মকেন্দ্রী, তাহাকে তিনি সঙ্কীর্ণ সীমা হইতে মুক্ত

করিয়া দেশ ও দেশবাসীর মঙ্গল-সাধন-কার্যে নিয়োজনের দ্বারা বিরাট্‌ভাবে সার্থক করিয়া তুলিলেন। দেশের বণিক্‌দিগকে এবং অন্ন-বস্ত্র- ও শিল্পজাত বস্তু-উৎপাদকগণকে বারংবার তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, লক্ষ্মীর অটল-প্রতিষ্ঠাই যথার্থ কল্যাণের তপস্যা, এই কল্যাণই অর্জিত ধনকে শ্রী-সম্পন্ন করিয়া তোলে, ইহাই লক্ষ্মী-লাভ; কিন্তু কুবেরের মত বিপুল আশায় সম্পদ্ সংগ্রহ করিলে তাহার স্ফীতি ঘটে সত্য, তবে সেই ধন-স্ফীতি দেশের সর্বজনের কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে না, তাহা অর্থহীন, কেননা সেই ধন কেবল ব্যক্তি বা সংঘবিশেষের আয়ত্তে থাকে। তাঁহার প্রভাবে শ্রী-লাভের মন্ত্রেই সকলে পরিচালিত হইয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যকে লক্ষ্মীশ্রীতে প্রতিভাসিত করিল। বস্তুতঃ, প্রতাপনারায়ণ প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির সাম্য-স্থাপন করিয়া সকলের মধ্যে ঐক্যবোধের সমন্বয় ঘটাইলেন, ইহা দ্বারা প্রজাবর্গ সত্য ও ন্যায়ের মহিমা উপলব্ধি করিতে শিখিয়া স্ব স্ব গুণানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ঐশ্বর্য-সৃষ্টির সম্ভাবনা আনিয়া দিল। ইহা তাঁহার রাজত্বে একটি মহৎকৃত্য।

তিনি লক্ষ্য করিলেন—পরস্পর ব্যবধান-সৃষ্টি ও সংস্কার-ব্যাধি প্রবেশ করিয়া সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিতেছে। ইহার প্রতিকার করিতে তিনি সংকল্প-গ্রহণ করিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই ব্যবধান কৌলীন্যের উচ্চতর ধর্মকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। কৌলীন্য-গর্বিত ব্রাহ্মণকুলের

চেষ্টা ছিল কৌলীন্য-সংস্কারটি রক্ষা করা, কিন্তু ধর্ম-রক্ষা করা নহে, এই কারণে ইহা অধোগতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল। —প্রতাপনারায়ণ বিশেষজ্ঞ উদারনীতিক পণ্ডিতগণের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রুতি-স্মৃতির বিধান-অনুসারে সেই প্রথার দাসত্ব দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার অভিমত শুনিয়া প্রাচীনপন্থী গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ প্রতিবাদ-মুখর হইয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়া প্রতাপনারায়ণ অবিচলিত স্বরে কহিলেন: "ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এই ভেদবুদ্ধি সমাজ-কল্যাণের পরিবর্তে অমঙ্গলেরই সূত্রপাত করিয়াছে, লোক-সমাজকে ক্রমশঃ নীতিদোষ-দুষ্ট করিয়া তুলিতেছে, এই দৃষ্টান্ত-স্থাপনে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে কুফল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সমাজ-নীতি যুগে যুগে পরিবর্তিত না হইলে হিন্দু-সমাজের প্রাণশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। যে ধর্ম- বা সমাজ-নীতি ব্যক্তিবিশেষের নিকট বরণীয়, তাহা যুগধর্ম ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আবশ্যকের অনুরোধে বর্জনীয়।"...তিনি এই সামাজিক সমন্বয় আপনার রাজ্যে ও জীবনে কার্যকর করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত হন। অতঃপর এই রাজবংশে কুলীন ব্রাহ্মণগণের সহিত বহুতর কুলক্রিয়া সাধিত হইল, এবং সম্বন্ধ-সূত্রে বন্দ্য-চট্ট-বংশখ্যাত বিপ্রকুল ভূসম্পত্তি-লাভ করিলেন, আর কোন ক্ষোভের হেতু রহিল না।

প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালে ভূরিশ্রেষ্ঠ অখণ্ড শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মুঘলবাদশাহ্ শাহ্জহান এই জনপদের আভ্যন্তর শাসনে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই এই

ভূরিশ্রেষ্ঠপুর বাদশাহের বশ্যতা-স্বীকার করিলেও একপ্রকার স্বাধীন ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রতাপনারায়ণের রাজসভা ছিল রত্নসভা। কবি ও পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। তিনি জ্ঞান-শিক্ষা ও ধর্মের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারই বিদ্যানুরাগের ফলে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে সংস্কৃত-বিদ্যায়তন গৌরবের সমুচ্চ-শিখরে উন্নীত হইয়া নবদ্বীপের ন্যায় শাস্ত্র- ও বিদ্যা-শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী, তাঁহার পোষকতায় তাঁহার রাজ্য-মধ্যে কবির কাব্য, জ্ঞানীর অমূল্য সন্দর্ভ, তন্ত্র-গ্রন্থ, সাহিত্য-দর্শন, বহু ধর্মসংহিতা ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের টীকা ও নূতন ব্যাখ্যা প্রভৃতি রচিত হইয়াছিল। তিনি যে যুগ-বিশ্রুত বিদ্বান্ বিচক্ষণ ও ন্যায়নিষ্ঠ রাজা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার এক সভারত্ন 'সংসদস্য' ছিলেন (সপ্তদশ শতকের) প্রথিতযশা বৈয়াকরণিক ও টীকাকার ভরত মল্লিক। সেই প্রখ্যাতনামা 'ভূরিশ্রেষ্ঠমহীপাল-সভাপণ্ডিত' তাঁহার রচিত 'চন্দ্রপ্রভা'য় পৃষ্ঠপোষক 'প্রজাধীশ্বর-ধীরবীর' 'জগৎ-প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণরায়ের বংশাবতংস' প্রতাপনারায়ণের নাম কীর্তন করিয়াছেন *। বিদ্যার্থী ও অধ্যয়ন-প্রয়াসী ব্যক্তিবর্গের কাব্য-সাহিত্য-পাঠে অনুরাগ-বৃদ্ধি ও সুবিধা-দানের জন্য এই 'প্রিয়-গুণিগণ-ভূরিশ্রেষ্ঠ-ভূপালে'র নির্দেশে পণ্ডিতপ্রবর ভরত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত-কবিগণ-কৃত কাব্যাবলীর সুভাষিত ব্যাখ্যা ও টীকা প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে ভরতের টীকা-সম্বলিত মহাকবি কালিদাসের

* ভরত মল্লিক কৃত "রত্নপ্রভা", পৃঃ ১৪ ও "চন্দ্রপ্রভা", পৃঃ ২৭, ৩২।

রঘুবংশ ও মেঘদূত প্রতাপনারায়ণের সমাদৃত ছিল **। রাজা প্রতাপনারায়ণ সংস্কৃত-ভাষাকে সংস্কৃতি-বাহিনী-রূপে গণ্য করিতেন, সেজন্য বিশেষভাবে তাঁহার সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠে সংস্কৃতে রচিত নানা বিষয়-বস্তুর সমধিক উৎকর্ষ ও প্রচার লাভ করে। বহুকাল হইতেই ভূরিশ্রেষ্ঠের ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা-বুদ্ধির অতিরিক্ত খ্যাতি ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন কর্ম-জ্ঞান- ও ধর্ম-কাণ্ডবেত্তা এবং শ্রুতি-স্মৃতি-বাগীশ। এই ভূরিশ্রেষ্ঠে চতুর্বেদ, নীতি, আগম, জ্যোতিষ ও তন্ত্রে সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞান-পরিশুদ্ধবুদ্ধি ও শ্রোত্রিয়ত্বের সমুজ্জ্বল যশোনিধির একাধিক আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। বলিতে গেলে, বাঙ্গালার এই মহাপণ্ডিত-পূজ্য স্থানে শক্তিবাদ ও তন্ত্রধর্ম পূর্ণ-বিকাশ ও প্রসারতা লাভ করিয়াছিল। এই কারণে দূর-দূরান্তর হইতে জ্ঞানপিপাসুগণ বিদ্যা-চর্চার জন্য এ-স্থলে সমবেত হইতেন। প্রতাপনারায়ণ এই সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টার ক্রটী করেন নাই।

পুণ্যচরিত প্রতাপনারায়ণ সর্বজন-বন্দিত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার কীতিকথা কবির কাব্যে নন্দিত হইয়াছে। তাঁহারই উৎসাহ পাইয়া (আরামবাগের নিকটবর্তী হায়াতপুর গ্রামবাসী) রাজভক্ত ধনাঢ্য রঘুনন্দন আদকের পুত্র রামদাস 'অনাদিমঙ্গল' নামে একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রামের 'যাত্রা-সিদ্ধি' নামক ধর্মঠাকুরের সম্মুখ-চত্বরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী

** ভরত মল্লিক রচিত রঘু-টীকা ও মেঘদূত-টীকা।

দ্রঃ Eggeling, The India office ms. ct, P. 1415. And Ibid, P. 1422.

তিথিতে অনাদিমঙ্গল-কাব্য কবি-কর্তৃক প্রথম গীত হয়‡। রাজার বন্দনা-গান-মুখর কাব্য-সূচনায় গ্রাম্য-কবি রামদাস গাহেন ঃ

"ভুরসুটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ।
দানদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান॥
তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হতে।
পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে॥
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে।
প্রথম প্রচার গীত যাঁহার দুয়ারে॥
তিন বাণ বসু বেদ শকে সুপ্রচার।
ভাদ্র আদ্য কৃষ্ণপক্ষে অষ্ট দিবস তাহার"॥

—রাজা প্রতাপনারায়ণ তখন অতি-প্রবীণ কীর্তি-ভাস্বর লোকপাল। তাঁহার একান্ত ইচ্ছায় রামদাস কৃতার্থ-মনে রাজপুরীর সংলগ্ন বিরাট্ নাটমন্দিরে 'অনাদিমঙ্গল'-পালা দ্বিতীয়বার গান করিয়া আবালবৃদ্ধবণিতাকে মুগ্ধ করেন। কবির প্রশংসা-বাণী অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। প্রতাপনারায়ণ দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, তাঁহার বিশ্বজনীন বদান্যতা বহুবিশ্রুত ছিল। তাঁহার প্রসাদে অনিকেত বাসগৃহ পাইত, ভূমিহীন ভূমি-লাভ করিত, নির্ধন দুরবস্থের অর্থসিদ্ধি ঘটিত, বিপন্ন মহদাশ্রয়ে নিরাপদ হইত। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার প্রভূত দানে পুষ্ট হইয়াছেন, এমন-কি দরিদ্র সাধারণ প্রজাগণ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তাঁহার দান হইতে কখনও বঞ্চিত হয়

‡ রামদাস আদকের "অনাদিমঙ্গল" কাব্য, রচনা- ও প্রথম প্রচার-কাল ১৫৮৪-শক, ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দ।

নাই *। তিনি বিপন্ন নির্যাতিতের কত বড় সহায় ছিলেন, তাহার বহু দৃষ্টান্তের একটি দিলেই যথেষ্ট হইবে।...ভঞ্জভূমের (মেদিনীপুর-ভুক্ত) খয়রামাজি-রাজগণের অধিকার-চ্যুত রাজ্যে সদ্‌গোপবীর লক্ষ্মণসিংহ আপন পৌরুষে আধিপত্য স্থাপন করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যলোলুপ কুচক্রী কনিষ্ঠভ্রাতা শ্যামসিংহ আফগান-সেনার সাহায্যে লক্ষ্মণসিংহকে হত্যা করিয়া সেই রাজ্যের সর্বময় প্রভু হইয়া বসেন। লক্ষ্মণসিংহের প্রপৌত্র-ত্রয় ছটু রায়, রঘুনাথ রায় ও দুর্গাদাস রায় শ্যামসিংহের রাজত্বকালে ভূরিশ্রেষ্ঠপতি প্রতাপনারায়ণের শরণাপন্ন হন। তিন ভ্রাতাই তাঁহার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া সৎসাহস ও বীরত্বের বলে উচ্চপদ লাভ করেন। অনন্তর সহৃদয় মহাপ্রতাপশালী ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের সৈন্য-সাহায্য লাভ করিয়া তিন বীর ভ্রাতা অত্যাচারী শ্যাম-সিংহের কবল হইতে পিতৃরাজ্য-উদ্ধারে সমর্থ হন। এইরূপ অন্যায়-প্রতিকারে ও দেশ-হিতার্থে তিনি বহুতর নির্ভীক কার্য-সাধনে আপনাকে যশোভাগী করিয়া গিয়াছিলেন। এইস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ব্রাহ্মণরাজবংশের ধর্ম-নীতি সর্বতোভাবে উদার ছিল। রাজগণের পরমত-সহিষ্ণুতার সাক্ষ্য দিতেছে বিভিন্ন কালে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্তিগুলি। ভূরিশ্রেষ্ঠপুরে যেমন ব্রাহ্মণ্যধর্ম, শাক্তধর্ম, শৈবধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম ও তন্ত্রধর্ম পাশাপাশি বাড়িয়াছিল, তদনুরূপ লোকাচার ও কুলাচার-

* বর্তমান হুগলী, হাওড়া ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বহু স্থানে প্রতাপনারায়ণ-প্রদত্ত দেবত্র ও ব্রহ্মত্র ভূসম্পত্তি এবং খণ্ড খণ্ড জমি আজিও অনেক ব্রাহ্মণ ও বিভিন্ন জাতির প্রজা বংশানুক্রমে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছে; তায়দাদ ও দলিল-পত্রাদি ভূরিশ্রেষ্ঠপতি কর্তৃক ব্যক্তি-নির্বিশেষে ভূমিদানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে।

মিশ্রিত পুরাণ-বিহিত ধর্ম-সংস্কার, কৌলধর্ম ও নাথধর্মের অবাধ প্রচলন ছিল। ভুরিশ্রেষ্ঠ-রাজগণ কোন ধর্ম-মতকেই আঘাত করেন নাই। বিশেষভাবে প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকালে শাক্ত- ও তন্ত্র-মত, বৈষ্ণব, শৈব ও পৌরাণিক ধর্ম-সংস্কারের সমন্বয় পরিদৃষ্ট হয়।

প্রতাপনারায়ণ কাশীবাসিনী অমৃতময়ী জননীর ইচ্ছায় কাশীনাথ-শিব (বা বিশ্বনাথ শিব)-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্‌-ব্যতীত তিনি তন্ত্র-মতে একটি শক্তি-প্রতিমা স্থাপন করেন—এই প্রতিমাটি চতুর্ভুজা 'ভুবনেশ্বরী', ইনি মাতৃমূর্তি শিবের শক্তি শিব-প্রিয়া ভবানী-রূপিতা, এবং শিবের শক্তি-রূপে পরিকল্পিতা হর-বল্লভা মণিময়ী দ্বিভুজা 'অভয়া' (চণ্ডী)-মূর্তিও স্থাপিতা হন। এই দুইটি শক্তি-প্রতিমা লোকপ্রচল ধর্মের স্মারক। আবার তিনি বৈষ্ণব-মতে, লক্ষ্মীর যে-স্বতন্ত্রমূর্তি প্রধান—দেবীর সেই চতুর্ভুজা 'গজলক্ষ্মী'-রূপের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু 'জয়দুর্গা' মূর্তি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি এই রাজবংশে মৃন্ময়ী 'দশভুজা' দুর্গা-প্রতিমা-পূজার নিয়মিত ধারা নবভাবে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই দুর্গা-প্রতিমা অষ্টমাতৃশক্তি-পরিবেষ্টিতা এবং দেবীর দক্ষিণোর্ধ্বে গণেশ ও অধে লক্ষ্মী, বামোর্ধ্বে কার্তিকেয় ও অধে সরস্বতী বিদ্যমান*। সেই উপলক্ষ্যে তিনি একটি সুবৃহৎ দ্বিতল রেখমন্দির নির্মাণ করাইয়া তাঁহার ও পূর্বপুরুষ-প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর মূর্তিগুলি এক-একটি গর্ভগৃহে রক্ষা করিলেন।

* প্রায় অনুরূপ মৃন্ময়ী (শারদীয়া) দুর্গা-প্রতিমা পেঁড়োর-গড়বাটীতে প্রতিবৎসর অর্চিতা হন।

রাজা প্রতাপনারায়ণের কীর্তির ইতিহাস সম্পূর্ণ করিবার উপাদান নানা দিকে বিক্ষিপ্ত, বিলুপ্ত এবং জনশ্রুতিতে নিমগ্ন। তিনি প্রতাপনারায়ণপুর নামে সুসম্পন্ন একটি জনস্থান স্থাপন করেন।···প্রতাপনারায়ণের আবির্ভাবে ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্য ধর্মে-শিক্ষায়-সমৃদ্ধিতে চরমোৎকর্ষ-লাভে ধন্য হইয়াছিল। স্বরূপতঃ, বাহুবল ও ধনবল এই সুবিস্তৃত জনপদকে সুখ-শান্তি ও প্রভূত প্রাচুর্যে আনন্দ-তীর্থে পরিণত করিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় এই ব্রাহ্মণরাজ-বংশকে পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন। তিনি ছিলেন মাতৃভক্ত আদর্শ সন্তান, প্রেমসুন্দর আদর্শ পতি, স্নেহময় আদর্শ পিতা এবং প্রজাবৎসল আদর্শ রাজা। এই মহাকীর্তিশালী ভূপতির উদার আদর্শ ও কার্যকলাপ আজিকে অতীতের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। যুগান্তরে 'ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যবাসী নানা কাব্য-অভিলাষী' রায়গুণাকর মধুশ্লোককবি ভারতচন্দ্র আপনার গৌরবান্বিত পরিচয়-দানে সগর্বে উল্লেখ করিয়াছেন : 'যে বংশে প্রতাপনারায়ণ'।

প্রায় অশীতিবর্ষ-অতিক্রান্ত প্রতাপনারায়ণের তিরোধানের পর তাঁহার সর্বগুণান্বিত পুত্র নরনারায়ণ সিংহাসন অলঙ্কৃত করেন।

নরনারায়ণ

নরনারায়ণ যখন রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন, তখন ঔরঙ্গজীব দিল্লীর বাদশাহ্ এবং শায়েস্তা খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার। তিনি ছিলেন পিতৃ-তুল্য গুণভৃৎ, এবং উদার মানসতা চিন্তা-শক্তি ও মানবপ্রেমের অপূর্ব মহত্ত্ব তাঁহাকে সকল মানুষের বন্দনীয় করিয়া তুলিল। রাজপদে অভিষিক্ত হইবার কালে তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন। যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠান-সময়েই লোকসমাজে তাঁহার প্রতিপত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পিতার রাজকার্যে তিনি প্রধান সহায় ছিলেন, এই কারণে রাজনীতিতে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লইয়াই তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শ্লাঘনীয় রাজ্যশাসন-প্রণালী বর্ণ-গন্ধ-গুণোপেত পুষ্পমাল্যের ন্যায় অখিল-প্রজার শিরোধার্য হইয়া উঠিল।

নরনারায়ণের অনন্যসাধারণ গুণাবলী তাঁহাকে সূর্যের মত তেজস্বী ও দীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার কন্দর্প-কান্তি এবং সুনির্মল চরিত্র নিজ-রাজ্যে তো বটেই, রাজ্যান্তরেরও দৃষ্টান্ত-স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ছিলেন অন্যায়ের বৈরী এবং ন্যায় ও সত্য-নিষ্ঠার পরম মিত্র ; তরুণ বয়স হইতেই তাঁহার একাগ্র দৃষ্টি ছিল মহত্তর উদ্দেশ্য ও পরমার্থের প্রতি। প্রেমের শক্তিতে তিনি সকলের চিত্তলোক-বিজয়ী একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। একদিকে ছিল তাঁহার দার্শনিক মন, অন্যদিকে

ইহার সহিত মিলিত হইয়াছিল সাহিত্য-কাব্য-কলা-রস-সিক্ত মন। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। যখন তিনি যুবরাজ, তখনই তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে সভাপণ্ডিত অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য-আত্ম-পরিচয়দাতা (সপ্তদশ শতকের) লেখক ভরত মল্লিক সংস্কৃত-কবি মাঘ-রচিত অনুপ্রাস- ও অলঙ্কার-বহুল "শিশুপালবধ" মহাকাব্যের বিশদ উপাদান-নির্ণয় ও সংগ্রহ-টীকা গ্রথিত করেন, এবং ভট্টি-প্রণীত রামচরিত-আখ্যেয় কাব্যের (ভট্টিকাব্য) টীকাও লিখিত হয় *। তাঁহার কাব্যরসিক মন কঠোর রাজ-কর্তব্যের বাহুল্যেও ব্যাহত হয় নাই, বরং কাব্য-সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বাহিরে ছিল তাঁহার বিদ্বজ্জন-সভা, এবং অন্তঃপুরে ছিলেন তাঁহার কলাবতী ভার্যা অমৃতকলা। বিদুষী পত্নীর সহিত নিভৃত কক্ষে বসিয়া কাব্য-কলা আলোচনায় তিনি পরম তৃপ্তি-লাভ করিতেন। তাঁহার পণ্ডিত-সভায় তিনি যে কেবল সাহিত্য-চর্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন—তাহা নহে, শাস্ত্র ও পুরাণ আলোচনাতেও তাঁহার অশেষ প্রীতি ছিল। তাঁহার উৎসাহে মহাভারতের সটীক 'বিরাটপর্ব'- ও কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠোপনিষদের প্রসিদ্ধ 'নচিকেতা-উপাখ্যান' সংকলিত ও পৃথগ্‌ভাবে লিখিত হইল; এই কার্যের একটি সদুদ্দেশ্য ছিল, কেননা শ্রাদ্ধবাসরে উভয় বস্তুর পাঠে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকে। পুরাণ-কাহিনীর বহুতর ঐশ্বর্যের সহিত জন-সাধারণের অন্তরঙ্গ

* "তদপি পঠন্‌প-পুত্র-প্রীত্যৈ স্পষ্টামিমাং কুর্ব্বে"। (ভরত মল্লিক)
মাঘটীকা; ভট্টিটীকা: Ibid.

পরিচয়-স্থাপনের জন্য, বিষ্ণু কৃষ্ণ হর-পার্বতী ও অন্যান্য দেব-দেবীকে আশ্রয় করিয়া সে-সমস্ত কথা গড়িয়া উঠিয়াছে—তন্মধ্যে অধিকাংশ তাঁহার সুদক্ষ নির্বাচনে বাঙলা ছন্দোবদ্ধ রচনায় গ্রন্থিত হইল। পৌরাণিক দেব-দেবীর কাহিনীর মধ্যে বিচিত্র রূপ-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার অভিনব ব্যঞ্জনা বিভিন্নরুচি লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিল ; ইহা যেমন আনন্দের খাদ্য-পরিবেশনে সকলের মনের ক্ষুধা মিটাইল, তেমনি নানা ধর্মানুষ্ঠানেরও বহুলতা ও নব প্রেরণা সৃষ্টি করিল। এইরূপে লোকাচার ও লোকসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে নরনারায়ণের অভিপ্রায়ে কয়েকটি স্মৃতি-গ্রন্থ, ক্রিয়াকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের পুঁথি, আগম- ও জ্যোতিষ-গ্রন্থ, এবং তান্ত্রিক সাধক-গুরু রামদেবের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-কর্তৃক 'তন্ত্রসার' রচিত হইয়াছিল।

জাতি ধর্ম ও লোকাচারের সমুন্নতি ও প্রসারণের জন্য বিদ্যা ও সংস্কৃতি-বিষয়ে রাজা নরনারায়ণের যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইল, সেইরূপ রাজ্য-পরিচালন-ব্যাপারেও তিনি বিচক্ষণতা ও ভূয়োদর্শনের প্রমাণ দিলেন। পূর্বেই কথিত যে, বাঙ্গালা দেশে বিদেশীর আগমনে অবস্থা-বিবর্তন লক্ষ্য করিয়া প্রতাপ-নারায়ণ নিজ-রাজ্যকে সুরক্ষিত করেন, সেই সময়ে তিনি হারমাদগণের জলপথে অতর্কিত ক্ষিপ্র অভিযানের সম্ভাবনা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে দামোদর-তটবর্তী দক্ষিণপ্রান্তে আমতায় এবং উত্তরপ্রান্তে চাঁপাডাঙ্গায় দুইটি গুল্মবাটিকা ও দ্বিতল চৌকিমিনার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গা-দামোদর-সঙ্গমের

সন্নিকট আর-একটি স্তম্ভাকৃতি চৌকিখানা উত্তোলিত হয়। নরনারায়ণ গুল্মস্থান (ঘাঁটি) দুইটি পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় করিলেন, শুধু তাহাই নহে—অন্যান্য ফিরিঙ্গী-জাতির প্রাদুর্ভাব বশতঃ তিনি গঙ্গা-দামোদর-সঙ্গমের অনতিদূরে নদের দুই ধারে অস্থায়ী গড় তুলিলেন, এবং ছাউনির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবার জন্য চিহ্নিত কয়েকটি স্থানে ফাঁড়ি গাড়া হইল। এতৎসত্ত্বেও মুঘলসরকারের পক্ষ হইতে ভূরিশ্রেষ্ঠে অধিকার সাব্যস্ত করিবার প্রস্তাব আসিল। নরনারায়ণ প্রত্যুত্তরে জানাইলেন যে, ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের সহিত মুঘলসম্রাটের মৈত্রী-সম্বন্ধ মহামতি আকবরের বাদশাহি হইতেই অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, বাদশাহের মর্যাদা-স্বরূপ নির্দিষ্ট রাজস্ব সরকারের খাজানাখানায় নিয়মিত জমা দেওয়া হইয়া থাকে; এই বন্দোবস্তের অন্যথা করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার অর্থই মুঘলপক্ষের সত্য-ভঙ্গ। স্বদেশের আভ্যন্তরিক স্বাধীনতায় আঘাত আসিলে, অশান্তি ও মনোমালিন্যের অবস্থা ঘটিতে পারে, ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের এই সংশয়। শায়েস্তা খাঁ ছিলেন ক্ষেত্রজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি বুঝিলেন—বর্তমান অবস্থায় ভূরিশ্রেষ্ঠপতির সহিত বিরোধ যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ের অধিকাংশ সামন্ত এবং ভূস্বামী ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও অনুরক্ত, তদুপরি এই সুসমৃদ্ধ রাজ্য যুদ্ধকালে জলপথে ও স্থলপথে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার গোপুর-বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠ-আশ্রয়-সন্ধিস্থল; অতএব উপস্থিতক্ষেত্রে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের বিরূপতায় সুফল ফলিবে না। এদিকে দীর্ঘকাল হইতে কূটকৌশলী ক্ষমতা-লোলুপ ইংরেজ-

বণিকগণের সহিত মুঘলপক্ষের বিবাদ ঘনাইয়া উঠিতেছিল, শেষ পর্যন্ত তাহাদের সহিত সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হইল। শায়েস্তা খাঁ আর কালবিলম্ব না করিয়া নরনারায়ণের সহিত সংযোগ স্থাপন করিলেন। নরনারায়ণ অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাঁহার রাজ্য-মধ্যে মুঘল-কর্তৃক ঘাঁটি-নির্মাণে সম্মত হইলেন। গুল্মবাটিকা ও ক্ষুদ্র বুরুজ-যুক্ত সমুচ্চ (ত্রিতল) চৌকি-মিনার উত্তোলিত হইল তিনটি স্থানে—বড়গাছিয়াকে কেন্দ্র করিয়া রূপনারায়ণ ও দামোদরের মধ্যবর্তী খানাকুল-কৃষ্ণনগরে এবং রোণনদী-তীরস্থ দিল-আকাশে*। ইংরেজ-বণিকের সহিত মুঘল-সরকারের যুদ্ধ সংঘটিত হইলেও ভূরিশ্রেষ্ঠপুর অক্ষত রহিল। সেই সময়ে রাজ্যের প্রান্তবিভাগ রক্ষা-কার্যে সৈনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন অসমসাহসী বীর যোদ্ধা যুবরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ।

নরনারায়ণ ছিলেন দানবীর, সদাব্রত যেন তাঁহার নিত্যকর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ, তিনি অকৃপণ জলধরের ন্যায় দানের ধারা-বর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি পাঁড়ুয়া-গড়ের জ্ঞাতিবর্গকে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য বহুপরিমাণ ব্রহ্মত্র-দান করেন। দেবোদ্দেশে ও ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহার ভূসম্পত্তির দান-সংখ্যা শতাধিক। তাঁহার মোহরাঙ্কিত দানপত্র-সকল এই প্রমাণ বহন করিতেছে। একটি বিশেষ দানপত্রে তাঁহার মোহরাঙ্কনে দৃষ্ট হয়—১০৯২ সাল (১৬৮৫ খ্রীঃ অঃ), নিঃসন্দেহে সেই সময়ে তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ রাজা। শৈবাগম-

---

* একমাত্র বড়গাছিয়ায় নিশ্চিহ্ন হইলেও, এখনও অন্য দুই স্থানে এই উত্তুঙ্গ চৌকি-মিনারের জীর্ণদেহ বর্তমান।

অনুসারে রুদ্র-শিবের পঞ্চরূপের এক প্রকাশ 'বামদেব' মণিনাথ-শিবের সেবক মণিরায় গিরি গোস্বামী ঐ বৎসরেই একশত-এক বিঘা দেবত্র লাভ করেন, সম্ভবতঃ উক্ত দলিলের সহিত এই দানের সম্পর্ক থাকিতে পারে। নানা জাতির প্রজাগণও তাঁহার দানে পরিপুষ্ট হইয়াছিল।...এই রাজবংশের গুরুকুল অশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্যের উচ্চ-নীচ পণ্ডিত-মূর্খ সকল শ্রেণীর প্রজা রাজগুরুকে দেবতা-নির্বিশেষে ভক্তি করিত, ইহার অন্যথা কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। রাজা নরনারায়ণ মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ উপলক্ষে গুরুদেবকে প্রণামী-স্বরূপ সেনপুর নামে একটি গ্রাম দান করেন, এবং গুরুদক্ষিণা-রূপে কিঞ্চিদধিক অর্ধশত বিঘা নিষ্কর জমি উৎসর্গীকৃত হয়। পুনরায় রাণী অমৃতকলার পুণ্যকব্রত উদ্‌যাপনের সময় তুলাদান ও তৎসঙ্গে সার্ধশত ব্রহ্মত্র গুরুকুল প্রতিগ্রহ করে। নরনারায়ণের অচলা গুরুভক্তি ও গুরুবংশীয়গণের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তা সবিশেষ জ্ঞাত ছিল।

একদিকে তিনি যেমন দানে সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তেমনি আবার অন্যায়ভাবে তাঁহার ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে—তিনি সহ্য করিতেন না। একদা বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের অতি-লোভে দক্ষ হস্ত তাঁহার রাজ্যের কয়েকটি ভূভাগের উপর প্রসারিত হয়। রাজা কৃষ্ণরাম ছিলেন পঞ্জাবী ক্ষেত্রী, তিনি বর্দ্ধমানের রাজস্ব-সংগ্রহের চুক্তি-বলে রাজোচিত অধিকার লাভ করেন। তিনি ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্যের সীমান্তপ্রদেশের কতকগুলি স্থানে আপন প্রভুত্ব স্থাপন-পূর্বক বলপ্রয়োগে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে থাকেন।

নরনারায়ণ রাজা কৃষ্ণরামের অনুচিত কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে সংবাদ প্রেরণ করেন। কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয়ের সম্ভাবনা দেখা গেল না। অবশেষে নরনারায়ণের কঠিন নির্দেশ-মত বীরপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণরামের অবিহিত কার্যের উপযুক্ত উত্তর দিলেন। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণরামের লোকক্ষয় ও অর্থনাশ তো হইলই, উপরন্তু শক্তিশালী ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের ক্ষতি-পূরণ করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। নরনারায়ণ ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আশ্রিতবৎসল, এতৎসংক্রান্ত বহু প্রসিদ্ধির একটি স্মরণীয় বৃত্তান্ত মহানাদের সমীপবর্তী দ্বারবাসিনীর সহিত জড়িত।···এক পুণ্যতিথিতে ইষ্টদেবতার উপাসনা-শেষে রাজা নরনারায়ণ ষোড়শদান করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বিজাধীশপূজ্য সাধকগুরু রামদেব অকস্মাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন: "নরবর, এক ব্রাহ্মণ তোমার দ্বারে আজ প্রার্থী। তাঁহার প্রার্থনা অসাধারণ হইলেও, তাহা পূর্ণ করা তোমার-সাধনাতীত নহে। তুমি প্রতিশ্রুতি দিলে ব্রাহ্মণকে তোমার সম্মুখবর্তী করিব।"—রাজা গুরুবাক্য বিনা-দ্বিধায় শিরোধার্য করিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের উত্তর-পূর্বে দামোদরের শাখা-দ্বয় কেদারমতী ও কুন্তলা (কান্তুল)-সেবিত ভূভাগ মহানাদ ও তৎসন্নিকট দ্বারবাসিনী জনপদের অবস্থান। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের অধিকারভুক্ত এই দুই স্থানে শৈব- ও শক্তি-তন্ত্রের সবিশেষ প্রাধান্য ছিল। এক জনপদ রুদ্রের নামানুসারে মহানাদ 'জটেশ্বর শিব'-অধিষ্ঠিত, অন্যটি মাতৃকাদেবী 'দ্বারবাসিনী'-র অধিষ্ঠান-হেতু ঐ নামে আখ্যাত। সেই ব্রাহ্মণ

ছিলেন দেবী দ্বারবাসিনীর প্রধান পুরোহিত। দ্বারবাসিনীর সদ্‌গোপ রাজড়া বীরপাল মৃত্যুকালে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক কুমারকে দেবী-পদে সমর্পণ করিয়া যান্। সেইদিন হইতে প্রধানপুরোহিত কুমারের রক্ষণাবেক্ষণের সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে কুমার দ্বারপাল বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তাহার উত্তরাধিকারে বঞ্চিত, এক্ষণে পৈতৃক বাসভূমি হইতে বিতাড়িত, এবং অত্যাচার ও প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজের শরণার্থী। বীরপালের জ্ঞাতি-ভ্রাতা মহানাদের ভৌমিক বাঙ্গালার সুবাদারের সহিত তলে তলে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া দ্বারবাসিনীর রক্ষক-রূপে ভক্ষক সাজিয়া বসিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ভিক্ষা—ন্যায়দর্শী ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের সহায়তায় দ্বারপাল তাহার পিতৃপিতামহের প্রতিষ্ঠিত রাজমহালের পুনরধিকার লাভ করুক্। রাজা নরনারায়ণ নিয়মবিরুদ্ধ সেই বেবন্দোবস্তের প্রতিকার করিতে স্বীকৃত হইয়া কিছুদিনের জন্য দর্পনারায়ণপুরে পুরোহিত ও দ্বারপালের বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন। যথা-সময়ে ভূরিশ্রেষ্ঠপতি মহানাদ-ভৌমিকের সমস্ত চক্রান্ত-জাল ছিন্ন করিয়া দিয়া সৈন্য-সমভিব্যাহারে রণবীর যুবরাজ লক্ষ্মীনারায়ণকে পাঠাইলেন। সংঘর্ষ বাধিল। দ্বারপালও লক্ষ্মীনারায়ণের অধি-নায়কতায় বীরদর্পে যুদ্ধ করিলেন। পরাজিত মহানাদ-পতিকে আপন দুষ্কর্মের জন্য ফল-ভোগ করিতে হইল। রাজা নরনারায়ণ দ্বারপালকে দ্বারবাসিনী-জনপদে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিলেন।

নরনারায়ণ ছিলেন মহাসত্ত্ব পুরুষ। তিনি উপলব্ধি করিয়া-

ছিলেন যে, সনাতন ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য ও পুরাণ-দর্শনের চর্চা ও প্রচারের সুফল দেশবাসী ভোগ করিতে পারে, কারণ—এইপ্রকার অনুশীলনে ভারতের অন্তর্লোক সংস্কার-মুক্ত এবং প্রসন্ন-উদার আদর্শের প্রেরণা পাইয়াছিল। তিনি কোন বিশেষ শ্রেণীর বা ধর্মমতের মানুষের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিতেন না, বরং তিনি ছিলেন সমদর্শী। ভূরিশ্রেষ্ঠপুরের নানা স্থানে নানা সম্প্রদায়ের নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে—প্রতাপনারায়ণ ও নরনারায়ণ কোন ধর্মমতকেই অশ্রদ্ধা করিতেন না। সম্ভবতঃ, নরনারায়ণ কর্তৃক সরাই গ্রামে দেবী মনসার মূর্তি ও মন্দির স্থাপিত হয়। তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ-মতে বিষ্ণুমূর্তি, মাতৃকা-মূর্তি দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী ও তান্ত্রিক-মূর্তি মহাবিদ্যা দ্বিভুজা ভৈরবী দেবী-দ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং রাণী অমৃতকলার ইচ্ছানুসারে অন্নপূর্ণা-প্রতিমা ও গঙ্গাধর-শিব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন। মহারাজ প্রতাপনারায়ণ যে-দ্বিতল মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, মহারাজ নরনারায়ণ সর্বদেব-সমন্বিত সেই সুবৃহৎ একরত্ন দেবালয়ের পরিপূর্ণতা আনিয়া দেন *।

* (পরবর্তী কালে গোপীনাথ-মন্দির বলিয়া কথিত) এই দ্বিতল রেখ-দেউলে প্রতিষ্ঠিত যে-সকল দেব-দেবীর মূর্তির লিপিগত সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা চতুর্দশটি। কিন্তু জানা যায়—অষ্টাদশ দেবতা-মূর্তি এক-একটি গর্ভগৃহে স্থাপিত ছিলেন। যে চারিটি বিগ্রহের উল্লেখ নাই—তাঁহাদের নাম: বিষ্ণু, জয়দুর্গা, বিশালাক্ষী ও অন্নপূর্ণা। চতুর্দশ দেবতার (প্রাপ্ত) সজ্জা এইরূপ ' (১) শৈব-ও বৈষ্ণব-মূর্তি (অধিকাংশ ব্রাহ্মণ্যপুরাণ-মতে)। নিম্নতল (বাম হইতে দক্ষিণে): গঙ্গাধরশিব, শ্রীগোপাল, গোপীনাথ, চক্রপাণি দামোদর, রাধিকা, বিশ্বনাথ (কাশীনাথ) শিব। (২) ব্রাহ্মণ্যপুরাণ- শাক্ত ও তন্ত্র-মূর্তি। দ্বিতল (বাম হইতে দক্ষিণে): চতুর্ভুজ গণেশ, দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, দশভুজা ভগবতী দুর্গা, দ্বিভুজা ভৈরবী, চতুর্ভুজা ভুবনেশ্বরী ও চতুর্ভুজা গজলক্ষ্মী।

সরাই-ম মনি পাড় উত্তরের ছবি

নরনারায়ণের রাজত্ব ছিল কীর্তি-সমুজ্জ্বল। তাঁহার বহু কীর্তি-নিদর্শনের আজ বিলোপ ঘটিয়াছে, তথাপি এখনও ভুরস্যুটে (হুগলী, হাওড়া ও বর্ধমানে) বহু দেবালয় ও সুবৃহৎ দীর্ঘিকা-সকল তাঁহার গৌরবের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রসিদ্ধ রাজার গৌরব-চিহ্ন বিশ্লিষ্ট-রূপে ভাবজগতে ও বস্তুজগতে সমাহিত হইয়া আছে। তাঁহার চিত্তে মৈত্রীর নীতি প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি উদারনৈতিক ও শান্তিপ্রিয় হইলেও কোনদিন দুর্বলতার পরিচয় দেন নাই, বরং স্বীয় রাজশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। নরনারায়ণের ধনঞ্জয়-তুল্য বিক্রমী পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার শাসন-পরিচালনায় বিশেষ সহায় ছিলেন, এবং সেনানী-রূপে প্রয়োজনে শত্রু ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছেন। প্রায় শতাধিক লিপিগত প্রামাণ্যে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, রাজা নরনারায়ণের অধিকতম ভূদান আজিও বহুজনের ভোগায়ত্তে বর্তমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ, সুপ্রসিদ্ধ রাজা নরনারায়ণ ভূরিশ্রেষ্ঠ নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন। তিনি মুঘল-সরকারে রাজস্ব-স্বরূপ (আকবরের সময় হইতে নির্দিষ্ট) একটি স্বর্ণমুদ্রা, একটি ছাগ ও একখানি কম্বলের অধিক এক কপর্দকও দিতেন না।

৩

লক্ষ্মীনারায়ণ

(লছমীনারায়ণ)

রাজা নরনারায়ণের মৃত্যুর পর লক্ষ্মীনারায়ণ গড়ভবানীপুরের রাজাসনে অধিরূঢ় হন। লক্ষ্মীনারায়ণ সেই সময়ে বঙ্গদেশে একজন রণকুশল মহাবীর ও ধনুর্ধর বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার উগ্রপ্রকৃতির জন্য দেশের কতিপয় আত্মপরায়ণ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহার প্রতাপের সমক্ষে সামন্ত সর্দার ও জমিদারগণ মস্তক অবনত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

মুঘল-সরকারের ক্রমাবনতি নরনারায়ণের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যকালে সর্বজনের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। মুঘল-শাসনের প্রভাব বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশের চারিদিকে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। ইহার আর-একটি বিশেষ কারণ—বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর অলস রণভীরু চরিত্র এবং নিষ্ক্রিয় শাসনের দুর্বলতা। মেদিনাপুরের ঘাটাল-চন্দ্রকোণা মহকুমায় চেতুয়া-বর্দার জমিদার শোভাসিংহ (খ্রীঃ অঃ ১৬৯৫-এর প্রায় মাঝামাঝি) মুঘল-শাসন তুচ্ছ করিয়া প্রতিবেশীরাজ্য-লুণ্ঠনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন। রাজা কৃষ্ণরামের সহিত কোন বিবাদের ছল ধরিয়া শোভাসিংহ বর্দ্ধমান আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা কৃষ্ণরাম ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট

সাহায্য প্রার্থনা করিয়া উপহার পাঠাইলেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বর্দ্ধমানরাজের একাধিকবার পূর্ব দুর্ব্যবহারের জন্য তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন, সেই কারণে কৃষ্ণরামের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইল। শোভাসিংহ দামোদরতীর-পথে ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্য নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া বর্দ্ধমান আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণরাম যুদ্ধে নিহত হইলেন। শোভাসিংহ বর্দ্ধমান নগর এবং রাজার সমস্ত ধন-সম্পত্তি অধিকার করিলেন, কৃষ্ণরামের স্ত্রী-কন্যাও তাঁহার হস্তে বন্দিনী হইলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের সাহায্য পাইলে রাজা কৃষ্ণরামের এই সর্বনাশ ঘটিত কি-না সন্দেহ।—এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতোমধ্যে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র জীবিত পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ্ দিল্লীর তখ্‌ৎ-ই-তাউসে উপবিষ্ট হইয়াছেন। মুর্‌শিদ কুলি খাঁ সেই সময়ে (১৭১০ খ্রীঃ অঃ) বাঙ্গালার দেওয়ান, কিন্তু অল্প পরেই নায়েব-নাজিমের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বজ্রকঠোর আইন-প্রয়োগে এবং পাশবিক পীড়ন-প্রণালীতে রাজস্ব বর্ধিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্যে যে-সমস্ত হিন্দু বঙ্গবাসী সহায় হইলেন, তাঁহাদিগকে তিনি জমি ও সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, তাঁহারা জমিদার হইলেন। বর্দ্ধমান-রাজ কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরামের উত্তরাধিকারী কীর্তিচাঁদ মুর্‌শিদ কুলি খাঁর অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি সেই সময়ে মুর্‌সিদ কুলি খাঁর অনুগ্রহে প্রবল হইয়া উঠেন। বর্দ্ধমানরাজ কীর্তিচাঁদ বনবিষ্ণুপুরের রাজা বাহুযমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন এবং তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ নিজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে সমর্থ হন। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের

প্রতি কীর্তিচাঁদের হৃদয়ে বংশগত আক্রোশ তুষের আগুনের মত জ্বলিতেছিল। মুসলমান শাসকের বলে বলীয়ান্ হইয়া বর্দ্ধমানের দক্ষিণদিগ্‌বর্তী ভূভাগ স্বীয় রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কীর্তিচাঁদ বলপূর্বক তাহা অধিকার করিতে উদ্যোগী হইলে, রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণ অত্যন্ত পরাক্রমের সহিত তাঁহাকে সেই স্থান হইতে বিতাড়িত করেন। হতমান কীর্তিচাঁদ এইরূপে হতাশ্বাস হইয়া মুর্‌শিদ কুলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠরাজের বিরুদ্ধে প্রত্যেকের চিত্ত-সঞ্চিত বিদ্বেষবহ্নি আরও প্রজ্বালিত করিলেন। এই ষড়্‌যন্ত্রের প্রধান কুচক্রী ছিল পাঁড়ুয়াগড়ের সদাশিব রায়ের তৃতীয় ভ্রাতা রাজবল্লভ, রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সম্পর্কিত জ্ঞাতি-পিতৃব্য। এই হীনচেতা রাজবল্লভ ভূরিশ্রেষ্ঠের উত্তরাংশ আপন অধিকারে আনিবার আশায় কীর্তিচাঁদের সহিত যোগ দিয়াছিল। চক্রান্তকারিগণ মন্ত্রণা করিয়া স্থিরনিশ্চয় হইল যে, মুঘলসৈন্য ও তোপের সাহায্যে গড়ভবানীপুর আক্রমণ ও অধিকার করা কষ্ট-সাধ্য নহে। কীর্তিচাঁদ নবাব-নাজিমের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এমনই বীর্যবান্ ছিলেন যে, কীর্তিচাঁদ নবাব-নাজিমের সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়াও গড়ভবানীপুর আক্রমণ করিতে প্রথমতঃ সাহসী হইলেন না, দ্বিতীয়তঃ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তার পর স্থির করিলেন—কূটকৌশলে এই জনপদ আয়ত্তে আনিতে পারিলে সকলদিক্ রক্ষা পাইবে। অতএব তিনি উত্তম অবসরের অপেক্ষায় দিন গনিতে লাগিলেন, কিন্তু গোপনে যবনিকার অন্তরালে গভীর চক্রান্তজাল বিস্তৃত হইল। পাঁড়ুয়াগড়ের রাজা

নরেন্দ্র রায়ের লুব্ধপ্রকৃতি পিতৃব্য রাজবল্লভ সেই হীন ষড়যন্ত্রে প্রধান প্রতিপোষক হইয়া পিতৃভূমিকে ঘোরতর বিপদের মুখে ঠেলিয়া দিতে সচেষ্ট রহিল। সমুদ্রের অন্তরে বাড়বানল প্রজ্বলিত হইতে থাকিলেও অনেক সময়ে উপরের জলরাশিতে তাহার বিক্ষুব্ধ প্রকাশ যেমন প্রত্যক্ষগোচর হয় না, সেইরূপ পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তির মাদকতা সুতীব্র ক্ষুধিত অগ্নির ন্যায় জ্বালাময়ী লোলুপ রসনা রসাতলগামী কুটিল চক্রান্ত-পথে প্রসার করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে রহিল অব্যক্ত। গৃহশত্রু রাজবল্লভ রাজ্যের স্বার্থান্বেষী কয়েকজন পুরবাসী ও ভেদবুদ্ধি-চালিত মুসলমান প্রজাদলের মণ্ডলকে হস্তগত করিল এবং দেওয়ান রাধাবল্লভ দত্ত তাহার চাতুরীতে ও পদবৃদ্ধির প্রলোভনে ভুলিল। ভূরিশ্রেষ্ঠে রাজগণের বহুপ্রয়াসে যে-আদর্শে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্ববিধ উন্নতির জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রাজবল্লভ-প্রমুখ এক শ্রেণীর শক্তিমুখর স্বার্থান্ধ ব্যক্তি অন্তঃশত্রুর ভূমিকা গ্রহণ-পূর্বক সেই দেশের জীবনকে অভাবনীয়রূপে বিপন্ন করিয়া তুলিল। ইহার বিষময় ক্রিয়া ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। এদিকে বাঙ্গালা-সুবার নবাব-নাজিম মুরশিদ্‌কুলি সাব্যস্ত করিলেন যে, অর্ধ-স্বাধীন হিন্দু-ভূপতির রাজ্য উচ্ছেদ করিলে মুসলমান-রাজ্য নিরঙ্কুশ শুধু নহে, রাজস্ব-বৃদ্ধিতে পরিপুষ্ট হইবে। সেইজন্য তাঁহার অতি-অনুগৃহীত কীর্তিচাঁদকে তিনি ভুরসুট অধিকার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। কীর্তিচাঁদ সবিশেষ উৎসাহিত হইয়া এতদিন সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন।

অবশেষে কুটিলা নিয়তি অদৃষ্ট-চক্রে কর-সঞ্চালন করিল। ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া রাজ্য-মধ্যে কোন বহিঃশত্রুর উপদ্রব আশঙ্কা করিলেন না। সেই ধারণায় তিনি এক মানস-পূজা সাধনার্থে তমলুকে বর্গভীমা দেবীর মন্দিরে সস্ত্রীক যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাধাবল্লভ হীনচেতা কুলাঙ্গার রাজবল্লভের গোচরে আনিলেন সেই প্রতীক্ষিত দৈবযোগের বার্তা। রাজবল্লভ ইহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু কোন কারণে রাজা যদি মত-পরিবর্তন করেন, এই সংশয়ে তাঁহাকে সত্বর স্থানান্তরিত করিবার অভিসন্ধিতে রাজনগরে হঠাৎ একটি মিথ্যা জনরব প্রচারিত হইল : দুর্দান্ত বর্গীরা উন্মত্ত প্রভঞ্জনের গতিতে উড়িষ্যায় বিপর্যয় ঘটাইয়া ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্য লুণ্ঠন করিবার জন্য তমলুকের উপকণ্ঠে আগতপ্রায়, তাহাদের সহিত তেলেঙ্গা-দস্যুদলও যোগ দিয়াছে। নানা অতিরঞ্জিত রটনার ফলে ত্রস্ত অজ্ঞ জনসাধারণের ক্রন্দন-রোল উঠিল। সহসা বিপৎপাতের দুঃসংবাদ শ্রবণে লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথমে বিচলিত হইলেন বটে, কিন্তু বর্গীর আগমন সুদূরপরাহত বিবেচনা করিয়া রটিত বিষয়ের যাথাতথ্য সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিল। তথাপি মিথ্যার এমনই শক্তি যে, চক্রান্তকারীদিগের কার্যতৎপরতায় চারিদিকে এরূপ প্রতিবেশ সৃষ্ট হইয়া উঠিল, তাহাতে রাজার পক্ষে প্রতারিত হওয়া স্বাভাবিক। মহাবীর লক্ষ্মীনারায়ণের বিশ্বাসের ভিত্তি টলিল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পূর্বাপর বিচার করিবার শক্তি হারাইয়া তিনি সসৈন্যে তমলুক-যাত্রার আয়োজন করিলেন। রাণী হিমাদ্রিজা

স্বামীর বহু অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গ-ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা হইলেন না। অনন্তর ভূরিশ্রেষ্ঠপতি দুর্ধর্ষ অরাতি দমন করিবার আগ্রহে গজানীক, অশ্বারোহী ও রণকুশল পদাতি-সৈন্য লইয়া তমলুকের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজধানী-রক্ষার ভার দেওয়ান রাধাবল্লভ দত্ত, নগরপাল ও গড়রক্ষীর উপর অর্পিত হইল: চক্রান্তকারিগণের রাজদ্রোহিতার দ্বারা প্রণোদিত জুগুপ্সা ও বিদ্বেষ পূর্ণোদ্যমে বিষক্রিয়া আরম্ভ করিল।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ জলপথে অল্প-সংখ্যক রক্ষীসেনা লইয়া তমলুকে গমন করিলেন, সৈন্যদল স্থলপথে অগ্রসর হইল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি বগার হাঙ্গামার কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না। স্থানীয় ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি জানিলেন যে, বন্যবর্বর একদল লুঠেরা গ্রামান্তরে কিছুদিন পূর্বে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু অন্য কোন উপদ্রব হয় নাই। তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সপত্নীক দেবকার্যে মনোনিবেশ করিলেন, এবং সৈন্যগণ উপনীত হইলে দুই-চারিদিন বিশ্রামের পর তাহাদিগকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন।···ইত্যবসরে কীর্তিচাঁদ ভূরিশ্রেষ্ঠ-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে দেওয়ান রাধাবল্লভের প্রত্যয় আনিবার জন্য রাজবল্লভকে উপহার-সহ দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। প্রলুব্ধ রাধাবল্লভ ভরসা পাইয়া কীর্তিচাঁদকে সর্বপ্রকার সাহায্য-দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। রাজবল্লভ কীর্তিচাঁদের অভিযানে পথ-প্রদর্শক হইয়া সৈন্যনিবাসগুলির সন্ধান দিতে লাগিলেন। কীর্তিচাঁদের গতিপথ উন্মুক্ত সরল হইয়া উঠিল। তাঁহার সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইল

হুগলীর ফৌজদারের বৃহৎ ফৌজ। কীর্তিচাঁদ সদলবলে ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজধানী-অভিমুখে যাইবার পথে ছাউনাপুর-দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্গস্বামী সেই অতর্কিত আক্রমণেও শত্রুসৈন্যকে বাধা দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল। দুর্গ-মধ্যে যে অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল, তাহার অধিকাংশ সেই যুদ্ধে হতাহত হইল; দুর্গাধ্যক্ষ দেওয়ানের নিকট ইতঃপূর্বেই সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু রাধাবল্লভ দুর্গাধিপতির আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। দুর্গস্বামী ভগ্নোদ্যম না হইয়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু শত্রুগণকে বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। কীর্তিচাঁদ বিংশসহস্র সৈন্য ও তোপের সাহায্যে ছাউনাপুর দুর্গাধিপতিকে পরাস্ত করিলেন। দুর্গস্বামী শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। শত্রু-কর্তৃক দুর্গ অধিকৃত হইল। দুর্গ-পরিখার নিকট সেই নিধন-স্থান 'গর্দানহানা' নামে অতীতের সাক্ষ্য দান করিতেছে। অতঃপর কীর্তিচাঁদ বিজয়োল্লাসে সসৈন্যে গড়ভবানীপুর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। শত্রুসৈন্য রাজবলহাটের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। কীর্তিচাঁদ বিশ্রামের জন্য শিবির সন্নিবেশ করিলেন। রাজবলহাটের নিকটবর্তী নঙ্করডাঙ্গায় রাজার এক সেনানিবাস ছিল। কিন্তু সেখানেও অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল। রাজ্যের অধিকাংশ রণকুশল সৈন্যই রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত তমলুক যাত্রা করিয়াছিল। সুতরাং তত্রত্য দুর্গাধিপ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া সাহায্যের জন্য রাজধানীতে দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন।

ছাটনাপুর-গড়ের এই স্থানে কীর্তিচন্দ্রের সহিত দুর্গস্বামীর যুদ্ধ হইয়াছিল।

[রায়বাঘিনী—উত্তররাজ-চরিত : পৃঃ ৪৩৬

রাধাবল্লভ নির্দেশ দিলেন যে, কীর্তিচাঁদের বিজয়িনী সেনার প্রতিকূলতাচরণ করিলে ধ্বংস অনিবার্য, অতএব নিরস্ত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ফলতঃ, দুর্গাধিপের ঔদাসীন্যে কীর্তিচাঁদের সৈন্যগণ এইস্থানে কিছুমাত্র বাধা-প্রাপ্ত না হইয়া মহোৎসাহে গড়-ভবানীপুরের দিকে চলিল। কিন্তু স্থানীয় জনগণ, শত্রুরা হানা দিয়াছে শুনিয়া, পূর্ব হইতেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, লাঠি-সড়কি লইয়া প্রস্তুত ছিল। দেশভক্ত রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ সেই বিষম বিপৎকালেও দুর্গাধিপের নির্লিপ্তভাব দেখিয়া সন্দেহাকুল হইল। রাজবলহাট ও নিকটবর্তী গ্রামসমূহের ব্রাহ্মণ ও বাগদী প্রজাগণ শত্রুদিগকে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে বাধা-প্রদান করিতে লাগিল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রে প্রবল বৃহদাংশিকের নিকট ন্যূনাংশিকের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। অতঃপর শত্রুসৈন্য অপ্রতিহত গতিতে রাজনগরে গিয়া পৌঁছিল। গড়ভবানীপুর অবরোধ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না, কারণ—চক্রান্তকারীরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। শত্রুগণ নগরের চতুর্দিকে তোপ সজ্জিত করিল। এই মহাবিপদের সময় রাণীও রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন না। রাজপুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক। রাজ্যের প্রসিদ্ধ বীরগণও অনুপস্থিত। প্রধানতঃ দেওয়ানের কার্যের উপরই রাজ্যের ভাগ্য নির্ভর করিতেছিল। নগরপাল (কোৎওয়াল) বামাচরণ পালধি পুররক্ষী সৈন্যদলের সাহায্যে যথাশক্তি নগর-রক্ষা করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসঘাতক রাধাবল্লভ নগরপালকে জ্ঞাপন করিলেন: "এই গুরুতর বিপদে রাজধানী রক্ষা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। নবাব-নাজিম কীর্তিচাঁদের সহায়, আমাদের রাজাও রাজ্যের

অধিকাংশ বীর-যোদ্ধার সহিত তমলুক-যাত্রা করিয়াছেন। এ-অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া বৃথা লোকক্ষয় করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি না। অতএব এখন বশ্যতা স্বীকার করিলে প্রজাদের ধন-প্রাণ ও রমণীগণের সম্মান রক্ষা হইতে পারে। এ-বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য-বোধে আপনাকে আহ্বান করিয়াছি। আপনি সম্ভবতঃ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন।”

নগরপাল বামাচরণ দেওয়ানের কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি রাধাবল্লভের বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ণ আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন: “রাজার অনুপস্থিতিকালে রাজ্যরক্ষার ভার আমাদেরই উপর সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত। এরূপ অবস্থায়, দেহে প্রাণ থাকিতে জননী জন্মভূমিকে শত্রুহস্তে অর্পণ করা ঘোর কাপুরুষতার কার্য। এই মহাবিপদের সময়ে দেশরক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া যে-ব্যক্তি ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তাহার মনুষ্য-নাম বৃথা, সে নরাকার পশু। সেই পাপাত্মার পাপস্পর্শে ধরিত্রী কলুষিতা হন। অতএব আপনি ঔদাস্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। শত্রুসৈন্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডায় আর কালক্ষেপ করিবার অবসর নাই।” ... নগরপালের তিরস্কারবাক্যে দেওয়ানের চৈতন্যোদয় হইল না। দেওয়ান নগরপালকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন: “আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হন, তবে আমি আপনাকে পদচ্যুত করিলাম। আপনি জানেন, আমিই এক্ষণে ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজ-প্রতিনিধি,

রাজশক্তি আমার হস্তে পূর্ণরূপে বর্তমান! অদ্য হইতে আপনি একজন সামান্য প্রজারূপে গণ্য হইবেন। অস্ত্র-ত্যাগ করুন।”

স্বাধীনচেতা বীর বামাচরণ দেওয়ানের এবংবিধ বাক্য-শ্রবণে ক্রোধকম্পিতহস্তে অসি আস্ফালন করিয়া বজ্রকঠোরস্বরে রাধাবল্লভকে ঘৃণ্য মনুষ্যাধম বলিয়া ধিক্কার দিতে দিতে তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ-পূর্বক সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি নগরবাসিগণকে রাজধানী রক্ষার্থে বদ্ধপরিকর হইতে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অনেকে তাঁহার ডাকে সাড়া দিল। বলিষ্ঠ পৌরজন, নগররক্ষীসেনা ও গড়সৈন্যদের সাহায্যে নগরপাল বামাচরণ প্রাণপণে রাজধানী রক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে দেওয়ান রাধাবল্লভ নগরপালকে স্বপক্ষে আনিতে বিফল হইয়া বিষম বিপদে পড়িলেন। আশা ছিল—নগরপাল তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন, কিন্তু নগরপালের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাব দেখিয়া দেওয়ানের সংকল্প হইল তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করা। কারণ, দেওয়ান স্থির বুঝিয়াছিলেন, বামাচরণ জীবিত থাকিতে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার পথে বিঘ্ন জাগিবে। বিঘ্ন-অপসারণের চেষ্টা চলিল।...শত্রুগণকে দূরীভূত করিবার জন্য বামাচরণ প্রথম ও দ্বিতীয় দিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে রাজধানীর অধিকাংশ যুদ্ধক্ষম ব্যক্তি নিহত হইল। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার পর এক অসতর্ক মুহূর্তে দেশভক্ত সন্তান বামাচরণও গুপ্তঘাতক-হস্তে নিহত হইলেন। রাজ্যের শেষ আশা-স্থল বিলুপ্ত হইল। কিন্তু বামাচরণের পত্নী বীরমতী শোকাভিভূত না হইয়া নগর-রক্ষণে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। পুনর্বার সমরাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ পাইয়া কয়েকজন দেহরক্ষীর সহিত সস্ত্রীক দ্রুতগামী ছিপে জলপথে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। সৈন্যগণ স্থলপথে রাজধানী-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তখনও তাহারা উপস্থিত হইতে পারে নাই। এদিকে গুপ্তচর-মুখে রাজার আগমন-সংবাদ শুনিয়া রাজবল্লভ পথিমধ্যে তাঁহাকে হত্যা করিবার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু শত্রু-গণের সকল চেষ্টা নিষ্ফল করিয়া অসমসাহসী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ পথের বাধা নির্মূল করিলেন। রাজধানী দুইদিকে দামোদর নদ-সংযুক্ত এক সুবিস্তৃত পরিখা-দ্বারা বেষ্টিত ছিল। রাজা অবস্থা বুঝিয়া রজনীর অন্ধকারে এই পথে গুপ্তভাবে গড়-অবরোধের দ্বিতীয় দিবসে রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। অল্প পরেই রাজসৈন্যগণ ত্বরিতগতিতে উপস্থিত হইবামাত্র নগর-প্রবেশমুখে বাধাপ্রাপ্ত হইল। নবাব-নাজিমের মুসলমানসৈন্যগণের সহিত ভুরসুটসেনার ভীষণ সংঘর্ষ বাধিল, উভয়পক্ষেই বহু হতাহত হইল, কিন্তু অধিনেতার অভাবে রাজসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।… রাজা পুরীতে পদার্পণ করিয়াই শুনিলেন যে, অতিবিশ্বস্ত বীর নগররক্ষী বামাচরণ দেশদ্রোহী কৃতঘ্ন দেওয়ান-নিযুক্ত গুপ্তঘাতক-হস্তে নিহত হইয়াছেন। রাজা রাধাবল্লভের অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সাক্ষাৎ পাইলেন না, তখন সেই দুর্মতি প্রকাশ্যে শত্রুর সহিত যোগদান করিয়াছিল। নগরপাল-পত্নী বীরমতী নগর-রক্ষার্থ প্রাণ দিয়াছেন, এই সংবাদে তিনি আরও মর্মপীড়িত হইলেন।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ আর নিশ্চল থাকিতে পারিলেন না।

তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে নগর-দ্বার উৎপাটিত হইল। রাজা দুর্গে অবস্থিত অল্পসংখ্যক সৈন্য ও সমস্ত সমর্থ পুরুষকে সমবেত করিয়া দেশরক্ষার জন্য আহ্বান জানাইলেন। সকলে গর্জন করিয়া উঠিল : "বন্দেঽরবিন্দশ্রিয়ম্"।—রাজা অগ্ন্যস্ত্র সঙ্গে লইয়া উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে সদর্পে শত্রুসৈন্য-সাগরে ঝম্প-প্রদান করিলেন। দৈত্যারি কুমারের মত বীরকেশরী লক্ষ্মীনারায়ণের বিক্রমে ও দুর্নিবার বেগে শত্রুপক্ষ বিপর্যস্ত ও নিহত হইতে লাগিল। অবস্থান্তর লক্ষ্য করিয়া কীর্তি-চাঁদ একদল রণদক্ষ মুঘলসৈন্যকে যুদ্ধে ঝাপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন। রাজপক্ষের অনেকেই আত্মাহুতি দান করিল। রাজ্ঞী হিমাদ্রিজা নিরীক্ষণ করিলেন—রাজা অবশিষ্ট কয়েকজন নির্ভীক রক্ষীসেনার সহিত অগণিত শত্রুসৈন্য-দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধে নিরত। রাজ্ঞী ছিলেন সমন্তরাজকন্যা, সাহসের দীক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি পতিকে রক্ষার নিমিত্ত পুররক্ষীসেনার সহিত যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণা হইলেন। রাজ্ঞীকে দেখিয়া শত্রুসৈন্যরা স্তম্ভিত হইল। ইতোমধ্যে রাজ্ঞীর প্রসাদিত দস্যুসর্দার রঘুনাথ দামোদর-পথে দৈবক্রমে আগমন-কালে যুদ্ধের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিল। রঘুনাথ রাজ্ঞীকে মাতৃ-জ্ঞানে ভক্তি করিত। সেই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে রঘুনাথ আর চিন্তা না করিয়া সদলে সেই যুদ্ধস্থলে ঘূর্ণবাতের ন্যায় হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া চক্ষের নিমেষে শত্রুপক্ষের উপরে কয়েকটি আগ্নেয় গোলক নিক্ষেপ করিল। সেই স্থান ধূম্রজালে পরিব্যাপ্ত হইল, শত্রুসৈন্যরা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে রাজ্ঞী রাজাকে শত্রুর কবল হইতে

উদ্ধার করিয়া গুপ্ত পরিখার দিকে ছুটিয়া চলিলেন। রাজ্ঞীর পূর্বনির্দেশমত সে-স্থলে রাজকুমারগণ ও রাজপরিবারের আত্মীয়-পরিজন ছিপে উঠিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। আর-একটি দ্রুতগামী ছিপও প্রস্তুত ছিল। অনন্তর রাজ্যরক্ষার আর কোনও আশা নাই দেখিয়া রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পুনরায় ছিপে গিয়া উঠিলেন। ছিপ দ্রুতবেগে দামোদর বাহিয়া ছুটিল। অবশেষে তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত চন্দ্রকোণার রাজা চন্দ্রকেতুর শরণাপন্ন হইলেন।

গড়ভবানীপুর শত্রু-হস্তগত হইল। পরদিন কীর্তিচাঁদ গড়-ভবানীপুরে তাঁহার বিজয়-বার্তা ভেরী-তূরী-নাদে ঘোষণা করিয়া দিলেন। অনন্তর রাজপুরী দখল করিয়া বর্দ্ধমান-রাজ কীর্তি-চাঁদ লুণ্ঠন ও ধ্বংস-কার্য দ্বারা আপনার কুকীর্তি ও বিশ্বলুব্ধ প্রকৃতির হীন দৃষ্টান্ত অনাগত যুগের জন্য তুলিয়া ধরিলেন। রাজভাণ্ডার লুণ্ঠিত হইল, বহুমূল্য বস্তুসকল নির্বিচারে আত্মসাৎ করা হইল, ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজগণের দুর্লভ সংগ্রহ-সম্ভার বিনষ্ট ও অপহৃত হইল, এমন-কি দেবায়তন পর্যন্ত কুচক্রের গর্হিত পথা-শ্রয়ী বিজয়ীর রূঢ় হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না। সুগঠিত দ্বিতল (গোপীনাথজীর মন্দির বলিয়া পরে খ্যাত) রম্য দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর প্রভূত রত্নালঙ্কার সাজ-সজ্জা কীর্তিচাঁদ পূর্ণগ্রাস করিলেন। রাজনগরী-আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝিয়া পুরোহিত ও রাজপরিবারের লোক দুর্লভ দুই-চারিটি রত্ন-বিগ্রহ স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি কোন উপায়ে রক্ষা পাইলেও, অন্যান্য দেবতার মূর্তিসমূহ কীর্তিচাঁদ বল-পূর্বক মন্দির

শূন্য করিয়া বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন। ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া বর্দ্ধমানপতি রাজপুরীতে রক্ষিত বহু সনন্দ ও দলিলাদি বিনষ্ট ও অপহরণ করিয়া ভূরিশ্রেষ্ঠরাজগণের গৌরবময় প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাস-ধারাকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করিলেন। এইরূপে রাজগণের নানা কীর্তির নিদর্শন ধরণীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইল।

গড়ভবানীপুরের পতনের অব্যবহিত পরেই পাঁড়ুয়া ও দোগাছিয়া গড় দুইটিও কীর্তিচাঁদ-কর্তৃক কবলিত হইল। ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্য ব্রাহ্মণ-নরপতিগণের হস্ত হইতে চিরতরে বিচ্যুত হইল।...বহু প্রাচীনকাল হইতে যে-ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ্য শিল্প-বাণিজ্য, ধন ও বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত ছিল, আত্মসার রাজবল্লভ-প্রমুখ কতকগুলি নীচ স্বার্থপর কাপুরুষ দেশবাসীর বুদ্ধি-দোষে সেই মহাসমৃদ্ধিশালী রাজ্যের অধঃপতন ঘটিল। জ্ঞাতিশত্রু বিশ্বাসহন্তার কলঙ্কিত কার্য উল্লিখিত হইয়াছে ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে : "রাজবল্লভের কার্য, কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য"।—বাঙ্গালার এক সুপ্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য লোপ পাইল (১১৯৯ বঙ্গাব্দ, ১৭১২ খ্রীঃ অঃ)।

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ পিতৃপিতামহের ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার অপূর্ব বীর্যবত্তাও প্রবাদবাক্যে পরিণত। তিনি রাজগুরু-পদে রামদেবের কনিষ্ঠ পুত্র রাম-কিশোরকে বরণ করেন। গুরুকুলকে তিনি বালি-গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণপুর নামে একটি সমৃদ্ধ গ্রাম স্থাপন করেন।

এই রাজবংশ সমাজ ও দেশের যে বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীনকাল হইতে রাঢ়-বঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ অখিলবঙ্গে প্রতিষ্ঠা-লাভ করে, এবং সেই আদর্শ ভূরিশ্রেষ্ঠ-পতিগণ আপনাদের প্রভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। কারণ, প্রথম মুসলমান-আক্রমণের প্রবল স্রোতে হিন্দুগণের ধর্ম্ম-কর্ম ও সংস্কৃতি লুপ্তপ্রায় হইবার সম্ভাবনা জাগিয়া উঠে, ভুরস্থট-পতিরা অন্ততঃ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতিকে বলিষ্ঠরূপে পুনরুন্নয়নের প্রয়াসে অনেকাংশে সফল হন। তাঁহারা নানা গ্রন্থ রচনা ও সংস্কার করাইতে যত্নবান্ ছিলেন, এবং বহু মন্দির ও দেবতার প্রতিষ্ঠাপন, তৎসঙ্গে বহুতর হিন্দু-সৎকর্ম্মের পুনঃপ্রচলন করেন। এইজন্য তাঁহাদের গুরু পণ্ডিতগণ কৃতজ্ঞ ছিলেন, এবং তাঁহাদের নিকট রাঢ়ীয় হিন্দুসমাজ এই বিষয়ে চিরদিন ঋণী থাকিবে।

এই ব্রাহ্মণরাজগণের বহু কীর্ত্তি-চিহ্ন আজিকে অবলুপ্ত, কিন্তু বস্তু-কুয়াসা যখন কাটিয়া যাইবে—তখন তাঁহাদের কীর্ত্তির ইতিহাস হইয়া উঠিবে চিরভাস্বর।

BAG...
Acce...
Date of Acc...

পরিশিষ্ট

রাজা ভূপতিকৃষ্ণ

দিল্লীর বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক পাঁড়ুয়া (পেঁড়ো)-গড়াধিপতি ভূপতিকৃষ্ণ ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজ্যের একজন শীর্ষস্থানীয় শক্তিমান্ ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। ভূরিশ্রেষ্ঠের অংশবিশেষ পাণ্ডুয়া (পাঁড়ুয়া বা পেঁড়ো) রাজবংশের দ্বিতীয়ধারার মূলপুরুষ শ্রীমন্তনারায়ণ হইতে সঞ্জাত সন্তান-সন্ততিগণের অধিকারে ছিল, এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহারা ইহার ([illegible] ভাগ) উপস্বত্ব ভোগ করিতেন। প্রত্যক্ষতঃ এই রাজ্যাংশের অভ্যন্তর ব্যাপার এই বংশধারাগত জ্যেষ্ঠাধিকারীর দ্বারা পরিচালিত হইত। এই কারণে শ্রীমন্ত হইতে নরেন্দ্র (কবি ভারতচন্দ্র-পিতা) পর্যন্ত 'রাজা' নামে অভিহিত ছিলেন। ভূপতিকৃষ্ণ এই বংশধারার সুকৃতিপরায়ণ রাজা। তিনি বহুতর সৎকর্ম ও দানের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠেন; তিনি ছিলেন প্রজাসাধারণের প্রকৃত বন্ধু। যথার্থতঃ তিনি জনগণের নিকট 'কৃষ্ণ রাজা' বা 'রাজা কৃষ্ণ রায়' নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। এইজন্যই হয়তো তাঁহার প্রকৃত নাম 'ভূপতি' উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। পূর্বোক্ত বহু-প্রচলিত নামে তাঁহার ভূমি-দানের প্রমাণ বহন করে কয়েকটি পুরাতন দলিল পত্র বা তায়দাদ। কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার রচিত 'সত্যনারায়ণের ব্রতকথা'—দ্বিতীয়াংশে বন্দনায় প্রপিতামহের নাম স্মরণ করিয়া নিজের পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন :

"ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস ভুরসুটে বসতি"।

—পেঁড়োর গড়ে আজিও যে পূজা-অনুষ্ঠান আচরিত হয়, তাহা ভূপতিকৃষ্ণেরই প্রবর্তন। এই ভূপতি রায়েরই বংশধর সৎকর্মপরায়ণ 'রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র'-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক শ্রীবিধুভূষণ রায় পেঁড়োর-গড়ের অনাড়ম্বর রাজবাটীতে কুলপ্রদীপ প্রজ্বলিত রাখিয়াছেন।

রাজ্ঞী (রায়বাঘিনী) ভবশঙ্করীর পিতৃবংশ

ভবশঙ্করীর পিতা দীননাথের ভদ্রাসন এখনও পেঁড়োর-গড়ের অনতিদূরে পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার বংশীয় যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী আনতার নিকটবর্তী খোনালপুর গ্রামে বাস-স্থাপন করেন। তিনি ভারতের মধ্যপ্রদেশে একজন ধনী কাষ্ঠব্যবসায়ী-রূপে প্রখ্যাত হন। ভবশঙ্করীর পিতৃকুলের এই সুযোগ্য বংশধর পরোপকার-বৃত্তি, বিদ্যা ও সদ্গুণের জন্য বহুজন-আদৃত ছিলেন। বর্তমান বংশীয়গণ জোতজমার অধিকারী হইয়া কৃষিকার্যে ব্যাপৃত।

ব্রাহ্মণরাজবংশের তৃতীয় শাখা

ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজবংশের তিনটি শাখা ছিল। প্রথম বা প্রধান শাখা অধিষ্ঠিত ছিল—গড়-ভবানীপুরে, দ্বিতীয় শাখা—গড়-পাঁড়ুয়ায়, এবং তৃতীয় শাখা—গড়-দোগাছিয়াতে। দোগাছিয়া-গড়ের স্থাপয়িতা ছিলেন দেবনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র মুকুটরাম। মুকুটরাম হইতে সম্ভূত অধস্তন পুরুষগণ এই রাজ্যাংশের (৵০ ভাগ) স্বত্বাধিত্ব উপভোগ করিতেন। মুকুটরামের বংশধরগণ শক্তি-সামর্থ্যে ও ধন-সম্পদে রাজ্যমধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা নিজ-অধিকারের মধ্যে বহুতর জনহিতকর কার্যে কীর্তি-স্থাপন করেন, কিন্তু দুই-একটি নিদর্শন ভিন্ন প্রায় সমস্তই বিলুপ্তির গর্ভে। ইঁহাদের কুলক্রিয়া ও সামাজিক আদান-প্রদানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং তিনটি বংশধারার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অধিক।

৪

রাজ্যভ্রষ্ট রাজবংশীয়গণ

রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অদৃষ্টের ছলনায় ও জ্ঞাতিশত্রুর হীন-চক্রান্তে রাজ্যহারা হইয়া ক্লিষ্ট-মান নিভৃত জীবন-যাপন করেন। সম্ভবতঃ সেই গৌরবহীন অবস্থায় তিনি আর কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন (আনুঃ খ্রীঃ ১৭২০ বা কিঞ্চিদধিক-কাল)। তাঁহার তিন পুত্র কীর্তিচাঁদের উত্তরাধিকারী রাজা তিলকচাঁদের দাক্ষিণ্যে বহু পরিমাণ ব্রহ্মত্র ও দেবত্র ভূমি লাভ করিয়া গড়ভবানীপুরের নিকটবর্তী বসন্তপুরে নূতন বাসস্থান গড়িয়া তোলেন, এবং পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সম্পত্তি লইয়া আত্মকলহে বংশধরগণের কাল কাটিতে থাকে (আনুঃ খ্রীঃ ১৮০২, বঙ্গাব্দ ১২০৯)। এখনও তাঁহাদের উত্তরপুরুষ বসন্তপুর গ্রামে বিদ্যমান। গড়-ভবানীপুরে যে-সমস্ত রাজবংশীয়ের বাস ছিল, তাঁহারা বসন্তপুর, পলাগড় (হাওড়া), চেতদাসপুর (মেদিনীপুর) প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন।…ইহা (ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত কুলপঞ্জী-অনুসারে) জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হীরারাম (হিরণ্য) নামে লক্ষ্মীনারায়ণের ভ্রাতা দুর্গত অবস্থায় বংশবাটীর ভূস্বামিগণের আশ্রিত হইয়া তৎপ্রদত্ত বোরো পরগনায় প্রায় একষট্টি বিঘা ব্রহ্মত্র জীবদ্দশায় ভোগ করেন, এবং তাঁহার মৃত্যু-পরে সেই সম্পত্তির অধিকারী হন লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রগণ। কিন্তু ঢাকার পুঁথিতে নামের বিকৃতি ও সম্বন্ধসূত্রের নানা অসঙ্গতি পরিদৃষ্ট হয়, সেজন্য হীরারাম লক্ষ্মীনারায়ণের সহোদর কিংবা জ্ঞাতি ভ্রাতা—তাহা সঠিক বলা যায় না।

সমস্ত রাজ্য শত্রু-হস্তগত হইলে পেঁড়োর-গড়ের রাজা নরেন্দ্র রায়ের সবিশেষ অবস্থা-বিপর্যয় ঘটে। পূর্বে রাজা নরনারায়ণ-প্রদত্ত দেবত্র-সম্পত্তি ও নিষ্কর ভূমি তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও পুত্রসকল ভোগ করিতে থাকেন। রাজা ভূপতিকৃষ্ণের অধস্তন বংশ-ধরগণ আজিও পেঁড়োর গড়বাটীতে বিদ্যমান। ভূপতিকৃষ্ণের পঞ্চম ভ্রাতা নরোত্তমের বংশ বাসুদেবপুরে (মেদিনীপুর) বাস-স্থাপন করিয়া অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে।

৫

রাজগুরুবংশ

ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ গুরুবংশকে এক হাজার বিঘা ভূমি-দান করেন, ইহার সমর্থনলিপি থাকিলেও রাজ্য-নাশের সময়ে সমস্তই বেদখল হইয়া যায়, সনন্দ দলিল-দস্তাবেজ প্রভৃতি অপসারণের সঙ্গেই উহার প্রমাণপত্র অন্তর্হিত হওয়াই সম্ভবপর। বস্তুতঃ রাজার রাজ্য-নাশে গুরুকুলেরও অবস্থান্তর স্বাভাবিক। আঁটপুর-সোহাগাছি (হুগলী জেলা)-নিবাসী গুরু রামকিশোরের পুত্র সর্ববিদ্যাপয়োনিধি কালীপ্রসাদ তর্কশিরোমণিকে বর্দ্ধমান-রাজ তিলকচাঁদ একশত বিঘা ব্রহ্মত্র দান করেন। তাঁহার বংশধরগণ আঁটপুরে এবং নানাস্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করিতেছেন। দেবীপুরের গুরু-পুরোহিতবংশ এখনও রাজদত্ত ভূমি-ভোগদখলে বর্তমান আছে।

৬

ভূরিশ্রেষ্ঠ-রাজকুলের প্রতিষ্ঠার ভগ্নাংশ

দেব-দেবী-মূর্তি—৩১, দেবালয়—১২, জলাশয়—২৬।

দেবত্র: সিদ্ধেশ্বরীদেবী (আঁটপুর—রাণীবাজার)—২০০ বিঘা, রাজবল্লভীদেবী (রাজবলহাট)—৫০০ বিঘা, গোপীনাথ জীউ—অন্যান্য দেবদেবীসমেত (গড় ভবানীপুর)—১০০ বিঘা, মণিনাথজী (বামদেব শিব)—১০০ বিঘা, রুদ্রেশ্বরশিব—১০০ বিঘা। —এগুলি ছাড়াও যে-সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি ও মন্দির বর্তমান—তৎ-সম্বন্ধে দেবত্র-সম্পত্তির পরিমাণ অজ্ঞাত।

ব্রহ্মত্র: বহুতর পুণ্যকর্মায় ভূসম্পত্তি-দান, (আজিও দান-গ্রহীতাগণ বংশানুক্রমে ভোগ করিতেছে)। পেঁড়োর-গড়ের (সদাশিব, নরেন্দ্র, অর্জুন প্রমুখ) জ্ঞাতিবংশীয়দিগকে ভূমি-দান (১৪৯৯/০ ও তদ্ভিন্ন বহুপরিমাণ)।

দেবত্র-ব্রহ্মত্র: (রাজার নিজস্ব) সর্বসাকল্যে ভূমি-পরিমাণ—১১৪৬১৪ বিঘা। কিঞ্চিৎ পরিচয়: গড়ভবানীপুর-ভদ্রাসন (রাজবাটী)—২৫ বিঘা, তোশাখানা (মূল্যবান দ্রব্য-রক্ষণ-ভাণ্ডার)—৫ বিঘা, ছাউনাপুর-গড়বাড়ী—৫১ বিঘা, রাণীবাজার ভদ্রাসন (বাটী)—১২ বিঘা, রাজবলহাট-গড়বাড়ী—৭১০ বিঘা।

প্রাচীন স্মৃতিরক্ষা

মহাপ্রতাপ ব্রাহ্মণরাজগণের এবং বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনীর মহৎকীর্তি বাঙ্গালার ইতিবৃত্তকথায় একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করিতেছে, কিন্তু তাহা আজ বিস্মৃত অনাদৃত, ইহার ধ্বংসাবশিষ্ট হইতে স্মৃতির ক্ষীণ প্রতিধ্বনি কেবল ভাসিয়া আসে। সাম্প্রতিক কালে ছাউনাপুরের ভূগর্ভ খনন করিয়া ভূমধ্যস্থ দুর্গের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাটশাকিড়ায় 'সিপাইবেড়' নামে গড় এখন ভগ্নস্তূপ। বাঙ্গালার কীর্তি-কথার এই গৌরবপূর্ণ পৃষ্ঠা উদ্ধার করিতে হইলে, এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করে পুরাকৃতিতত্ত্বজ্ঞের ও সরকারী সাহায্যের উপর। স্বাধীন রাষ্ট্রে তাহাই আজ বহুপ্রত্যাশিত।

ভ্রমশুদ্ধি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	
২২, ১১৯	৫, ১৫	গঞ্জিত	গঞ্জন
১৮	১৮	দিবারাত্রি	দিবারাত্র
৬৪	১৪	প্রজাগণেয়	প্রজাগণের
৮৭	৩	অণুকরণ	অনুকরণ
১০৭	১১	সমাতিরিক্ত	সীমাতিরিক্ত
১০৭	১৭	হিন্দুনরনারিগণের	হিন্দুনরনারীগণের
১১৩	৩	সুবেবেচিত	সুবিবেচিত
১১৯	১১	সগ্না	সভা
১২৭	২১	মারিতে	মরিতে
১৪১	১৬	বিস্তর	বিস্তার
১৪১	১৬	১৬৬৫	১৫৬৫
১৪২	১১	অগ্নিনিয়োগ	আত্মনিয়োগ
১৮২	২৬	জ্বালিয়া	জ্বলিয়া
২০৮	১৭	হস্তস্থিত	হস্তস্থিত
২৪৭	১৩	বীযবাণের	বীর্যবানের
২৬৬	১৮	প্রায়াসী	প্রয়াসী
২৭০	১০	উন্মীলিন	উন্মীলিত
২৭০	১৭	পূর্ণ্যোত্তমে	পূর্ণোত্তমে
২৮২	২৩	পশ্চাদ্ধাবমান	পশ্চাদ্ধাবমান
২৯৯	১৬	চলিত	চালিত
৩০৯	৩	হইবায়	হইবার
৩৪২	১৩	রুদ্রানী	রুদ্রাণী
৩৬১	১৩	পুণ্যদেহ	পুণ্যদেহ
৩৬৬	৮	বিজয়-সংবাদ	বিজয়-সংবাদ
৩৮৭	২০	প্রবতিত	প্রবর্তিত
৩৯৪	১১	কীতিশালী	কীর্তিশালী
৪০৫	২২	কৃচ্ছ	কৃচ্ছ্র
৪১৬	২০	প্রভুত	প্রভূত
[illegible]	২	সে-সমস্ত	যে-সমস্ত
[illegible]	[illegible]	দিগ্‌বর্তা	দিগ্‌বর্তী

BAGBAZAR READING LIBRARY CALCUTTA